তিন গোয়েন্দা

ভলিউম-১৭

রকিব হাসান

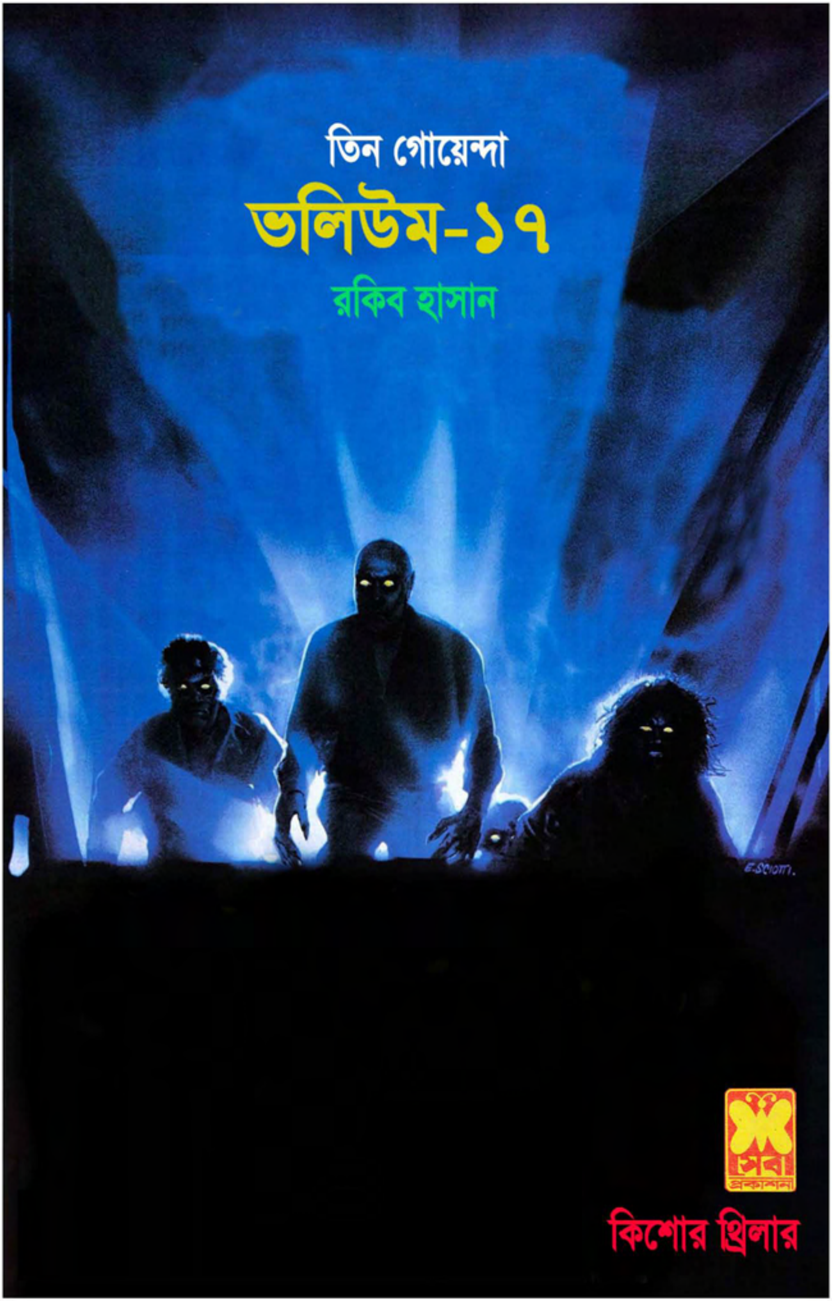

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম ১৭

তিন গোয়েন্দা

৬১, ৬২, ৬৩

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984 16-1275 5

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume 17
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

ঈশ্বরের অশ্রু ৫—৯৫
নকল কিশোর ৯৬—১৭৬
তিন পিশাচ ১৭৭—২৪৮

তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১ (১ম খণ্ড)	৩৫/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১ (২য় খণ্ড)	৩৫/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—২ (১ম খণ্ড)	৩২/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৩	৮০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৪	৮০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৫	৩০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৬	২৬/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৭	৩০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৮	৩০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—৯	৩২/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১০	৩২/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১১	৩০/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১২	৩৪/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১৩	২৮/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১৪	৩৪/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১৫	৩৫/-
তিন গোয়েন্দা ভলিউম—১৬	৩৫/-

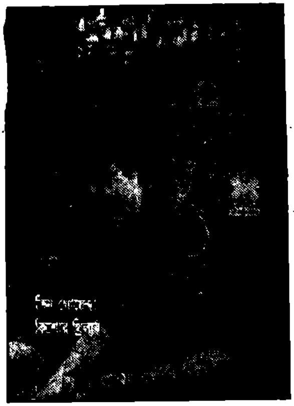

ঈশ্বরের অশ্রু

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯২

'সাবধান!' তিন গোয়েন্দাকে হুঁশিয়ার করল হেনরি বেসিন, 'একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু খেপে যাবে বুড়োটা।'

এমনিতে হাসিখুশি লোক বেসিন। রসিক। কিন্তু এখন ভুরু কুঁচকে রেখেছে। 'ওই শকুনটা,' বললো সে। 'এমন কিপটের কিপটে, পয়সাই ছাড়তে চায় না। তাই তোমাদের ইউনিফর্ম ঠিকমত করে দিতে পারলাম না। কিশোর, জ্যাকেটটা ঢলঢলে হয়েছে।'

হাতের ট্রেটা নামাল কিশোর। চীজ পাফ আর রুমাকিগুলো সরিয়ে রাখল। তারপর তাকাল গায়ের শাদা ওয়েইটারের পোশাকটার দিকে। তার চেয়ে অনেক মোটা লোকের পোশাক এটা। সব জায়গাতেই ঢোলা। বিশেষ করে দুই কাঁধ থেকে হাতা অনেকখানি ঝুলে পড়েছে।

'এর বেশি আর কিছু দিতে পারছি না,' বেসিন বলল। 'ছোট আরেকটা আছে অবশ্য, তবে সেটা গায়েই লাগবে না তোমার। নাহ্, এভাবে আর পারা যায় না।'

কিশোরের পেছনে রয়েছে মুসা। তার হাতেও ট্রে। তাতে ক্যারট স্টিক আর ডিপ। তার জ্যাকেটটা এত খাটো হয়েছে, প্রায় কোমরের কাছে উঠে এসেছে। কনুইয়ের সামান্য নিচে হাতা, কবজি থেকে অনেক দূরে। অনেকটা কাকতাড়ুয়া পুতুলের মত লাগছে তাকে।

আর রবিনেরটা তো সব চেয়ে ঢোলা। এমনকি কিশোরেরটার চেয়েও। হাতা গুটিয়ে রাখতে হয়েছে। নইলে আঙুল সহ ঢেকে যায়। হাতে ট্রে। বেঢপ লাগছে শরীরটা পোশাকের কারণে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বেসিন। 'আর কিছু করার নেই আমার। যাও, মেহমানদের খাবার দাও। লিসটারের সামনে না পড়লেই হবে। কিছু ভাঙলে নিজের দায়িত্বে ভাঙবে। আমি কিছু করতে পারব না। এক ফোঁটা চা ফেলে দিলেও মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে বুড়োটা।'

রান্নাঘরের দরজা খুলে দিল বেসিন। ট্রে নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিভিং রুমের গেস্টদেরকে খাবার বিতরণ করতে লাগল। পুরনো আমলের ঘর। মানুষগুলোও পুরনো। পুরনো আসবাব আর তাক বোঝাই জিনিসপত্র কেমন অস্বস্তি জাগায়। বাগানের দিকের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলো খোলা। ফুরফুর করে ঢুকছে জুনের উষ্ণ হাওয়া। গরম লাগছে তিন গোয়েন্দার। অস্বস্তিতে শক্ত হয়ে গেছে শরীর, নড়তে চাইছে না যেন হাত পা। শক্ত করে ধরে রেখেছে ট্রে, একটু খাবারও যাতে না পড়ে সেদিকে কড়া নজর। ভীষণ বদমেজাজী ডেভিড লিসটারের গালাগাল

শুনতে চায় না।

মিস্টার লিসটারের সঙ্গে পরিচয় হয়নি ওদের। দেখাই হয়নি। তবে তাঁর সম্পর্কে এত কথা শুনেছে, দেখা করার প্রচণ্ড ইচ্ছে। ওয়েস্ট কোস্টের একজন কোটিপতি তিনি। রকি বীচে তাঁর প্রতিবেশী এবং তাঁর সঙ্গে যাদের ব্যবসার সম্পর্ক আছে, তাদের কেউই ভাল বলে না। আর এমন কিপটের কিপটে, নব্বইটা সেন্ট পেলে না খেয়ে জমিয়ে রেখে দেয় এখনও, আরও দশটা সেন্ট জোগাড় করে পুরো একটা ডলার করার জন্যে।

পার্টিতে সাহায্য করার জন্যে তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করেছে হেনরি বেসিন। কিছুটা বেপরোয়া হয়েই। কারণ ওই খরচের টাকাটাও লিসটারের কাছ থেকে আদায় করতে ঘাম ছুটবে তার। শহরের নতুন এবং সবচেয়ে অল্প বয়েসী ক্যাটারার সে। এতদিন ছোটখাট কাজ করেছে। এই প্রথম লিসটারের বাড়িতে পার্টির মত বড় একটা কাজ পেয়েছে। কাজেই নাম করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে সে। তার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় আছে তিন গোয়েন্দার। স্যালভিজ ইয়ার্ডে পুরনো জিনিস কিনতে যায়। লিসটারের নাম তিন গোয়েন্দাও শুনেছে। কেমন লোক দেখার ইচ্ছে কিশোরের অনেক দিনের। কথায় কথায় বেসিনের কাছে যখন শুনল, পার্টিতে সাহায্য করার জন্যে লোক খুঁজছে, ওয়েইটারের কাজটা দেয়ার জন্যে চেপে ধরল তাকে। লিসটারের বাড়িতে ঢোকার এইই সুযোগ। কম পয়সায় কাজের লোক পেয়ে বেসিনও রাজি হয়ে গেল। ওরকম কিপটে লোকের বাড়িতে যেতে মুসা প্রথমে রাজি হতে চায়নি। অনেক বলেকয়ে তাকে রাজি করিয়েছে কিশোর। রবিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। গানের কাজ একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করায় কিছুদিন ছুটি নিয়েছে সে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন থেকে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখতে পারছে না। দক্ষিণ সাগরে যেতে পারেনি। এখন আবার মনপ্রাণ দিয়ে লেগে গেছে পুরনো কাজে।

হেনরি বেসিনকে কন্ট্রাক্ট করেছে লিসটার খরচ বাঁচানোর জন্যে। বড় এবং নামী ক্যাটারার ভাড়া করতে চাইলে অনেক খরচ। কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছে যত কম খরচে সম্ভব পার্টি শেষ করতে হবে। ওয়েইটার নিয়ে শুরু হয়েছে খেঁচাখেঁচি। ক'জন লাগবে সেটা নিয়ে। অনেক চাঁপাচাপি করে তারপর লিসটারকে রাজি করাতে পেরেছে বেসিন। তবে এক শর্তে, সব চেয়ে কমদামী ওয়েইটার নিয়োগ করতে হবে।

তা-ই করেছে বেসিন। আর এ কারণেই বাগানে যে মেয়েগুলো টেবিল সাজাতে ব্যস্ত, ওরা সব রকি বীচ হাই স্কুলের ছাত্রী। বারটেনডারের দায়িত্বে রয়েছে যে ছেলেটা, সে লস অ্যাঞ্জেলেসের কাপ অভ চিয়ার বারটেনডিং স্কুলের একজন শিক্ষানবিস। আর পিকো নামের যে ভবঘুরে লোকটা বাসন ধোয়ামোছার কাজ করছে, তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে বেসিন। একটা মিশনারির কাছে ঘুরঘুর করছিল। খাবারের লোভে।

ওয়েইটার রাখা হয়েছে তিন গোয়েন্দাকে। টাকার জন্যে আসেনি। এত কম দামে কেউ ওয়েইটারের কাজ করতে রাজি হত না। ওরা হয়েছে শুধু কৌতূহল

মেটানোর জন্যে।

ডেভিড লিসটার রহস্যময় মানুষ। রকি বীচে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। নিঃসঙ্গ মানুষ। একা থাকতে পছন্দ করেন। মকিংবার্ড লেনে তাঁর বাড়িটা যেন একটা পোড়োবাড়ি। বাগানটাকে বলা যায় লতাপাতার জঙ্গল। আর কিছুদিন ওভাবে পড়ে থাকলে দক্ষিণ আমেরিকার ইতুরি জঙ্গল হয়ে যাবে। লোকে বলে, ঢুকলে গা ছমছম করে। ভূতের বাসা। মুসা যে রাজি হতে চায়নি আসতে এটা একটা কারণ।

লিসটারের মেয়ে এলিনার সম্মানে দেয়া হচ্ছে এই পার্টি। বৃদ্ধের একমাত্র মেয়ে সে। বোর্ডিঙে থেকে স্কুলে পড়ত। ফলে রকি বীচের ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি, বন্ধুত্ব করতে পারেনি। এখন পুবের একটা কলেজে পড়ে। গোপনে তিন গোয়েন্দাকে বলেছে বেসিন, মেয়েটা এই পার্টিতে তার এনগেজমেন্টের খবরও ঘোষণা করতে পারে। বেসিন নিশ্চিত, ভাবি জামাইকে দুচোখে দেখতে পারবেন না লিসটার। এই পার্টি দেয়ারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর, মেয়ের চাপে বাধ্য হয়েছেন।

'সারাক্ষণ গজগজ করছে বুড়ো,' বেসিন বলেছে। 'এসব নাকি টাকা পানিতে ফেলার ফন্দি। চাপে পড়ে রাজি হয়েছে বটে, তবে যতটা সম্ভব কম টাকা খরচ করে কোনমতে কাজটা সারতে চায়। কিছু সাধারণ খাবার আর কয়েকজন তৃতীয় শ্রেণীর মিউজিশিয়ানকে ভাড়া করেছে, যেনতেন ভাবে মেয়েকে খুশি করতে পারলেই বাঁচে। তার ইচ্ছে, মেয়েকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, মেয়ের ফিঁয়াশেকে ভয় দেখিয়ে, দু'জনকে আলাদা করবে। তারপর ওয়াল স্ট্রীটের কোন বড় ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়েকে ব্যবসায় ঢোকাবে। এগুলো সবই অবশ্য আমার অনুমান।'

সমস্ত কথা মনে পড়ছে কিশোরের। কলরব করছে মেহমানরা। কেন যে এত কথা বলে লোকে বুঝতে পারে না সে। অহেতুক বকবক করে। চীজ পাফ সরবরাহ করতে লাগল ওদেরকে। অবাক হয়ে ভাবছে কোন মানুষটা ডেভিড লিসটার। বেশির ভাগই মাঝবয়েসী। সে শুনেছে, লিসটারের বয়েস সত্তর। মেহমানদের পরনে দামী পোশাক। দামী দরজির দোকান ঘুরে এসেছে। অনেক খরচ পড়েছে তার জন্যে। এরকম দামী পোশাক লিসটারের পরনেও থাকবে, আশা করতে পারল না সে।

হাসাহাসি করছে মেয়েরা। উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। চেঁচাচ্ছে। গান গাইছে। যা ইচ্ছে করছে। ওদেরই কেউ একজন হবে এলেনা লিসটার। হয়ত চুলের রঙ হবে লাল, পরনে শাদা পোশাক। কিংবা হতে পারে সোনালি চুল, তাতে গোলাপী আভা। ওই যে সোনালি চুল, নীল পোশাক পরা মেয়েটা কথা বলছে ধূসর সিল্ক পরা মহিলার সঙ্গে সে-ও হতে পারে এলেনা। কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে মহিলাকে। যখন পাশের মসৃণ চেহারার তরুণের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঘুরল মেয়েটা, ছাতের দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। অমনোযোগী। হঠাৎ হাত উঠে গেল গলার কাছে।

ওপরে তাকাল কিশোর। এক কোণে মাকড়সার জাল ঝুলে রয়েছে। কে জানি একটা শুঁয়াপোকা মেরেছিল, দেয়ালে লেপ্টে রয়েছে এখনও।

বিরক্তিতে কুঁচকে গেল মহিলার মুখ, দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। হাসি চাপতে কষ্ট হল কিশোরের। গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ওয়েইটারের কাজ, এখন তাই মনে হল। তবে আনন্দ পাচ্ছে।

হঠাৎ, মিউজিশিয়ানরা সবে একটা বাজনা শেষ করেছে, এই সময় একটা গেলাস ভাঙল একটা মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জেনে গেল কিশোর, ডেভিড লিসটার কার নাম। লম্বা, তালপাতার সেপাই, ধূসর চুল, কালো মলিন স্যুট পুরনো হতে হতে চকচকে ভাবটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণ থেকে ছুটে এলেন তিনি। রাগে চিৎকার করে ছুটলেন বাগানের দিকে। কিশোরের মনে হল, মেয়েটাকে ধরে মারবেনই বুঝি লিসটার। শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন। বকা দিলেন, 'গায়ে জোর নেই? খাও না?' বিড়বিড় করে আরও কি বললেন, বোঝা গেল না। কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে।

'আব্বা, রাগটা একটু কমাও,' বলে লিসটারের দিকে এগিয়ে গেল নীল পোশাক পরা মেয়েটা।

'এলেনা?' মেয়েটাকে আটকানোর জন্যেই বোধহয় হাতটা বাড়িয়ে ছিলেন ধূসর চুল মহিলা, সরিয়ে নিলেন। মসৃণ চেহারার যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিক, দেখলি! একটা লোক বটে!'

এগিয়ে গেল যুবক। 'এলেনা, দাঁড়াও। মিস্টার লিসটার, শান্ত হোন। মেয়েটা তো আর ইচ্ছে করে ফেলেনি। আপনি...'

ফিরেও তাকালেন না লিসটার। গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুললেন ধাক্কা দিয়ে। দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন।

তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। সাংঘাতিক ব্যস্ত বেসিন। চুলার কাছ থেকে দৌড়ে যাচ্ছে টেবিলের কাছে, আবার টেবিল থেকে চুলার কাছে। অনেকগুলো প্লেটে খাবার সাজাতে হচ্ছে। একগাদা বাসন সিংকে ফেলে ধুচ্ছে উবঘুরে লোকটা।

'হেনরি,' চিৎকার করে উঠলেন লিসটার। 'কোত্থেকে কি ধরে এনেছ! ওই গর্দভ মেয়েটাকে বের কর আমার বাড়ি থেকে! ওই গেলাসের দাম রেখে দেবে ওর কাছ থেকে! নইলে তোমার টাকা থেকে কাটব!'

'আব্বা, শান্ত হও না, আহ!' পেছনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়ে। 'এমন কাণ্ড শুরু করলে! আমার পার্টিই তো শেষ করবে। এসো। এই, আব্বা। প্লীজ!' লিসটারের হাত ধরে টান দিল এলেনা।

কিন্তু চিৎকার বন্ধ করার ইচ্ছে নেই লিসটারের। ফিরে তাকাল পিকো। হাতে একগাদা বাসন। তাকিয়ে রয়েছে ভদ্রলোকের চোখের দিকে। এতগুলো বাসন একসঙ্গে নেয়াই বোধহয় ঠিক হয়নি, কিংবা অন্য কোন কারণে গেল একটা পিছলে। ব্যস, বাকিগুলোও মেঝেতে পড়ে ভাঙল ওটার সঙ্গে সঙ্গে।

লিসটারের চিৎকারে সব আলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই। নীরবতার মাঝে প্রচণ্ড শব্দ হল বাসন ভাঙার। ঝনঝন করে।

হাঁ হয়ে গেলেন লিসটার। .

'আব্বা, তোমার জন্যেই এমন হল!' চেঁচিয়ে উঠল এলেনা। 'তুমি…তুমি… আব্বা!'

বুক চেপে ধরেছেন লিসটার। ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু।

'আমি আগেই বলেছি! এজন্যেই রাগতে মানা করেছি! আব্বা? আব্বা? কডি, জলদি এস! বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে!'

বাবার কোমর জড়িয়ে ধরল এলেনা।

দুই

লিভিং রুম থেকে দৌড়ে এল কালোচুল এক তরুণ। সে আর বেসিন মিলে মেঝে থেকে তুলল লিসটারকে। ডাইনিং রুম থেকে একটা চেয়ার এনে পেতে দিল এলেনা, তাতে বসান হল তার বাবাকে।

'আব্বা, কতবার মানা করলাম তোমাকে!' রাগে, দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল এলেনা। 'আমি জানতাম এরকম একটা কিছু করবে।'

'ডাক্তার কই?' চেঁচিয়ে উঠল মোটা এক মহিলা। সব কিছু ঠিক করার দায়িত্ব যেন এখন তারই। এগিয়ে এসে লিসটারের নাড়ি দেখল। 'টেলিফোন কোথায়? ডাক্তারকে ফোন করছি।'

'না!' চিৎকার করে বলল লিসটার। হুঁশ ফিরেছে। 'ডাক্তার লাগবে না! লাগবে না!'

ঝুঁকে দাঁড়াল কালোচুল তরুণ। 'মিস্টার লিসটার, আমরা আপনাকে সাহায্য করতেই চাইছি…'

'আমি বলেছি ডাক্তার লাগবে না আমার!' খেঁকিয়ে উঠলেন লিসটার। 'ইডিয়ট!'

কিছুই মনে করল না তরুণ। যেন শুনতেই পায়নি। দেখেশুনে কিশোরের মনে হচ্ছে লিসটারের স্বভাবই হল মানুষকে অপমান করা। কিন্তু একজন মেহমান এই অপমান সইবে কেন?

এই সময় নিচু গলায় একজনকে বলতে শুনল, 'ছেলেটার নাম কডি হোয়েরটা। লিসটারের পারসনাল সেক্রেটারি।'

'আজকাল চাকরি পাওয়াটা বোধহয় কঠিনই হয়ে উঠেছে,' শুকনো মন্তব্য করল আরেকজন।

'ওপরে!' লিসটার বললেন, 'ওপরে নিয়ে চল আমাকে! কয়েক মিনিট শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাব।'

মেহমানদের দিকে তাকাল কডি। মুসার ওপর চোখ পড়ল। অস্বাভাবিক খাটো ওয়েইটারের পোশাক পরে বুফে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। 'এই,' তাকে ডাকল সেক্রেটারি। 'এস তো। ধর।'

টেবিলে ট্রে রেখে লিসটারের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। সে আর কডি মিলে

লিসটারকে ধরে তুলল। ধীরে ধীরে নিয়ে চলল সামনের হলের দিকে, সেখানে রয়েছে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আগে আগে চলল এলেনা। মেহমানরা সরে পথ করে দিতে লাগল ওদেরকে।

একেবারে হালকা শরীর লিসটারের। যেন কোন ওজনই নেই। সিঁড়ি বেয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না। মুসা একাই পারত। বেডরুমে নিয়ে আসা হল তাঁকে। ঘরটা বাড়ির সামনের অংশে। জানালা দিয়ে পর্বত দেখা যায়।

আরাম করে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল লিসটারকে। লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে ঢুকল এলেনা, বাবাকে এক গেলাস পানি এনে দেয়ার জন্যে। পানি এনে দিলে ঠেলে সরিয়ে দিলেন লিসটার। বিছানায় ছলকে পড়ল পানি। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নিট্রো! আমার নিট্রো কোথায়?'

'এই যে, আছে,' একটা ড্রয়ার খুলল এলেনা। একটা ওষুধের শিশি বের করল।

'খোল! জলদি কর!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন লিসটারের কণ্ঠ। 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বলদের মত!'

'আব্বা, নিট্রো নয়, একদিন বিষ খাওয়াবো তোমাকে আমি। স্ট্রিকনিন। বিশ্বাস কর।' শিশি ঝাঁকি দিয়ে উপুড় করল এলেনা। বাবার মেলে দেয়া হাতে ফেলে দিল কয়েকটা ট্যাবলেট।

'তা আর করতে দিচ্ছি না,' লিসটার বললেন। 'উইলে কি লিখেছি ভাল করেই জান। আমার অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে একটা কানাকড়িও আর পাবে না তুমি।'

জিভের নিচে ট্যাবলেট রেখে দিয়ে চিত হয়ে শুলেন তিনি।

বাবা-মেয়ের এই ধরনের আলোচনায় অস্বস্তি লাগছে মুসার। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই তার হাত চেপে ধরল এলেনা। 'তুমি থাক এখানে, আব্বার কাছে। আমি যাই। মেহমানদের দেখাশোনা করিগে। কডি, এস। আমি একা পারব না।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। এত বদমেজাজী অসুস্থ একজন বুড়ো মানুষের কাছে থাকার কোন ইচ্ছেই তার নেই। 'মিস লিসটার,' বলতে গেল সে। 'ওখানে আমার কাজ...'

'এটাও কাজ,' বাবার মতই খেঁকিয়ে উঠল এলেনা। 'এখানে থাকতে বলা হয়েছে, থাক।'

'কিন্তু...কিন্তু যদি ওঁর...মানে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়...'

'হবে না। এটা হার্ট অ্যাটাক নয়,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল এলেনা। 'একে বলে অ্যানজিনা। রক্তবাহী শিরা বিদ্রোহ করেছিল বলা যায়। তাতে হৃৎপিণ্ডে ঠিকমত অক্সিজেন পৌছতে পারেনি। বুক ব্যথা করছে সে কারণেই। ট্যাবলেট নিয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।'

'তোমার হলে বুঝতে!' কটকট করে বললেন লিসটার, 'যার হয় সে-ই বোঝে। ভয়ের কিছু নেই তুমি জানলে কি করে?'

'জানার ব্যাপার, তাই জানলাম।' গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এলেনা।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল হোয়েরটা, যেন তার জন্যে আফসোস হচ্ছে, তারপর বেরিয়ে গেল এলেনার পিছু পিছু।

নিথর হয়ে পড়ে আছেন লিস্টার। চোখ বোজা। বিছানার কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসল মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ মানুষটার দিকে। মুখের চামড়া ধূসর রঙের, তার মাঝে শিরাগুলো জেগে রয়েছে বেগুনী জালের মত। উঁচু, পাতলা নাক। বসা গাল। হাতের দিকে দৃষ্টি সরে গেল তার। একেবারে যেন কঙ্কাল, এক ছটাক মাংস আছে কিনা সন্দেহ। আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে বুকের ওপর। যেন কবর দেয়ার জন্যে শোয়ানো হয়েছে মানুষটাকে।

ভয় ধরে গেল মুসার। দ্রুত সরিয়ে নিল চোখ। দেখতে লাগল ঘরে কি আছে। গত শীতের পর বোধহয় আর পরিষ্কার করা হয়নি ফায়ারপ্লেসটা। পিতলের কালো হয়ে যাওয়া বেড়ার ওধারে উঁচু হয়ে আছে ছাই। কাছে একটা পিতলের ঝুড়িতে রাখা কিছু লাকড়ি। আর একগাদা হলদেটে খবরের কাগজ। ওগুলো দিয়ে আগুন ধরাতে সুবিধে। ফায়ারপ্লেসের ওপরের ম্যানটেলপিসে সাজানো একটা জাহাজের মডেল, আর চীনামাটির মোমদানিতে দুটো মোম। সব কিছুতে ধুলো জমে রয়েছে পুরু হয়ে।

লম্বা দম নিল মুসা। বাতাসে ধুলোর গন্ধ। দেয়াল, ময়লা পর্দা আর রঙচটা কার্পেট থেকেই হালকা কুয়াশার মত উড়ছে ওই ধুলো—তার ধারণা।

বড় একটা ড্রেসারের ওপরে ঝুলছে একটা আয়না, দাগ পড়া, হলদেটে। পেছনে জায়গায় জায়গায় পারা উঠে গেছে। ড্রেসারের পাশে দুটো ছোট আর্মচেয়ার রাখা। গদির রঙ উঠে গেছে। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোরও একই রকম করুণ দশা। জাহাজ আর সাগরের ছবি—উত্তাল সাগরে চলেছে জাহাজ, ঢেউ আছড়ে ভাঙছে পাথুরে উপকূলে।

আর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে যেন বুককেস। দেয়াল ঘেঁষে, ড্রেসারের ধারে, চেয়ারের পাশে। বই উপচে পড়ছে ওসব কেসে। পেপারব্যাক, হার্ডকভার, ছোট বই, বড় বই, ভলিউম; খাড়া করে, কাত করে, শুইয়ে, যতোভাবে ঢোকানো সম্ভব, রাখা হয়েছে। আর আছে কাগজপত্র। রোল পাকিয়ে, চ্যাপ্টা করে, ভাঁজ করে, গুঁজে দেয়া হয়েছে বইয়ের ফাঁকে সামান্যতম জায়গা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানেই। আরও আছে বাদামী রঙের ম্যানিলা খাম আর ফোল্ডার, ছোট, বড়, বইয়ের মাথার ওপরের ফাঁকে, কিংবা পাশের অন্যান্য ফাঁকে।

বিছানার দিকে তাকাল আবার মুসা। লিসটার মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেমন খসখসে কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে নিয়মিত। হাড্ডিসর্বস্ব আঙুলগুলো এখন আর মুঠো হয়ে নেই, খুলে রয়েছে বুকের ওপর।

উঠে একটা বুককেসের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। বইয়ের পেছনের নাম পড়ল। একটার নাম ব্লাডি মার্ডার। আরেকটার নাম শার্ক হান্টার। এডগার অ্যালান পো-র গল্প সংকলন রয়েছে কিছু। আরেকটা বইয়ের নাম দেখা গেল পোলারিস। ওটা টেনে বের করে খুলল সে। নাবিকদের গাইডবুক ওটা। সমুদ্রে নক্ষত্র দেখে কি করে জাহাজ চালাতে হয় তার ওপর লেখা।

গুঙিয়ে উঠলেন লিসটার। এমন চমকে উঠল মুসা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বইটা আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো মানুষটার দিকে। কানে আসছে নিচতলায় মেহমানদের কণ্ঠস্বর। কতক্ষণ চলবে পার্টি? কতক্ষণ তাকে আটকে থাকতে হবে এখানে, এমন একটা বিরক্তিকর কাজে?

হাতের দিকে তাকাল সে। ধুলো ময়লা লেগে গেছে। বুককেসটা কতদিন পরিষ্কার করা হয় না কে জানে। কয়েক মাস হতে পারে, কয়েক বছর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বাথরুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল মুসা। ওখানেও বই আছে। পুরনো আমলের বাথটাব আর ওয়াশবেসিনের পাশে একটা টেবিলে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। নানা রকম গল্প আর প্রবন্ধের বইয়ের মাঝে রয়েছে কার্টুনের বই। অ্যাটমিক এনার্জির ওপর লেখা বইও আছে একটা। তার মানে যা পান তা-ই পড়েন লিসটার, সব ধরনের বই। কিশোরকে বলার মত একটা খবর বটে।

কলের মুখ খুলে হাত ধুতে শুরু করল মুসা।

হঠাৎ স্পষ্ট শুনতে পেল তালা লাগানোর শব্দ।

'এইই!' টান দিয়ে তোয়ালে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল সে। নব ধরে মোচড় দিল। নড়লও না। তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে বাথরুমে।

নরম গলায় ডাকল সে, 'মিস্টার লিস্টার! মিস্টার লিসটার, দরজাটা খুলুন, প্লীজ!'

কেউ জবাব দিল না।

আরও জোরে ডাক দিল, 'মিস্টার লিস্টার!'

দরজার কাছ থেকে সরে গেল পদশব্দ। কাঠের পাল্লায় কান রাখল মুসা। নিচতলা থেকে মেহমানদের কথা আর হাসি কানে আসছে। বাজনা বন্ধ। কাছেই একটা দরজা খোলা হল। জোরাল হল নিচের কোলাহল।

'মিস্টার লিস্টার!'

কেউ সাড়া দিল না। দরজা খুলতে এল না কেউ।

অস্বস্তি লাগছে মুসার। ভয় লাগছে। বাথরুম ব্যবহার করায় কি রেগে গেলেন লিসটার? হয়ত ভেবেছেন মুসা চোরটোর কিছু। পুলিশকে খবর দিতে গেছেন?

বাথটাবের কিনারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। পুলিশ এলে বরং ভালোই। আবার শোনা গেল পদশব্দ। একই রকম পায়ের আওয়াজ, আগের বার যেমন শুনেছিল। বাথরুমের দরজার কাছে এসে থামল। কিন্তু দরজা খুলল না।

বিচিত্র একটা শব্দ হল। মাটিতে পড়ে গেলেন বোধহয় লিসটার, কারও সঙ্গে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। গুঙিয়ে উঠল কেউ, তারপর চুপ।

লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে চলে এল মুসা। থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল, 'মিস্টার লিসটার!'

এই সময় নিচে লিভিং রুমে আবার শুরু হল গানবাজনা। কোরাস গেয়ে উঠল রক দল, 'বেইবে, হোয়াই এইন'ট ইউ মাই বেইবে নো মোর?' জোরাল কণ্ঠ। সেই

সাথে দ্রিম দ্রিম করে বাজছে ড্রাম।

'মিস্টার লিসটার!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল মুসা, 'আপনি ঠিক আছেন?'

বেজেই চলেছে বাজনা, গাইছে গায়কদের দল।

ঘামছে মুসা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। লাথি মারতে শুরু করল দরজায়।

জবাব দিচ্ছেন না কেন লিসটার? হার্ট অ্যাটাক হয়েছে? হয়ত মারা যাচ্ছেন এ মুহূর্তে, এ দরজাটার ঠিক ওপাশেই।

'এই কে আছ, শুনছো?' চিৎকার করতে লাগল মুসা। 'বের কর! বের কর আমাকে!'

কেউ শুনল না তার ডাক। কেউ এল না।

'বেইবে, হোয়াই এইন'ট ইউ মাই বেইবে নো মোর?' প্রশ্নটা করে উপসংহার টানল গায়কেরা, কিন্তু বাজনা বন্ধ হল না। আরেক সুরে চলে গেল। ড্রামের বিরতি নেই। গেয়ে উঠল ওরা, 'রকিং রকিং রকিং অল দা নাইট!'

হতাশ ভঙ্গিতে দুম দুম করে দরজায় কিল মারতে লাগল মুসা। এখন কি করব? ভাবছে সে। একজন মানুষ ওদিকে মরতে বসেছে। সে জানতে পারছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। করবটা কি এখন? কিশোরটা কোথায়?

'শান্ত হয়ে বস,' স্মৃতিতে বেজে উঠল যেন কিশোরের কণ্ঠ। 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাব।'

ঠিক! ভাবল মুসা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ছোট ঘরটায় চোখ বোলাল। জানালায় দৃষ্টি আটকে গেল।

জানালা! হ্যাঁ, জানালা! পুরনো আমলের বাথরুমটায় একটা জানালা আছে। ওটার বাইরে দেয়ালের কাছেই রয়েছে একটা গাছ। বেশ বড় একটা অ্যালডার গাছ, বেয়ে নামা যাবে সহজেই।

জানালাটা খুলল মুসা। বইগুলো নামিয়ে রেখে টেবিলটা নিয়ে এল জানালার কাছে। ওটাতে উঠে মাথা বের করে দিল জানালার বাইরে, তারপর বের করল কাঁধ।

নিচে তাকাল। চোখে পড়ল বাড়ির একপাশ। ঠিক নিচেই রয়েছে সিমেন্টে বাঁধান পথ। পড়লে হাত-পা ভাঙার ভয় আছে।

তবে সে ভয় তেমন করল না। গাছটাছ ভালই বাইতে পারে। পড়বে না। আর পড়া চলবেও না, অন্তত এখন। মারা যাচ্ছেন লিসটার। মুসা গিয়ে দ্রুত সাহায্য আনতে না পারলে মারাই যাবেন।

তিন

যতো দ্রুত সম্ভব নামছে মুসা। কোথায় ধরছে, কোথায় পা রাখছে সেদিকেও খেয়াল নেই। বাড়ির এই পাশটা নির্জন, কাউকে চোখে পড়ছে না। কিন্তু সে মাটিতে নামতে না নামতেই একটা লাল চুল ওয়ালা মেয়ে এসে হাজির হল। 'বাহ্, নামার বেশ ভাল উপায় বের করেছ তো! আমি তো জানতাম লোকে সিঁড়ি দিয়েই

নামতে চায়।'

'আমিও চাই।' ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করল না মুসা। মেয়েটার পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল বাড়ির অন্য পাশে যেখানে লম্বা জানালাগুলো রয়েছে সেদিকে। একটা জানালা গলে যখন ঢুকছে তখনও বাজনা বাজছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে মেহমানদের। ট্রে হাতে ঘুরছে রবিন আর কিশোর, ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সোজা এলেনার দিকে ছুটল মুসা। সেই ধূসর সিল্ক পরা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তার হাত ছুঁল সে। ফিরে তাকিয়ে মুসাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে ফেলল এলেনা। 'তুমি এখানে কেন?' ড্রামের ভারি গমগম শব্দকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে।

বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। এখানে কথা বলা অসম্ভব মনে হচ্ছে তার কাছে। ইশারায় এলেনাকে সরে আসতে বলল রান্নাঘরের দিকে।

ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কড়ি হোয়েরটাকে দেখতে পেল ওরা। ঘরের একধারে হেনরি বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে ক্যাটারার। আঙুল বাঁকা করে ইশারায় হোয়েরটাকে ডাকল এলেনা। খালি রান্নাঘরের দিকে এগোল। তার পেছনে নির্জন রান্নাঘরে চলে এল লোকটা। মুসা ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল যাতে বাজনার শব্দ কম শোনা যায়।

'আপনার বাবা আমাকে বাথরুমে তালা আটকে রেখেছিলেন,' মুসা বলল। 'হাত ধুতে গিয়েছিলাম আমি। দুই এক মিনিট পরেই একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল তিনি পড়ে গেছেন। চিৎকার করে অনেক ডাকাডাকি করলাম। শুনলেনই না। জবাব দিলেন না। শেষে জানালা গলে বেরিয়ে গাছ বেয়ে নেমে এসেছি...'

শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করল না এলেনা। পেছনের সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল। তার পেছনে ছুটল হোয়েরটা।

ডাইনিং রুমে ঢোকার দরজাটা ফাঁক হল। মুখ বের করল কিশোর। তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাচ্ছে রবিন।

'কি হয়েছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বারোটা বেজেছে লিসটারের!' কি হয়েছে বলল মুসা। 'এলেনা দেখতে গেছে বাবাকে।'

ছাতের দিকে তাকাল কিশোর। তারপর পেছনের সিঁড়ির দিকে। রওনা হয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ?' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রবিন, 'এলেনা আমাদের কুত্তার মত দূর দূর করে তাড়াবে। বাপ আর মেয়ের তো একই স্বভাব।'

'মিস্টার লিসটার সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকলে,' কিশোর বলল, 'আমাদের সাহায্য দরকার হবে তাঁর।'

'যাও,' ভুরু নাচাল মুসা। 'মাথায় ডাণ্ডা খেতে চাইলে।' কিন্তু পরক্ষণেই কিশোরের পেছনে রওনা হল সে-ও। কিছুটা কৌতূহলী হয়েই। কিশোরকে কি বলে এলেনা দেখার জন্যেই। তাছাড়া লিসটারের আসলে কি হয়েছে সেটাও দেখার

হচ্ছে।

দ্বিধা করল রবিন। তারপর সে-ও চলল দু'জনের পেছনে।

ওপরের হলঘরে যেন পালকের তুষারপাত হচ্ছে। একটা বালিশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। খোলটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে, ভেতরের পালকগুলো উড়ছে। তার মাঝ দিয়ে ছুটে গেল এলেনা। শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল একবার, নব মোচড় দিয়ে ঠেলে খুলে ভেতরে তাকাল। চেঁচিয়ে উঠল। হোয়েরটা চেঁচাল না। তাকিয়ে রয়েছে ভেতরে।

'ওখানেই কোথাও আছে!' চিৎকার করে বলল এলেনা। 'যাবে কোথায়? যাওয়ার কোন জায়গা নেই!'

ঠেলা দিয়ে পাল্লা পুরোটা খুলে দিল হোয়েরটা। ভেতরটা এখন কিশোরও দেখতে পাচ্ছে। বিছানার চাদরে কুঁচকে রয়েছে। খানিক আগে যে ওখানে একজন মানুষ শুয়েছিল বোঝা যায়। ফায়ারপ্লেসে নাচানাচি করছে ছোট ছোট আগুনের শিখা। কাগজ পোড়া কালো ছাই গরম বাতাসের সঙ্গে উড়ে চিমনিতে ঢোকার চেষ্টা করছে। ভুরু কুঁচকাল কিশোর। গরম আবহাওয়া। এই সময়ে ফায়ারপ্লেস জ্বালানোর দরকার পড়ল কেন?

দৌড়ে গেল সে। ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা চিমটাটা তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল আগুনের ভেতর। কিন্তু কাগজ যা ফেলা হয়েছিল পুড়ে গেছে। চিমটার খোঁচা লেগে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেল পোড়া কাগজ।

'কি করছ?' কিশোরের হাত থেকে চিমটাটা টান মেরে নিয়ে নিল এলেনা। রাগত কণ্ঠে বলল, 'এখানে ঢুকেছ কেন? যাও, নিচে যাও!'

'মিস লিসটার,' বেশ গম্ভীর ভারিক্কি গলায় বলল কিশোর, 'আমরা থাকলে আপনার সুবিধে হতে পারে। রহস্যময়, অস্বাভাবিক ঘটনা, এসব তদন্তের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল এলেনা। হাসিটা চেপে রাখল মুসা। নাটকীয় ভাবভঙ্গি করে আবার বাজিমাত করে দিয়েছে কিশোর পাশা।

শান্ত দৃষ্টিতে সারা ঘরে চোখ বোলাল কিশোর। এখনও বন্ধ রয়েছে বাথরুমের দরজা। তালায় ঢোকান রয়েছে পুরনো ধাঁচের স্কেলিটন কী। এগিয়ে গিয়ে তালা খুলে দরজাটা খুলল কিশোর। মুসা যেভাবে ফেলে গেছে সেভাবেই রয়েছে বাথরুম। জানালার নিচে টেবিলটা রয়েছে।

চাবিটা দিয়ে হলঘর আর শোবার ঘরের মাঝের দরজার তালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। লেগে গেল। 'এ বাড়ির যে কোন তালা এ চাবি দিয়ে খোলা যাবে মনে হচ্ছে। মিস লিসটার, পালানোর আগে মুসাকে বাথরুমে আটকেছিলেন আপনার বাবা। মেহমানদের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করেন নাকি উনি?'

'তোমার বন্ধু মেহমান নয়,' কাটা জবাব দিল এলেনা। 'এখানে কাজ করতে এসেছে।'

'বেশ, তাহলে কর্মচারী। তো আপনার বাবা কি কর্মচারীদের এরকম করে বাথরুমে আটকে রাখেন?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাকে আটকে ফেলার পর ধুপ করে একটা শব্দ শুনেছ বললে। কিছু একটা পড়েছিল মানুষ পড়ার শব্দ? মিস্টার লিসটার?'

'হতে পারে। আর কেউ তো ছিল না।'

'মিস্টার লিসটারের কাছে যখন বসে ছিলে তখন ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছিল?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'একেবারেই আগুন ছিল না।'

'গরম আবহাওয়া,' আনমনে বলল কিশোর। 'কেন আগুন জ্বালতে যাবে ফায়ারপ্লেসে?'

বিছানার দিকে তাকাল সে। 'হলঘরে দেখে এলাম একটা বালিশ ছিঁড়েছে। বিছানায় এখন বালিশ নেই। যেটা ছিঁড়েছে সেটা আগে থেকেই কি ফাটা ছিল? আর আরেকটা বালিশ কোথায়? বিছানায় তো সাধারণত দুটো বালিশ থাকে। কারণ এটা ডাবল বেড।'

ভ্রূকুটি করল মুসা। 'দুটোই থাকার কথা। তবে খেয়াল করিনি আমি।'

'অবশ্যই দুটো ছিল,' এলেনা বলল। 'দেখ, এসব শার্লক হোমসগিরি করে ভোলাতে পারবে না আমাকে। যাও, নিচে যাও। মেহমানদের খাবার লাগবে...'

তার কথা যেন কানেই ঢুকল না কিশোরের। বিড়বিড় করে বলতে থাকল, 'আজ এখানে কি ঘটেছে বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি। স্পষ্ট। মুসা বাথরুমে ঢুকেছিল। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছেন আপনার বাবা, যাতে সে বেরোতে না পারে। তারপর কিছু পুড়িয়েছেন ফায়ারপ্লেসে।'

ঘরে ঢুকল এতক্ষণে হোয়েরটা। 'এমন কিছু,' কিশোরের সুরে সুর মিলিয়ে বলল সে, 'যেটা অন্য কাউকে দেখতে-দিতে চাননি। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তিনি...'

'দেখ, কডি,' কড়া গলায় ধমক দিল এলেনা। 'ছেলেগুলোকে আর উসকানি দিয়ো না।' কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'কি করেছে আমি বলি। মূল্যবান কিছু পোড়ায়নি বাবা। ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরানোর জন্যে কাগজ ব্যবহার করেছে। একটা বালিশ ছিঁড়েছে, আরেকটা লুকিয়েছে। নিজেও গায়েব। এসব করেছে আমাকে রাগানোর জন্যে। কোন কিছু পছন্দ না হলেই এরকম করে। এর চেয়ে খারাপ কাজ করেছে আগেও। বিশ্বাস কর। আজকের এই পার্টি একটুও পছন্দ ছিল না তার।'

'তার মানে আপনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন?' কিশোরের প্রশ্ন। 'তা-ই যদি করে থাকেন এখন তিনি কোথায়?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করল এলেনা। খুঁজতে শুরু করল। তার সঙ্গে যোগ দিল হোয়েরটা। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে তিন গোয়েন্দাও যোগ দিতে গেল। বাধা দিতে গিয়েও দিল না এলেনা, বরং বলল, 'ঠিক আছে, খোঁজ। বেশি লোকে খুঁজলে তাড়াতাড়ি বের করা যাবে।'

বিরাট বর্গাকার শোবার ঘরগুলোয় পুরু হয়ে ধুলো জমে রয়েছে। নোংরা। সাফ করা হয় না। কয়েকটাতে বিছানা আর ড্রেসার রয়েছে। বাকিগুলোতে ছাত সমান

উঁচু শেলফে রয়েছে গাদাগাদা বই আর কাগজপত্র।

'বই সংগ্রহের বাতিক ছিল,' মন্তব্য করল কিশোর।

'এটা একটা রোগ,' এলেনা বলল। 'বিশ্বাস কর। আব্বার জন্যে এটা রোগ।'

শুধু বইই সংগ্রহ করেননি ডেভিড লিসটার। অনেক ধরনের ট্রফিও রয়েছে। দূরদূরান্তে জাহাজে করে ঘুরে বেড়ানোর প্রমাণ ওগুলো। তুর্কি টুপি, হুঁকোর নল, একজোড়া চামড়ার চটি দেখিয়ে এলেনা বলল, ওগুলো মিশরের বাজার থেকে আনা হয়েছে। আফ্রিকা থেকে এসেছে হাতির দাঁতে খোদাই করা জিনিস। মারাকেচ থেকে একটা পিতলের ল্যাম্প। পেনসিলের বাক্স আর পুরনো ম্যাগাজিনের পাশে তাকে অগোছাল হয়ে রয়েছে জাহাজ চালনার যন্ত্রপাতি।

'কোন জিনিস ফেলে না আব্বা। পরিষ্কার করতেও দেয় না। তার ভয়, কাউকে ঢুকতে দিলেই জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে পালাবে।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। তার জন্যে খারাপই লাগল তিন গোয়েন্দার। বাবা আর মেয়ের স্বভাবে অনেক অমিল। আর তার জন্যে নিশ্চয় মনোকষ্টে ভুগতে হয় মেয়েকে। মেয়ে চায় সাফসুতরো থাকতে, আর বাবাটা একদম নোংরা। এলেনার নিজের ঘরটা ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার।

দোতলায় আরও একটা ঘর পরিষ্কার আছে, সেটা কমপিউটার রুম। ধুলো ময়লা সহ্য করতে পারে না ওই যন্ত্র, তাই বাধ্য হয়েই সাফ রাখতে হয়। ঘরটা লিসটারের শোবার ঘরের পাশেই। এয়ারকুলার লাগানো। শাদা দেয়াল। লাল রঙ করা ইস্পাতের ফ্রেমের চেয়ার। আর দুটো কমপিউটার কনসোল রয়েছে ঘরে।

'একটা সেট রাখা হয়েছে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে,' হোয়েরটা জানাল। 'বাইরে বেরোতেই চান না মিস্টার লিসটার। যোগাযোগ রাখার জন্যে তাই কমপিউটার ব্যবহার করেন। কর্মচারীদের হুকুম দেন এই যন্ত্রের সাহায্যে। কারও সঙ্গেই কথা বলতে চান না। কমপিউটারে আরেকটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। কেউ আদেশ পালন না করলে কিংবা কাজে ভুল করে ফেললে রেকর্ড থেকে যায়, কোন ভাবেই ফাঁকি আর দিতে পারে না।'

'গোলমালটা কোনখানে হয়, সেটা আগে খুঁজে বের করতে চায় আব্বা,' এলেনা বলল। 'যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেটা মিটিয়ে ফেলা যায়।' ঠোঁট কামড়াল। 'কই, এখানেও তো নেই!'

'চিলেকোঠা আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

আছে। তাতেও বই, বাক্স আর স্যুভনির। অতীতের সাক্ষি। তবে ডেভিড লিসটার নেই।

ওপরতলায় খোঁজা শেষ। কিশোরের দিকে তাকাল এলেনা। 'বেশ, বল এবার, কোথায় আব্বা? খুব তো চালাকি জাহির করেছিলে। এখন বল, সে কোথায়?'

'অনেক সম্ভাবনাই আছে। তবে আপাতত সেসব বলছি না,' কিশোর বললো। 'একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তিনি হেঁটে বেরিয়ে গেছেন সামনের দরজা দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে। মেহমানরা আলাপে ব্যস্ত, তাঁকে দেখতে পায়নি...'

বাধা দিল এলেনা। 'আমার তা মনে হয় না। আমি সিঁড়ির দিকে মুখ করে

ছিলাম। নামলে দেখতে পেতামই।'

'তাহলে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে?' অনুমান করল হোয়েরটা। 'ওখান দিয়ে নেমে সেলারে চলে যেতে পারেন। পেছনের আঙিনায় বেরোতে পারেন। কেউ দেখতে পাবে না।'

'বালিশ নিয়ে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'বালিশের কথা বার বার কেন বলছো?' জিজ্ঞেস করল এলেনা।

'কারণ, আমার মনে হচ্ছে ওটা একটা বড় সূত্র।'

পেছনের সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। যে ভবঘুরে লোকটাকে ধোয়ামোছায় সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল সে সিংকে ব্যস্ত।

'এই, আমার আব্বাকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?'

এলেনার দিকে ঘুরে তাকাল লোকটা। বয়েস পঞ্চাশ, এমনকি ষাটও হতে পারে। বয়েসের তুলনায় স্বাস্থ্য বেশ ভাল, শক্তসমর্থ, পেশিবহুল। ডান বাহুতে একটা ড্রাগন আঁকা উল্কি দিয়ে। কিশোরের মনে হল মুখটা বেশি গোমড়া করে রেখেছে লোকটা। শুধু মাথা নেড়ে এলেনার কথার জবাব দিয়ে আবার তার কাজে মন দিল।

ডাইনিং রুম থেকে এল হেনরি বেসিন। 'কিছু হয়েছে?'

'আব্বাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

সেলারে খুঁজল তিন গোয়েন্দা। আছে ভাপসা গন্ধ, পুরনো ট্রাঙ্ক আর মাকড়সার জাল। বেরিয়ে এসে বাড়ির বাইরেটা ঘুরে দেখতে লাগল। বড় বড় ঘাস। ঝোপঝাড়। অযত্ন আর অবহেলার ছাপ সর্বত্র। বাগানে টেবিল পেতে দেয়া হয়েছে। তাতে বসে খাচ্ছে মেহমানরা। কিন্তু লিসটারকে দেখা গেল না ওদের মাঝে।

অবশেষে সব জায়গায় খোঁজা হয়ে গেল, আর কোন জায়গা বাকি রইল না।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এলেনা। 'বেরিয়েই চলে গেছে। আমাকে ফেলে রেখে। আমার বিয়েতে মত ছিল না, তাই ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছে। যাতে আমি কিছু করতে না পারি। ভেবেছে, এরকম করলে বেকায়দায় পড়ে যাব আমি। এনগেজমেন্ট আর করতে পারব না আজ...'

'তা না-ও হতে পারে,' কিশোর বলল। 'বালিশের কথা ভুলে যাবেন না। চলে যাওয়ার ইচ্ছে হলে একজন বয়স্ক লোক বালিশ সঙ্গে নিয়ে যাবেন কেন? সেই গল্পটার কথা মনে হচ্ছে, লিনুস আর কম্বলের কথা। আরেকটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। ধুপ করে একজন মানুষকে পড়ে যেতে শুনেছে মুসা। আর ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলারই বা অর্থ কী?'

'কি অর্থ?' ভাবতে লাগল এলেনা। 'আর ওই শব্দ...ওটা...হতে পারে, তার পরিকল্পনারই একটা অংশ। এরকম সে করতেই পারে। তার কাছে ওটা খেলা। আমাকে রাগানোর চেষ্টা। যাতে মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসি, আর সে সুযোগ পায়।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'তার চেয়ে আরও সহজ যুক্তিতে আসুন না। কারও হাত

থেকে বাঁচানর জন্যে কোন একটা জিনিস ফায়ারপ্লেসে পুড়িয়েছেন আপনার আব্বা। আর সেই লোকটাই তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে, যাতে চিৎকার করতে না পারেন।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল এলেনা। রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। 'তুমি বলছ কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

পুরো এক মিনিট চুপ করে রইল এলেনা। ভাবল। তারপর বলল, 'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার!'

চার

'আপনার বাবা হারিয়ে গেছেন? সত্যি?' বড় বড় হয়ে গেল লালচুল মেয়েটার চোখ। মুসাকে গাছ বেয়ে নামতে দেখে মজা পেয়েছিল। এখন এলেনার কথা শুনে অবাক হল।

নিচের হলঘরে ঢুকেছে এলেনা। টেলিফোন রিসিভারে হাত। রকি বীচ পুলিশকে ফোন করেছে।

'এটা একটা খেলা, তাই না?' লালচুল মেয়েটা বলল আবার। 'অনেক পার্টিতেই এরকম খেলা হয়। কেউ একজন খুন হয়ে যাওয়ার ভান করে। অন্যদেরকে তখন বলতে হয় কে খুন করেছে।'

'আহ্, চুপ কর তো, নিনা,' বিরক্ত হয়ে বলল এলেনা। 'এটা খেলা নয়।'

কিন্তু মেয়েটা শুনল না। 'আমাদের বলতে হবে আপনার বাবা কোথায় লুকিয়েছেন, তাই না? কিংবা কে তাকে লুকাতে সাহায্য করেছে। তাই তো? বলতে হবে মোটিভটা কি।'

'নিনা, তোমার মাথায় গোবর আছে!'

মসৃণ চেহারার যে যুবক যাকে কিছুক্ষণ আগে এলেনার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সে বেরিয়ে এল লিভিং রুম থেকে। অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। কিশোর জেনেছে ওই যুবকই এলেনার হবু বর। যাকে মেয়েটা বিয়ে করতে চায়। নাম নিকিনজা ভ্রিশ্ন। একই কলেজে পড়ে দু'জনে। ধূসর সিল্ক পরা মহিলা তার মা। বোস্টন থেকে ছেলের সঙ্গে এসেছেন পার্টিতে যোগ দিয়ে এনগেজমেন্টের ঘোষণা শোনার জন্যে।

বিকেলে কিশোর দেখছে, জানালার চৌকাঠে আঙুল ছুঁইয়ে ধুলো পরীক্ষা করছেন মহিলা। ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে খুশি হয়েছেন কিনা কে জানে। লিসটারের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাঁর ছেলে, এতেও কতটা খুশি হয়েছেন বোঝার উপায় নেই। কিশোর অন্তত বোঝেনি এখনও।

'কোথায় ছিলে?' এলেনাকে জিজ্ঞেস করল নিক। 'সবাই তোমাকে খুঁজছে।'

'আব্বাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'ও। কেন? এখনও রাগ পড়েনি? ভুলে যাও ওসব।'

কাছেই দাঁড়িয়ে রইল কিশোর, কথা শোনার জন্যে।

কড়া চোখে নিকের দিকে তাকাল এলেনা। 'দেখ, তুমি পছন্দ কর আর না-ই কর, সে আমার বাবা।' লিভিংরুমে এসে ঢুকল সে। চেঁচিয়ে বাদকদেরকে বলল বাজনা থামাতে।

একবার বললে শুনল না। ক্রমেই গলা চড়িয়ে মোট তিনবার বলতে হল এলেনাকে। পুরোদমে গলা আর বাদ্যযন্ত্রের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছিল যেন বাদকের দল। অবশেষে শুনতে পেয়ে থামল।

মেহমানদের দিকে ফিরল এলেনা। 'আমার আব্বা···আমার আব্বার শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন···এখন কোথায় আছে বলতে পারব না। কেউ দেখেছেন ? সিঁড়ি দিয়ে নামতে?'

গুঞ্জন উঠল। একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করল মেহমানেরা। কয়েকজন শ্রাগ করল। কয়েকজনকে মুচকি হাসতে দেখল কিশোর, দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ। তবে কথা বলল না কেউই। ডেভিড লিসটারকে দেখেনি কেউ।

ড্রাইভওয়েতে ইঞ্জিনের শব্দ হল। সামনের দরজায় দেখা দিল দু'জন পুলিশ অফিসার। সরে তাদেরকে ঢোকার জায়গা করে দিল মুসা। এগিয়ে নিয়ে এল এলেনা আর নিক।

আবার উত্তেজিত গুঞ্জন উঠল মেহমানদের মাঝে। মোটা বয়স্ক একজন লালমুখো মানুষ বেশ জোরেই বলল, 'বাহ্, চমৎকার!'

'এই পিটার, চুপ,' তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে বলল তার পাশে দাঁড়ানো মহিলা। 'কি বলবে বুঝতে পেরেছি।'

'কি বলব?' পকেট থেকে চুরুট বের করল পিটার। 'বুড়ো জলদস্যুটা অবশেষে ধরা পড়তে যাচ্ছে একথা বলতে মানা করছ?'

'চুপ! সিগারেট খেতে হলে বাইরে গিয়ে খাও। যাও!' হাতে হাতব্যাগ, তাই শুধু হাতটা নাড়তে পারল না, ব্যাগসহই নাড়ল। আরেকটু হলেই লোকটার মুখে বাড়ি লাগত।

ধূসর রঙের চুলওয়ালা একজন লোক মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ডেভিড লিসটার জলদস্যু ছিলেন, সত্যি?'

'এইই, ডোপ,' বলল আরেকজন। রিমলেস চশমার পেছনে চকচক করছে তার চোখ, 'তুমি না তাঁর উকিল? তোমার মুখে এসব মানায় না কিন্তু।' বেশ মজাই পাচ্ছে যেন লোকটা।

'তুমিও তো তার ম্যানেজার,' খোঁচা দিয়ে বলল উকিল, 'ব্যাপারটা কি এনথনি? হঠাৎ এত ভদ্র হয়ে গেলে কিভাবে? নাকি কিছু লুকানোর চেষ্টা করছ?'

উকিলের কণ্ঠটা কেমন যেন ভোঁতা লাগল কিশোরের কাছে। অবাক হয়ে ভাবল, অনেক বেশি গিলে ফেলল না তো? মাতাল?

'কি বলতে চাও?' রেগে যাবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন এনথনি।

'বলতে চাই, লিসটারের কিছু হয়ে গেলে তোমার তো আর কিছু হবে না। বরং তোমার তখন পোয়া বারো···'

ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল অন্যেরা। কয়েকজন এড়িয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করল, কিন্তু কান তবু চলেই গেল ওদের কথায়। রুমাল দিয়ে বার বার কপাল মুছতে লাগলেন নিকের মা মিসেস ভিশন। বললেন, 'নিক, ভীষণ গরমরে এখানে। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

নিক যেন তাঁর কথা শুনতেই পেল না। বেসিন হাসল। হাসিটা কেমন যেন ধাঁধা। ইতিমধ্যেই মেহমানরা তার বুফের বেশির ভাগটাই সাবাড় করেছে। কাজেই দরজায় এসে দেখার সুযোগ পেল তরুণ ক্যাটারার, কি নিয়ে এত উত্তেজনা।

'সাউথ'স স্পেশালিটি স্টোরের ম্যানেজার ছিলে যখন,' ডোপ বলছে। 'কন্ট্রাকটরদের সঙ্গে তোমার গোপন চুক্তি হত। ভাবছ ভুলে গেছি। পোমোনার ওই নতুন ব্রাঞ্চটা খোলার সময় তো রীতিমত তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলে তুমি। অবশ্য বেশি টাকার প্রয়োজন হলে আর ওরকম সুযোগ পেলে কে না কাজে লাগায় বল। কন্ট্রাকটররা তো মানুষকে টাকা দেয়ার জন্যে মুখিয়েই থাকে।'

'মিথ্যে কথা!' প্রায় চিৎকার করে উঠল এনথনি। 'নিজে যেমন অন্যকেও তেমনই ভাবে সবাই। এসব কাণ্ড নিশ্চয় তুমিই করতে, তাই না, ডোপ?'

চুপ করে আছে ডোপ। কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসল এনথনি। 'স্টক মার্কেটে দ্রুত বেশ কিছু কামিয়ে নিলে, সেটা নিশ্চয় সৎ উপায়ে নয়। ঠিক বলছি না? লিসটারের সন্দেহ ছিল, মক্কেলের গচ্ছিত টাকা তাদেরকে না জানিয়ে বিনা অনুমতিতে নিজের ব্যবসায় খাটিয়েছ।'

'থাম!' চেঁচিয়ে উঠল ডোপ। 'চুপ কর!'

'লিসটারের টাকাও নষ্ট করেছিলে নাকি? ধরা পড়ে গেছ? তাঁর ওপর সে কারণেই রেগেছ...' আচমকা থেমে গেল এনথনি। চারপাশে তাকিয়ে যেন এই প্রথম খেয়াল করল ঘরে আরও লোক রয়েছে, তাদের উত্তপ্ত বিতণ্ডা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

সিগার ধরিয়েছে যে লোকটা সে ঘড়ির দিকে তাকাল। 'আরে, এত্তো দেরি হয়ে গেছে।' জোরেই বলল কথাটা। স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, যথেষ্ট হয়েছে, এই বিচ্ছিরি পরিবেশে আর থাকতে চায় না। 'যাওয়া দরকার। পুলিশ কি বেশি দেরি করবে?'

এটা সূচনা। বিরক্ত প্রায় সবাই হয়েছে। হাত মেলাতে শুরু করল বয়স্ক মেহমানেরা। গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিতে লাগল। একসাথে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে দিন ঠিক করছে দু'জন লোক, শুনে ফেলল কিশোর। এলেনার অল্পবয়সী বন্ধুরাও লম্বা জানালা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে গেল, সেখান থেকে হেঁটে বাড়ির বাইরে।

পার্টি শেষ। অধিকাংশ মেহমানই চলে গেছে। বেসিন আর তার সহকারীরা মিলে টেবিলগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। টেবিল থেকে গোলাপী রঙের টেবিলক্লথগুলো নিয়ে বাগানে চলে গেল ধোয়ামোছার জন্যে যে লোকটাকে রাখা হয়েছে সে। সেখান থেকে ছোট একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে গেল পেছনের হলঘরে। বারের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটা খালি বোতল ভরতে লাগল বাক্সে।

ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিলগুলো ভাঁজ করে বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুলতে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। গিয়ে দেখল, টেবিলক্লথ ঝেড়ে পরিষ্কার করে ভাঁজ করে বয়ে নিয়ে এসেছে ধোয়ামোছার লোকটা, ট্রাকে তুলছে কাপড়গুলো।

পুলিশের সঙ্গে যখন বেরিয়ে এল এলেনা, তখনও ট্রাকে মাল তোলায় ব্যস্ত তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ির দিকে দেখাল মেয়েটা। হোয়েরটাকে সাথে করে উঠে গেল দুই অফিসার। হলের ভেতর দিয়ে লিভিং রুমে চলে এল এলেনা।

উসখুস করছে নিক। যেন এখানে থাকার কথা নয় তার। 'এলেনা, তুমি ঠিক আছ তো?' বলল কোনমতে।

'আছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলেনা। 'বু-বুঝতে পারছি না, কি করব। ভয় পাব না কি করব। আব্বা ইচ্ছে করে একাজ করে থাকতে পারে। পার্টি দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তার। আমার চাপাচাপিতেই করেছে। মেহমানরা চলে গেলেই এসে ঢুকবে হয়ত, চওড়া হাসি দেবে আমার দিকে তাকিয়ে। তাহলেও ভাল হত। কিন্তু যদি সত্যিই বিপদে পড়ে থাকে?'

'পুলিশ কি বলে?'

'কি আর বলবে। তদন্ত করবে। ওরা এখনও ভাবছে না আব্বার খারাপ কিছু হয়েছে। গেছে যে বেশিক্ষণ হয়নি। তাছাড়া খামখেয়ালি মানুষ, শুনেছেই তো। জিজ্ঞেস করেছে আব্বার শত্রু আছে কিনা। তাদের নাম জানি কিনা। কি আর বলব বল। আমার আব্বার শত্রুদের নাম? লস অ্যাঞ্জেলেসের পুরো টেলিফোন ডিরেকটরিটাই দিয়ে দিতে হয় তাহলে!'

'অত ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এগিয়ে আসতে দেখা গেল মিসেস ভিশনকে। মুখে হাসি। যেন সব কিছু ঠিক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর কোন অসুবিধে হবে না, হাসিতেই বুঝিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। কাছে এসে বললেন, 'এলেনা, মা, কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে দরকার হলে একটুও দ্বিধা না করে মোটেলে ফোন করো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল এলেনা।

দস্তানা পরতে শুরু করলেন নিকের মা। 'চমৎকার একটা পার্টি দিলে, সত্যি।' বলেই বুঝলেন ভুল করে ফেলেছেন, রুটিন মাফিক সৌজন্য দেখানো অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে চলবে না, শুধরে দেয়ার জন্যে বললেন, 'মানে হতো আরকি। যদি তোমাদের···যাকগে। কিচ্ছু ভাববে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিক, আয়। মেয়েটা একা থাকুক কিছুক্ষণ। রেস্ট নিক।'

'আমি ফোন করব,' এলেনাকে কথা দিল নিক।

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বললেন মিসেস ভিশন। 'অবশ্যই করবে। করতে তো হবেই।'

ঘুরে তাকাতেই কিশোরের ওপর চোখ পড়ল এলেনার। 'কী? কিছু লাগবে?'

'ইয়ে···মিস লিসটার···আমি দুঃখিত,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, সবাইই দুঃখিত। কিন্তু তাতে আমার কি উপকার হবে?'

এই মুহূর্তটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল কিশোর। পকেট থেকে বের করল তিন গোয়েন্দার কার্ড। বাড়িয়ে দিল এলেনার দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রবিন আর মুসা।

হেসে উঠল এলেনা। 'তিন গোয়েন্দা! প্রাইভেট ডিটেকটিভ! হাহ হাহ!'

তিনজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। 'অনেক ধন্যবাদ। গোয়েন্দার দরকার হলে প্রফেশনাল লোককেই ভাড়া করতে পারব আমি, নবিসকে নয়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিছুটা হতাশই হয়েছে এলেনার আচরণে। যদিও মানুষের এই আচরণ নতুন নয় তার কাছে। তবে একেবারে নিরাশ করেনি তাকে মেয়েটা। কার্ডটা ফিরিয়ে দেয়নি কিংবা ফেলে দেয়নি। ল্যাম্প রাখা আছে যে টেবিলটায় তার ড্রয়ারে গুঁজে রেখে দিল।

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। হেনরি বেসিনের গাড়িতে করে চলল। তার দোকানে গিয়ে তার নিজস্ব জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করবে। তারপর ট্রাকটা নিয়ে চলে যাবে পিকো। ডেকোরেটরের টেবিল চেয়ার আর টেবিলক্লথ ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। বেসিনের দোকান থেকে তাদের সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে ছেলেরা।

ডিনারের পর মুসাদের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে, সেটাতে যোগ দিতে হবে তাকে। তার দাদার জন্মদিনের পার্টি। কিন্তু রবিনের তেমন কোন কাজ নেই। কিশোরের সঙ্গে ইয়ার্ডে যেতে অসুবিধে নেই তার।

বেসিনের ওখানে কাজ সেরে বাড়ি রওনা হল তিন গোয়েন্দা। কিছুদূর এসে মোড় নিয়ে একদিকে চলে গেল মুসা, কিশোর আর রবিন আগের পথেই রইল। চলে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপে সাইকেল রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্রেলারে ঢুকল, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। বিকেলের ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে।

'তো, কি ভাবছ?' কথা শুরু করল রবিন। 'মিস্টার লিসটার কি সত্যিই পাগল?'

'খামখেয়ালি তো বটেই। এবং নিষ্ঠুর।' একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। যখন কোন রহস্যের সমাধান খোঁজে কিংবা প্রশ্নের জবাব বের করতে চায় তখন এভাবে কথা বলে সে। 'নইলে পার্টি থেকে ওরকম করে চলে গিয়ে মেয়েকে অপদস্ত করার কি মানে? 'পাগল না হলে করে কোন ভদ্রলোক?'

একটা প্যাডে আনমনে আঁকতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পার্টির মেহমানরাও অদ্ভুত। কেমন যেন। শুধু একটা ব্যাপারেই ওদের মিল দেখতে পেলাম, লিসটারকে কেউ পছন্দ করে না। তাদের অনেকেই নিশ্চয় তাঁর কর্মচারী। ওই যে উকিল আর অন্য লোকটার মাঝে বিশ্রী আলোচনা হল...'

'জঘন্য!' মুখ বিকৃত করল রবিন। 'কোন ভদ্রলোক যে ওভাবে কথা বলতে পারে...তবে এলেনার কলেজের বন্ধুরা কিন্তু ভাল, অন্তত স্বাভাবিক বলা চলে। অবাক ব্যাপারই। ওরকম বদমেজাজী একটা মেয়ের সঙ্গে যে কারও বন্ধুত্ব হয় বিশ্বাস করা কঠিন।'

টেলিফোন বাজল।

তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। 'বলুন।'

রবিন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে।

'ও,' কিশোর বলল, 'তাই!'

আরও কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনল। তারপর বলল, 'বেশ।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'এলেনা লিসটার। এখুনি যেতে বলেছে আমাদের। তার বাবাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

পাঁচ

পনের মিনিটের মাথায় লিসটারের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। কলিং বেল বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিল এলেনা। পরনে এখনও সেই নীল পোশাক, পার্টিতে যেটা পরেছিল। তবে এখন আর তেমন ধোপদুরস্ত নেই, কুঁচকে গেছে। হাই-হীলও নেই পায়ে।

'টাকার জন্যে নোট পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নীরবে একটুকরো কাগজ কিশোরের হাতে তুলে দিল এলেনা। জোরে জোরে পড়ল গোয়েন্দাপ্রধান, 'বিশপের বই বদল করলেই শুধু ফেরত আসবে বাবা। পুলিশ ডাকা চলবে না। যা করার জলদি করতে হবে। দেরি করলে ভীষণ বিপদ হবে।'

পেন্সিল দিয়ে বড় করে লেখা রয়েছে 'বিশপ' শব্দটা। বাকি শব্দগুলো খবরের কাগজের পাতা থেকে কেটে সাঁটা হয়েছে।

'বিশপ শব্দটা খবরের কাগজে হরহামেশা ছাপা হয় না,' এলেনা বলল। 'সেজন্যেই পায়নি। হাতে লিখতে হয়েছে। খামে করে পাঠায়নি। শুধু কাগজটা। পেছনের দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়েছে কেউ। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।'

'কিডন্যাপিংই, আপনি শিওর?' কিশোরের প্রশ্ন। 'আজ বিকেলে কিন্তু আপনার সন্দেহ হয়েছিল, আপনার আব্বা পুরো ব্যাপারটা প্ল্যান করেই করেছেন।'

'নাহ্, আব্বা অতোটা খারাপ নয়। দরজার ঘন্টা বাজিয়ে দৌড়ে পালাতেও পারবে না। ক্ষমতা নেই। জোরে হাঁটতেই কষ্ট হয় ইদানীং। এটা কিডন্যাপিংই। এখন আমাকে বিশপের বই খুঁজে বের করতে হবে। কোন বই ওটা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। তোমাদেরকে সেজন্যেই ডেকেছি। বইটা খুঁজতে আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

নোটটা তুলে ধরল কিশোর। 'এটার কথা পুলিশকে জানানো উচিত। জানিয়েছেন?'

'না। তোমরাও বলবে না। কারণ লোকটা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। এমনকি আমার আব্বার মত বদমেজাজি লোকের জন্যেও না। বিপদে পড়বে। আরও একটা কথা আছে, তার খারাপ কিছু হলে আমারও সাংঘাতিক ক্ষতি। সম্পত্তির একটা কানাকড়িও পাব না। উইলে সে রকমই লেখা আছে। যদি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তার, কিংবা গায়েব হয়ে যায় রহস্যজনকভাবে, তাহলে আমাকে ফকিরের মত ঘাড় ধরে এ বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া আছে। বোঝ এবার, কেমন বাপ আমার। আমার কোন

দোষ না থাকলেও বঞ্চিত করা হবে তখন আমাকে।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর।

'চমকে গেলে নাকি? আব্বা সব সময় খারাপ দিকটাই ভাবে, আর আমাকে সন্দেহ করে। আমার তা-ই মনে হয়। ভেবে দেখ, নিজের মেয়েকে অবিশ্বাস করে। নইলে ওরকম উইল লিখতে পারতো? থাক ওসব কথা। এসো, কাজ শুরু করিগে।'

ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওনা হল এলেনা। তাকে অনুসরণ করল ছেলেরা। মেয়ের মুখে লিসটারের অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনে অবাক হয়েছে।

ওপরের হলঘরে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগান হয়েছে। ছেঁড়া বালিশের পালক যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলেছে এলেনা। তবে পুরোপুরি পারেনি। বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু রয়ে গেছে এখনও। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই গোয়েন্দাদের। যে কাজ করতে ডাকা হয়েছে ওদের সে কাজে মনোযোগ দিল। ডেভিড লিসটারের শোবার ঘর থেকে শুরু করল বইটা খোঁজা। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা বই রয়েছে এখানে। দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রের মত কঠিন বিষয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পাখি নিয়ে গবেষণার বই। তার পাশাপাশিই রয়েছে হালকা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। অভিধান আছে, আছে মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা বই। ঠিক তার কাছেই রয়েছে ডিকেনসের লেখা সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো একসেট বই।

'এই যে একটা পেলাম,' ধুলো পড়া নোংরা মলাটের একটা পেপারব্যাক বই তুলে ধরল কিশোর। নাম দা বিশপ মারডার কেস। এস. এস. ভ্যান ডাইন-এর লেখা একটা রহস্যকাহিনী।

বইটা নিয়ে হলদেটে পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল এলেনা। 'দূর! এটার জন্যে কিডন্যাপিঙের মত একটা অপরাধ করবে না কেউ। থাক এটা। খুঁজতে থাক।'

নাকে ধুলো ঢুকেছে রবিনের। জোরে হাঁচি দিল। তাক থেকে বই নামিয়ে মলাট দেখছে, নাম পড়ছে, আবার তুলে রেখে দিচ্ছে আগের জায়গায়। বলল, 'অনেক পড়াশোনা করেন আপনার আব্বা, তাই না?'

'না, বই দেখে যতটা মনে হয় ততটা না। বই কেনেই শুধু। নেশা। বলে, সময় করে নিয়ে ভালমত পড়তে শুরু করবে একদিন। সব পড়ে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু সেই সময় আর করতে পারে না। কিনেই চলেছে, কিনেই চলেছে, তাকে তুলে রাখছে। নামানো আর হয় না। বইয়ের মালিক হতে পেরেই যেন খুশি আব্বা। কোন বই কখনও হাতছাড়া করে না, ফেলে দেয়া তো দূরের কথা। শুধু বইই না, কোন জিনিসই ফেলে না।'

বড় দেরাজটার দিকে ঘুরল এলেনা। 'দেখি, এর ভেতরে কি আছে।' বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে টান দিয়ে ড্রয়ার খুলল সে। কয়েক জোড়া মোজা, একটা মাফলার আর কাগজের বাণ্ডিল। কাগজগুলো বের করে তার ভেতরে বই খুঁজল। 'খবরের কাগজের কাটিং,' ছেলেদেরকে জানাল। 'একটা প্রেসক্রিপশন। কিছু ভ্রমণের ব্রশিয়ার।'

কাগজগুলো আবার ড্রয়ারে ছুঁড়ে ফেলল সে। 'কি খুঁজছি জানা থাকলে অনেক

সহজ হত। একটা রহস্যোপন্যাস চেয়ে পাঠিয়েছে একথা একদম বিশ্বাস করতে পারছি না। তাও আবার পুরনো।'

'এটার ব্যাপারে কি মনে হয়?' একটা বই তুলে ধরল রবিন। নাম দা ডে লিংকন ওয়াজ শট। লেখকের নাম জিম বিশপ।

'মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'যাক। তাকে তুলো না। বাইরেই রাখ।'

'হতে পারে কোন বইয়ের দুর্লভ প্রথম সংস্করণ,' আন্দাজ করল এলেনা। 'কিংবা প্রকাশই হয়নি এমন কোন পাণ্ডুলিপি চায়। নোট কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার নথিপত্রও হতে পারে। অথবা কোন লগবুক-অতীতের কোন গোপন ঘটনার কথা লেখা রয়েছে যাতে। সাংঘাতিক মূল্যবান কোন দলিল। কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ইতিহাস। হতে পারে না?'

'সবই খুঁজে দেখব,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

বুককেসগুলো দেখা শেষ করে পুরনো আলমারির তাকে রাখা বাক্স আর ফোল্ডারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিল গোয়েন্দারা। ক্যানসেল করে দেয়া ব্যাংক চেকের বাণ্ডিল দেখতে পেল। পুরনো টেলিফোনের বিল, পোস্টকার্ড—কোন কোনটা সুদূর জিব্রালটার আর কায়রো থেকেও এসেছে। সব শাদা। লেখা নেই। বোঝা গেল চিঠি লেখার জন্যে নয়, স্যুভনির হিসেবে আনা হয়েছে ওগুলো।

'তরুণ বয়েসেই সাগর পাড়ি দিয়েছিল আব্বা,' এলেনা জানাল। 'ইনডাস্ট্রির ব্যবসায় ঢোকার অনেক আগের কথা সেটা। ওয়াল স্ট্রীটে তো তার ডাকনামই দিয়ে ফেলা হয়েছে জলদস্যু। হয়ত পাইরেটই ছিল, কে জানে! নইলে একেবারে জিরো থেকে শুরু করে এতটা ওঠে কিভাবে? শুরু যখন করে একটা ফুটো পয়সা ছিল না পকেটে। লোকে জানে একথা। কিন্তু দেখতে দেখতে একটা শিপিং লাইনের মালিক হয়ে গেল। কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দিয়ে ফেলল। তারপর কিনল একটা পেপার মিল, গোটা তিনেক ব্যাংক। অথচ অতটা চালাক লোক নয় সে, সাংঘাতিক বুদ্ধিমান যে তা-ও নয়।'

'ততটা খারাপও ভাবতে পারছি না,' কিশোর বলল।

এই সময় টেলিফোন বাজল। চমকে উঠল এলেনা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিছুই বলল না। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'চেষ্টা তো করছি! শোন, কিছু কিছু পেয়েছিও। লাগলে নিয়ে যেতে পার। একটার নাম দা বিশপ মারডার কেস। আরেকটা বইয়ের লেখকের নাম জিম বিশপ...'

থেমে গেল সে। ভ্রূকুটি করল। আবার বলল, 'তোমাকে ঠকানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। শোন, কি খুঁজতে বলছ সেটাই জানি না। জানলে...আরে শোন শোন...' রিসিভারটা নামিয়ে এনে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

'কিডন্যাপার?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ। তার ধারণা আমি তার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছি। পুরনো খুনের গল্পের বই চায় না সে। সে চায় বিশপের বই। আর কোন তথ্য না জানিয়েই লাইন কেটে দিল।'

'গলা শুনে কি মনে হল?' রবিনের প্রশ্ন, 'চিনলেন?'

মাথা নাড়ল এলেনা। 'খসখসে। হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, নয়ত মুখে রুমাল দিয়ে নিয়েছিল। যাতে চেনা না যায়। কথায় এক ধরনের টান রয়েছে। তবে বুঝতে পারলাম না কোন দেশের।'

আবার গিয়ে দেরাজে খোঁজায় মন দিল এলেনা। শেষ ড্রয়ারটা যখন খোঁজা শেষ করল সে, রবিন আর কিশোর তখন সবগুলো তাক দেখে শেষ করে ফেলেছে। অধৈর্য হয়ে উঠছে তিনজনই। এলেনার খিদে পেয়েছে।

'ডিনার খাইনি,' বলল সে। 'ফ্রিজেও কিছু নেই। পার্টির জন্যে খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছিল। খুব হিসেব করে। এখন পিজা কিনে এনে খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'চলবে,' হাসল রবিন।

'রবিন, তুমিও যাও। একটু পনিরটনিরও নিয়ে এসো,' কিশোর বলল। 'আর কোক।'

রবিন গেল এলেনার সঙ্গে খাবার কিনতে। কিশোর রয়ে গেল। খোঁজা বন্ধ করল না। পরের বেডরুমটায় রওনা হল সে। চিলেকোঠায় যাওয়ার দরজাটার ওপর চোখ পড়ল।

কি মনে করে টান দিয়ে দরজাটা খুলল সে। সুইচ টিপে সিঁড়ির আলোটা জ্বালল। তারপর উঠতে শুরু করল ওপরে।

এককোণে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে ট্রাঙ্কগুলো। বাক্স আর বুককেস আছে, তবে উপচে পড়ছে না অন্যান্য জায়গার মত। দরজার কাছের তাকগুলো থেকে খোঁজা শুরু করল কিশোর। পাতলা একটা বই টেনে বের করল। নাম দা সিক্রেট অভ টাইপরাইটিং স্পীড। ১৯১৭ সালে লেখা।

বইটা আবার তাকে রেখে দিল। কানে এল নিচে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। 'রবিন!' ডাক দিল সে। 'তুমি?'

জবাব এল না। তাকের দিক থেকে ঘুরে কান পাতল কিশোর। হঠাৎ বুঝতে পারল রবিন কিংবা এলেনা নয়। পিজা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয় ওদের।

কিন্তু কেউ একজন ঢুকেছে।

আর ডাকল না কিশোর। নড়লও না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পদশব্দ শোনা গেল। উঠে আসছে কেউ।

কাপড়ের খসখস শোনা গেল। সিঁড়ির মাথার কাছেই পৌঁছে গেছে বোধহয় লোকটা। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে।

কিট করে উঠল লাইট সুইচ। চিলেকোঠার আলো নিভে গেল।

হঠাৎ অনেক বেশি অন্ধকার লাগল কিশোরের কাছে। মনে হল যেন চারদিক থেকে চেপে এসে ধরতে চাইছে। বুককেসের কাছ থেকে সরে গেল সে। লুকোতে গেল আরেকটা বুককেসের আড়ালে। কিন্তু তার আগেই গায়ে এসে পড়ল উজ্জ্বল আলো। টর্চ।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এল আলোক রশ্মি। গায়ের

ওপর থেকে সরছে না। ঘরে ঢুকল লোকটা। উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। লুকানোর উপায় নেই। বেরোনোর পথ নেই। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

পিস্তল আছে কি লোকটার হাতে? চোখের ওপর হাত তুলে এনে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। দেখতে পেল না। যা থাকে কপালে ভেবে লাফ দিয়ে এগোল। দা চালানোর মত কোপ মারল লোকটার টর্চ ধরা হাতের কব্জিতে। উফ করে উঠল লোকটা। টর্চ খসে পড়ল। ঝনঝন করে কাচ ভাঙল। গড়িয়ে সরে যাচ্ছে টর্চটা। কয়েকবার মিটমিট করে নিভে গেল আলো। আবার অন্ধকারে ডুবে গেল চিলেকোঠা।

আলো নেই। এবার দু'জনেই সমান। অন্ধকারে চলল একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা। কিশোরের গলা টিপে ধরতে চাইল লোকটা। সরে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। পিছাতে গিয়ে কিসে যেন পা বেধে গেল। উল্টে পড়ত আরেকটু হলেই। সামলাতে কষ্ট হল।

হাত পড়ল তার কাঁধে। ঝাড়া দিয়ে সরানোর চেষ্টা করল কিশোর। ছাড়ল না তাকে আঙুলগুলো। খামচে ধরেছে। হাতটা খুঁজছে বোধহয় মুচড়ে ধরার জন্যেই।

আন্দাজে লোকটার চোয়াল সই করে ঘুসি চালাল কিশোর। লাগল না। পেট সই করে হাত চালাল। এবারেও লাগাতে পারল না। জোরে ঠেলা লাগল কাঁধে। জোর আছে লোকটার গায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। সামলে নিতে পারত, একটা বাক্সে পা বেধে যাওয়াতেই পড়ে গেল।

নিচে দরজা খোলার শব্দ হল।

'কিশোর!' ডাক দিয়ে বলল রবিন। 'এনেছি। এসো।'

বিড়বিড় করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। কিছু বুঝতে পারল না কিশোর। অন্ধকারে দরজা দিয়ে প্রায় ছুটে বেরোল রহস্যময় হামলাকারী। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ দুপদাপ করে নেমে চলে গেল।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল কিশোর। দৌড় দিল সে-ও। লোকটাকে ধরার জন্যে। দোতলায় পৌঁছে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল পেছনের সিঁড়িতে।

আবার ডাকল রবিন, 'এই কিশোর! কি হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে দৌড়ে নামল কিশোর। রান্নাঘরে ঢুকল। দড়াম করে লেগে গেল ঘরের পেছন দিকের দরজাটা। লোকটা বেরিয়ে গেল। ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলে আকাতে তাকাতে আঙিনা পার হয়ে গেল হামলাকারী।

ছয়

পুলিশকে খবর দিল এলেনা। এসে রিপোর্ট লিখে নিল ওরা। বাড়ির চারপাশে ঝোপগুলোতে খুঁজে দেখল। গ্যারেজে দেখল। তারপর এলেনাকে পরামর্শ দিল, আবার যদি কেউ হামলা করতে আসে নাইন ওয়ান ওয়ানে যেন ফোন করে।

লিসটারের আর কোন খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করল পুলিশ। সান্ত্বনা দিয়ে

বলল, ভয় নেই, অনেকেই ওরকম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরেও আসে। র‍্যানসম নোটটার ব্যাপারে কিছুই বলল না এলেনা। দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়িটা চলে যেতে দেখল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কে ওই লোক? সাধারণ চোর? নাকি কিডন্যাপার? চিন্তায়ই ফেলে দিল।'

'আমার ধারণা কিডন্যাপার,' রবিন বলল। 'হয়ত বিশপের বইয়ের জন্যে তর সইছে না আর। অস্থির হয়ে নিজেই দেখতে চলে এসেছে।'

'হয়ত,' কিশোর বলল। 'তবে তার চেয়ে আমাদেরই খুঁজে দেখার সুযোগ বেশি। আমাদের ওপর দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকাই তার জন্যে সুবিধে। একটা ব্যাপার অবশ্য জেনে গেলাম, এ বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

ভয় ফুটল এলেনার চোখে। 'আজ রাতে মায়ের কাছে চলে যাব কিনা ভাবছি। এ বাড়িতে আমি একা থাকতে পারব না।'

'আপনার আম্মা কি কাছেই থাকেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সান্তা মনিকায়। আব্বার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলেই যাব। কিন্তু…থাকতে পারলেই ভাল হত। আবার ফোন করতে পারে কিডন্যাপার। আমি না থাকলে কথা বলবে কে? কডিকে ফোন করে অবশ্য থাকতে বলতে পারি। আব্বার সেক্রেটারি যখন, এটা তার ডিউটির মধ্যেই পড়ে। কিছু ওভারটাইম দিলেই হবে।'

'আপনার হবু বর আর তার মা এসে থাকতে পারেন না?'

'পারত। তবে বোস্টন থেকে নাকি খবর এসেছে, বাড়িতে জরুরী কাজ। আজ রাতেই চলে যেতে হবে ওদেরকে।' গুঙিয়ে উঠল এলেনা। 'নিক অবশ্য থাকতে চেয়েছিল, আমি মানা করে দিয়েছি।'

কিশোর বলল, 'আপনি চাইলে আমি আর রবিন থাকতে পারি।'

চোখ মিটমিট করল এলেনা। এমন ভান করতে লাগল এলেনা যেন প্রস্তাবটায় খুশি হয়নি, কিন্তু চেপে রাখতে পারল না। অবশেষে বলল, 'বেশ। আমি তোমাদের মক্কেল। কাজেই আমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব এখন তোমাদের।' হাসল। 'তোমাদের বাড়ি থেকে কোন আপত্তি আসবে না তো?'

'না। আমাদের এসব অত্যাচার বাড়িতে গা সওয়া হয়ে গেছে। রাতে না ফিরলে এখন আর কিছু মনে করে না। তবে একটা ফোন করে বলে দিতে হবে,' বলল কিশোর।

বাসায় বলে দিল কিশোর আর রবিন। এলেনাকে পাহারা দেয়ার জন্যে লিসটারের বাড়িতে রাত কাটাতে অনুমতি মিলল দু'জনেরই। ফোন করার পর মনে পড়ল রবিনের পিজা খাওয়ার কথা। খাওয়া শেষ করে আবার বিশপের বই খোঁজায় মন দিল। দোতলার ঘরে অনেক বই, কাগজপত্র আর স্যুভনির মিলল, যেগুলো প্রমাণ করে তরুণ বয়েসে নাবিক ছিলেন লিসটার, সাগরে সাগরে ঘুরেছেন।

'অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় লেখক ছিলেন আপনার আব্বা,' হাতির দাঁতের তৈরি একটা হাতির প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। ভারত থেকে আনা হয়েছে

জিনিসটা। 'দেশে দেশে ঘুরতে নিশ্চয় খুব ভাল লাগত তাঁর।'

'অ্যাডভেঞ্চারটা তখন করতে হয়েছে পেটের দায়ে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল এলেনা। 'যেখানে কাজ পেত সেখানেই চলে যেত। তারপর কোন ভাবে কিছু টাকা জমিয়ে কিনল লিসটার স্টীমশিপ লাইন। পুরনো মরচে পড়া দুটো মালবাহী জাহাজ, হিউসটন থেকে ক্যারিবিয়ান বন্দরগুলোতে যাতায়াত করত। ওই দুটো লক্কড় মার্কা জাহাজের আয় থেকেই আরেকটু ভাল আরেকটা জাহাজ কিনল। আরও টাকা জমল। ভিজালিয়ায় ছোট একটা ব্যাংক কিনল। ঢুকে পড়ল স্টক মার্কেটে।

'আম্মা বলে ওই সময়টাতেই টাকার জন্যে রীতিমত খেপে ওঠে আব্বা। ভাল একটা মানুষ চোখের সামনে পাকা জুয়াড়ি হয়ে গেল যেন, আম্মার কাছে তা-ই মনে হয়েছে। আসলে...আমার মনে হয় আম্মা আব্বাকে বুঝতে পারেনি।'

'আপনি পারেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

শ্রাগ করল এলেনা। 'মনে হয়। অন্তত আর সবার চেয়ে বেশি। মজুতদারী ব্যবসা আরেকটু কম করলেই আমি খুশি হতাম। ওকাজটা আমার ভাল লাগে না। মাল কিনে জমিয়ে রেখে সুযোগ বুঝে ছেড়ে দেয়া। অনেক কিছু শিখিয়েছে আমাকে আব্বা, তার মধ্যে ওটা একটা। এর জন্যে অবশ্য অনেক সচেতন থাকতে হয়। ভুল করলেই ডুবতে হবে।

'আমার পাঁচ বছর বয়েসে আম্মার সঙ্গে আব্বার ডিভোর্স হয়ে যায়। কলেজে যাওয়ার আগে আম্মার কাছেই বেশি থাকতাম। অন্যখানে থাকলেও পরের দিকে প্রায়ই দেখা করতাম আব্বার সঙ্গে। তাকে মনে করিয়ে দিতে চাইতাম যে তার একটা মেয়ে আছে।'

দোতলায় খোঁজা শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। গুড নাইট জানিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল এলেনা। ওপর তলার হলঘরে পালা করে পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর আর রবিন। এলেনার কাছাকাছি থাকতে পারবে এতে। সামনে আর পেছনের দিকটায়ও একই সঙ্গে নজর রাখতে পারবে। পা টিপে টিপে এসে হঠাৎ ওদের ওপর হামলা চালাতে পারবে না কেউ।

প্রথম পালা রবিনের। বেডরুম থেকে একটা আর্মচেয়ার এনে একটা কোকের বোতল হাতে নিয়ে আরাম করে বসল।

আলমারি থেকে কম্বল বের করে অব্যবহৃত শোবার ঘরের একটাতে শুয়ে পড়ল কিশোর। শুরুতে মনে হল ঘুমই আসবে না। সারাদিন অনেক উত্তেজনা গেছে। সেগুলো ঘুরছে মাথার মধ্যে।

রবিনের ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙল তার। 'তিনটে বাজে। আমি আর পারছি না। ওঠো। এবার তুমি যাও।'

কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সেই জায়গায় ঢুকল রবিন। 'হুঁমম! গরম কম্বলের জন্যে ধন্যবাদ।'

'দুঃখিত। তোমার ধন্যবাদটা নিতে পারলাম না,' গোঁ গোঁ করে বলল কিশোর। হলঘরে চলে এল পাহারা দিতে। ঠাণ্ডা লাগছে। বসে পড়ল চেয়ারে।

তার মনে হল, রাত তিনটে হল দিনের সব চেয়ে বিষণ্নতম সময়।

ভোর হতে কতক্ষণ লাগবে জানা আছে, কিন্তু সেই সময়টা কাটবে কি করে বুঝতে পারছে না।

মাথার ওপরে কি যেন নড়ছে। ওপর দিকে তাকাল। দম বন্ধ করে ফেলেছে। কান খাড়া।

কিছুই না! একেবারে নীরব। পুরনো অদ্ভুত এই বাড়িটা স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলতে আরম্ভ করেছে। অলীক কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তার।

কিন্তু না, কল্পনা নয়। আবার শোনা গেল। খুব হালকা নড়াচড়া। খালি পায়ে চিলেকোঠার মেঝেতে হাঁটছে যেন। ছোট্ট, হালকা পাতলা শরীরের কোন মানুষ।

কিন্তু ওখানে তো কারও থাকার কথা নয়!

উঠে দাঁড়াল কিশোর। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। চিলেকোঠার দরজার সামনে এসে থামল। হাত বাড়িয়ে নব চেপে ধরে মোচড় দিল। আস্তে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল পাল্লা।

অন্ধকার ঘর। আলোর চিহ্নমাত্র নেই। পরিত্যক্ত জায়গার এক ধরনের পুরনো ধুলোটে গন্ধ এসে নাকে লাগছে।

কেউ আছে। সিঁড়ির মাথায়। দেখতে পাচ্ছে না, তবে কাপড়ের মোলায়েম খসখস কানে আসছে। বুঝতে পারছে তাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে মানুষটা, ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে।

তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। মস্ত ভুল করেছে আসার আগে সিঁড়ির আলোটা না জ্বেলে। লোকটার হাতে পিস্তল থাকলে চমৎকার একটা নিশানা হয়ে আছে এখন সে।

যে লোকটা তখন আক্রমণ করেছিল এ কি সেই লোক? যদি হয়, ফিরে এল কেন? ভেতরেই বা ঢুকল কিভাবে? চিলেকোঠায় কি করছে?

পিছিয়ে এসে আবার দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

'কি হয়েছে?' কিশোরের পেছনে ফিসফিস করে কথা শোনা গেল।

এমন চমকে উঠল কিশোর যেন গুলি খেয়েছে।

'আরে আমি।'

এলোমেলো হয়ে আছে রবিনের পোশাক। পায়ে জুতো নেই। বিছানা থেকে সোজা উঠে চলে এসেছে। ছাতের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওপরে কেউ হাঁটছিল।' ফিসফিস করছে এখনও।

'তুমিও শুনেছো?'

মচ করে উঠল একটা তক্তা। সিঁড়ি থেকে সরে গেছে লোকটা। বাড়ির সামনের দিকে চলেছে।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে,' কিশোর বলল। 'ওই লোকটা তোমার সামনে দিয়েই গিয়েছিল। আর কোন পথ ছিল না। ঘুমিয়ে ছিলে বলেই দেখতে পাওনি।'

'একটুও না!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'এক সেকেণ্ডের জন্যেও না। ঘুম তাড়ানোর জন্যে দু'বার উঠে পায়চারিও করেছি।'

'ভুরু কুঁচকে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'যাই হোক, সে ঢুকেছে। জানে সে একা নয়। আমরা রয়েছি। জানে ওখানে কি আছে। আর সেজন্যেই…'

এক টান দিয়ে চিলেকোঠার দরজা খুলে ফেলল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'এই, কে কে ওখানে?'

জবাব নেই। তবে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার ডাকল কিশোর।

সাড়া নেই এবারেও।

চিলেকোঠার আলো জ্বালল কিশোর।

'না না যেও না!' বাধা দিল রবিন। 'লোকটার কাছে পিস্তল থাকতে পারে!'

'গুলি করার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে করে ফেলত।' তবে আত্মবিশ্বাসের জোর ততটা নেই।

এক দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কেউ নেই। শূন্য ঘর। বুককেস, ট্রাঙ্ক আর বাক্সগুলো রয়েছে আগের মতই। কিন্তু কোন মানুষ নেই। চিলেকোঠা থেকে লোকটা সিঁড়িঘরে বেরোনোর আগেই সে উঠে যেতে চায়।

নিরাপদেই পৌঁছল। কিন্তু মানুষ দেখতে পেল না। শূন্য চিলে কোঠা। বুককেস, ট্রাঙ্ক, বাক্স সব আগের মতই রয়েছে। মানুষ নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল সে।

কোন শব্দ নেই।

বেরিয়ে এল আবার সিঁড়িতে। নিচে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'কিছুই নেই,' কিশোর জানাল। 'আমরা…আমরা নিশ্চয় কোন ধরনের হ্যালুসিনেশনের মধ্যে ছিলাম!'

'আমি বিশ্বাস করি না!'

'কেউ নেই এখানে।' চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'তবে এই সিঁড়ি বাদে আসাযাওয়ার আর কোন পথ যদি থাকে, আলাদা কথা। হ্যাঁ, তা-ই হয়েছে। পুরনো বাড়ি একটা। গোপন পথ থাকতেই পারে। আগের দিনে লোকে গুপ্তপথ তৈরি করে রাখত। এই পথের খবর যে ওখানে উঠেছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না।'

রবিনের পেছনে হলঘরে এসে ঢুকল এলেনা। পরনের শোবার পোশাকটা দুমড়ে কুঁচকে গেছে। ভারি হয়ে আছে চেহারা। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে? কিশোর, ওখানে কি করছো?'

'এলেনা,' মেয়েটার অনুরোধেই তাকে মিস লিসটার বলা বাদ দিয়েছে কিশোর। 'এ বাড়িতে কি কোন গোপন পথ আছে? চিলেকোঠায় ওঠা যায়?'

'জানি না তো?'

'কোন গুজব শুনেছেন পথটা সম্পর্কে।'

মাথা নাড়ল এলেনা। 'না।'

খুঁজতে লাগল কিশোর। বাক্স আর ট্রাঙ্কের পিছনে দেখল। চিমনির কাছের

জিনিসপত্র সরাল, যদি কোন গুপ্তদরজা থেকে থাকে ওখানে সে আশায়। রান্নাঘর থেকে একটা টর্চ নিয়ে এল। কাঠের মেঝের শেষ প্রান্তে যেখানে ঢালু হয়ে কড়িকাঠের ওপর নেমে এসেছে ছাত; সেখানে খানিকটা খোলা জায়গা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে সেখানটায় চলে এল। শোবার ঘরের ছাতের কিছুটা জায়গার প্লাসটার চোখে পড়ে এখান থেকে। তবে বেরোনোর মত কোন পথ নেই। বহু বছরে অনেক ময়লা জমেছে ওখানে। আর এমন টুকিটাকি জিনিস, যেসব ফেলে দিয়ে তারপর ভুলে যায় লোকে। যেমন, একটা পুরনো গলফ বল, একটা কোকা কোলার বোতল, আর দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়া কিছু কাগজ।

চিলেকোঠার প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখে তারপর বেরোল কিশোর। নেমে এল নিচের হলঘরে। রবিন আর এলেনা বসে রয়েছে ওখানে।

'আশ্চর্য!' পথ নেই শুনে বলল রবিন।

'সব তোমাদের কল্পনা,' বলল এলেনা।

নিজের ঘরে গিয়ে আবার দরজা দিল সে।

শোবার ঘর থেকে গিয়ে কম্বলটা নিয়ে এল রবিন। শরীর মুড়ে বসে পড়ল কিশোরের আর্মচেয়ারের পাশে।

'শোবে না আর?' কিশোর বলল, 'এখন আমার ডিউটি। চলে যাও।'

'একা যেতে আর ভাল্লাগছে না। এখানেই থাকি।'

বাকি রাতটা ওখানে বসেই কাটাল দু'জনে। তাকিয়ে রইল সিঁড়িতে যাওয়ার পথের দিকে। একটু পর পরই মুখ তোলে ছাতের দিকে। কান সজাগ। এমনি করেই ভোর হল।

আরেক বার পায়ের আওয়াজ শুনল বলে মনে হল রবিনের। তবে এত হালকা, নিশ্চিত হতে পারল না সত্যিই শুনেছে কিনা।

অবশেষে পাতলা ধূসর আলো দেখা দিল জানালায়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। শেষ হল দীর্ঘ, বিরক্তিকর পাহারার পালা।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোর। তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ শুনেছে। নিচতলায়। রান্নাঘরের দরজা খুলল। ওখানে কেউ রয়েছে। যার কাছে চাবি আছে।

একলাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কিশোর। অস্ত্র। একটা অস্ত্র দরকার। খালি হাতে আর যাবে না।

কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রবিন।

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে শব্দ করতে মানা করল কিশোর। চুপ থাকতে ইশারা করল। চিলেকোঠার সিঁড়ির দেয়ালে ঝোলানো একটা পিতলের বাসন দেখতে পেয়ে সেটাই খুলে নিল। ভাল কোন অস্ত্র নয়, তবে হাতে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে ভাল।

পেছনের সিঁড়ি ধরে ছুটে নামতে শুরু করল। পেছনে রবিন।

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে রান্নাঘরের ভেতরে তাকানোর চেষ্টা করল। রান্নাঘরের দরজার ওপরের অর্ধেকটা কাচের। কিন্তু অন্য পাশে কাপড়ের পর্দা লাগানো থাকায় এপাশ থেকে ভেতরটা দেখা যায় না। দরজা না খুলে ভেতরে কে আছে দেখার

উপায় নেই।

সামনে এগোল কিশোর। বাসনটা শক্ত করে ধরল।

মৃদু একটা খটখট শব্দ হচ্ছিল। থেমে গেল সেটা। হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা।

বাড়ি মারার জন্যে বাসন তুলল কিশোর।

সাত

'ও বাবা গো!'

চিৎকার করে পিছিয়ে গেল ধূসর চুল এক মহিলা। বাসনের বাড়ি থেকে বাঁচানোর জন্যে দু'হাত তুলে নিয়ে এল মাথার ওপর।

পাথর হয়ে গেছে যেন কিশোর। একটা সেকেণ্ড জমেই রইল সে, বাসনটা তোলা। মহিলার হাতের বাজারের থলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল এই মানুষের কাছ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। 'সরি,' বলে বাসনটা নামিয়ে নিল সে।

'পুলিশ!' আবার চিৎকার করে উঠল মহিলা। 'বাঁচাও!' বলেই ঘুরে দিল দৌড়। গেটের দিকে।

'আরে শুনুন শুনুন!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'প্লীজ! এক মিনিট!'

শোবার পোশাক পরে খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল এলেনা। মহিলাকে দেখতে পেয়ে সে-ও চেঁচিয়ে ডাকল, 'মিসেস বেকার, শুনুন শুনুন!'

কিশোরের পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। মহিলা অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল। 'শুনুন। ওরা ভাল ছেলে। কিছু করবে না।'

ধীরে ধীরে ফিরে এল আবার মহিলা।

'রবিন, কিশোর,' পরিচয় করিয়ে দিল এলেনা। 'ও মিসেস বেকার। আমাদের হাউসকীপার। মিসেস বেকার, ওরা আমার বডিগার্ড।'

কড়া চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাতে লাগল মিসেস বেকার, বিশেষ করে কিশোরের দিকে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। কিশোরের মনে হল বহু বছর পর এত জোরে দৌড়েছে মহিলা।

'বডিগার্ড?' মহিলার চোখে সন্দেহ। 'গুপ্তধন পেয়েছ নাকি? বডিগার্ড লাগে কেন? তোমার আব্বাই বা কোথায়? তোমার জন্যে তিনিই তো যথেষ্ট। যে কোন মানুষের জন্যেই! শয়তানও কাছে ঘেঁষবে না।'

'আব্বা নেই। নিরুদ্দেশ। কাল থেকে। কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।'

'কিডন্যাপ? বল কি!'

'ঠিকই বলছি,' এলেনা বলল। বাবার রহস্যময় নিরুদ্দেশের কথা খুলে বলল। র‍্যানসমের নোটটাও দেখাল মিসেস বেকারকে। 'এরা আমাকে সাহায্য করছে,' গোয়েন্দাদের দেখিয়ে বলল সে। 'বিশপের বই খুঁজছি আমরা। ঈশ্বরই জানেন ওটা কি! ওই নামটা আব্বার মুখে কখনও শুনেছেন?'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল মিসেস বেকার। 'পাদ্রী-(বিশপ)র সঙ্গে তোমার আব্বার বনিবনা হবে না। কোনদিন হয়েছে বলেও মনে হয় না। তুমি বলতে চাইছ

কেউ বাড়িতে ঢুকে, তোমার আব্বাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই নোট পাঠিয়েছে? ফ্যাকাসে ওই ছোকরাটাকে জামাই করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাঁর, তুমি জান। আমারও পছন্দ নয় ছেলেটাকে। পছন্দ করার মত কিছু থাকলে তো করব। তোমার কাছে হেরে গিয়ে ওই পার্টি দেয়াটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে তোমার আব্বার। কিন্তু রাজি তুমি করিয়ে ছেড়েছ। আর দিয়েছ রোববারে, এমন একটা দিনে যেদিন আমার ডিউটি নেই। তোমার বাবা কিডন্যাপ হয়েছেন বলছ? আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় চলে গেছেন লুকিয়ে, নোট পাঠিয়েছেন তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে। আসলে কায়দা করে তোমার বিয়েটা ঠেকাতে চাইছেন।'

'না,' জোর দিয়ে বলল এলেনা। 'আমার তা মনে হয় না। নিজে নিজেই চলে গেছে একথা ভেবে চুপ করে থাকতে পারব না আমি। ঝুঁকিটা নেয়া কি ঠিক আপনিই বলুন? কিডন্যাপাররা যদি কোন ক্ষতি করে তার?'

মাথা নাড়তে লাগল মিসেস বেকার। 'বিচ্ছিরি অবস্থা।' বাজারের থলেতে হাত ঢুকিয়ে একটা অ্যাপ্রন বের করে আনল। সেটা পরে নিয়ে নাস্তা বানাতে বসল। কথা বলে চলেছে একনাগাড়ে। 'বাড়ি হল এটা একটা? অভিশাপ আছে এর ওপর। সব সময়ই খারাপ ঘটনা ঘটছে। বাড়িটা বানিয়েছিল ডিক ব্রাউন নামে এক লোক। আমার পড়শী শেলি টেনারের কাছে শুনেছি এসব। ব্রাউন খুব ধনী লোক ছিল। কিন্তু যেদিন বাড়িটা তৈরি শেষ হল সেদিনই সব কিছু খোয়াল। স্টক মার্কেট ধসে পড়ল, সেটা কবে যেন? হ্যাঁ, উনিশ শো উনত্রিশ সালে। ব্রাউন এখানে থাকতে আসেনি। বহু বছর খালিই পড়ে রইল বাড়িটা। তারপর, আমি যেই নিউ ইয়র্কে চলে গেলাম কার্পলি নামের এক পরিবার বাড়িটা কিনল। ওদের কথা মনে আছে আমার। ভদ্রলোক বেশ বড়সড় শরীরের মানুষ ছিলেন, একদিন পড়ে গেলেন সিঁড়ি থেকে। কোমর ভাঙলেন। জীবনে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। হাঁটাচলা বাদ।

'কার্পলিদের পরে এল মিস হ্যামারসন। বৃদ্ধা। অনেক টাকার ম্যালিক। একা মানুষ। সেজন্যেই বোধ করি তার এক ভাস্তিকে নিয়ে এল। মেয়েটাকে আমি দেখেছি। সুন্দর ছিল খুব। কিন্তু বিষণ্ন। সারাক্ষণই মন খারাপ করে রাখত। এর জন্যে অবশ্যই মিস হ্যামারসন দায়ী। বেশি কড়াকড়ি করত মেয়েটার সঙ্গে। ইস্কুল থেকে এসেই রাতের খাবার বানাতে সাহায্য করতে হত ফুফুকে। মিস হ্যামারসন বলত, কাজ করা ভাল, তাতে আখেরে উন্নতি হয়। চরিত্র ঠিক হয়। আমার বিশ্বাস, চাকরের পয়সা বাঁচাতেই মেয়েটাকে এনেছিল বুড়ি। সাংঘাতিক কিপটে ছিল তো। আহারে, বেচারি মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হত আমার। ওর বয়েসী ছেলেমেয়েরা যখন খেলত, কিংবা গল্প করত, সে তখন খেটে মরত রান্নাঘরে।

'মেয়েটার চোদ্দ বছর বয়েস তখন। একদিন একটা চুলের কাঁটা হারিয়ে গেল মিস হ্যামারসনের। দোষ দিয়ে বসল মেয়েটাকে। বলল সে-ই চুরি করেছে। রাগ করে তখন মেয়েটাকে তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দিল। শুনেছি, কয়েক বছর পর একটা শয়তান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে মেয়েটা। তার পর যা হয় তা-ই হল। কিছু দিন পর মেয়েটাকে ফেলে রেখে পালাল ছোকরা। শেষ খবর যা জানি,

স্যানফ্র্যানসিসকোয় আছে মেয়েটা। একটা মার্কেটে চাকরি করে।'

ডিম, টোস্ট আর ভাজা মাংস এনে টেবিলে সাজিয়ে দিল মিসেস বেকার। এক কাপ কফি খাবার জন্যে নিজেও বসল সবার সঙ্গে।

'এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে, শুনেছেন কখনও?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'এখানে যেসব কাণ্ড হয়েছে তাতে নিশ্চয় অনেক কানাঘুষা করেছে লোকে। গুজব রটেছে।'

'লোকে তো বলেই,' মিসেস বেকার বলল। 'আর পুরনো বাড়ির ব্যাপারে খামোকাই অনেক কথা বলে, কিছু না থাকলেও। তবে এ বাড়ি সম্পর্কে আমি তেমন কিছু শুনিনি। কিছু দেখিওনি। বাড়িটা আনলাকি, একথাই শুধু বলতে পারি। আর মাঝে মাঝে, মেঘলা দিনে এমন মনে হয়…মনে হয় কি যেন তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে! লুকিয়ে আমাকে দেখছে। কেন যে এমন লাগে বলতে পারব না। রাতের বেলা আর কিছুতেই থাকতে রাজি নই আমি এখানে।'

'যত্তোসব ছেঁদো কথা!' বিড় বিড় করল এলেনা।

'চিলেকোঠায় ঘুরে বেড়ানো কোন কিছুর কথা আপনি শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চিলেকোঠায়?' মাথা নাড়ল মিসেস বেকার। 'নাহ্! ওরকম কিছুই শুনিনি আমি। চিলেকোঠায় কিংবা কোনখানেই কিছু আছে বলে জানি না। শুধু…শুধু আমার মনে হয়, আছে। কোথাও কোন একটা ব্যাপার রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারি না।'

কফির কাপে ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিল মিসেস বেকার। গম্ভীর হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গটা বদল করল দুই গোয়েন্দা। মিসেস বেকার তেমন কোন তথ্য দিতে পারল না ওদেরকে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল ওরা, গত রাতের ঘটনাটা এ বাড়িতে নতুন।

নাস্তা শেষ করে, এলেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল মেরিচাচীর সঙ্গে। কিশোর ভেবেছিল, তাকে দেখলেই নানা কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করবেন তিনি। কিন্তু করলেন না। ফুরসৎ নেই। কাজে ব্যস্ত। প্যাসাডেনায় একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন করে তোলা হবে। ওটার যত পুরনো জিনিসপত্র আছে সব কিনে নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা। শুধু তাই নয়, পুরনো ইঁটও নিয়ে এসেছেন। সুড়কি লেগে রয়েছে। কিশোর আর রবিনকে দেখেই কাজে লাগিয়ে দিলেন মেরিচাচী। ইঁট পরিষ্কারের কাজ।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল কিশোরের। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। মেরিচাচীর মুখের ওপর না বলার সাহস নেই তার। কাজ শেষ করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে এল দু'জনে। খেতে দিলেন চাচী। স্যাণ্ডউইচ। ডাইনিং রুমে বসে না খেয়ে সেগুলো নিয়ে ওয়ার্কশপে চলে এল ওরা।

বেঞ্চে বসে খাবার চিবুচ্ছে, এই সময় মাথার ওপরের লাল আলোটা জ্বলে-নিভে জানান দিল হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে।

৮

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্রেলারে ঢুকল দু'জনে। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। ফোন করেছে ডেভিড লিসটারের সেক্রেটারি কডি হোয়েরটা।

'এলেনা বলল তোমাকে ফোন করতে। সারা সকাল ধরে সেই রহস্যময় বইটা খুঁজেছি। পাইনি। তখন এলেনা বলল, তার আব্বার কমপিউটারে খোঁজ নিতে। ফাইল দেখলে হয়ত কিছু জানা যাবে। কিন্তু ফাইল বের করার সংকেত জানি না। এলেনা তোমাকে আসতে বলেছে। তার ধারণা, তুমি কিছু করতে পারবে।'

রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে হোয়েরটা কি বলেছে বলল। জিজ্ঞেস করল, 'যাবে নাকি?'

'যাব।'

হাত সরিয়ে নিয়ে হোয়েরটাকে বলল কিশোর, 'আমরা আসছি।'

বাইরে বেরিয়েই মুসাকে দেখতে পেল ওরা। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলছে সহকারী গোয়েন্দা। লিসটারের বাড়িতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করল তাকে কিশোর। বলল, 'এলেনা আমাদের সহ্য করে নিয়েছে।'

'আমি তাকে পারব কিনা জানি না,' মুসা বলল। 'বাপের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

কিন্তু রবিন আর কিশোর যখন রওনা হল ঠিকই ওদের সঙ্গে চলল সে। কয়েক মিনিট পরেই লিসটারের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। বেল বাজাল। মিসেস বেকার খুলে দিল দরজা। এক হাতে একটা স্প্রে, উইনডো ক্লীনার, আরেক হাতে একমুঠো পেপার টাওয়েল, জানালা পরিষ্কার করছিল বোধহয়। খুশি খুশি গলায় বলল, 'এদ্দিন পরে সুযোগ পেলাম। সব ময়লা এবার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। বুড়োটার জ্বালায় পারতাম না। ছুঁতেই দিত না কোন কিছু। তোমরা যাও। এলেনা আর কডি কমপিউটার রুমে অপেক্ষা করছে।'

ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওনা হল মিসেস বেকার। তার পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ির মাথায় উঠে ইশারায় কমপিউটার রুমের দিকে যেতে বলে নিজে গিয়ে ঢুকল একটা শোবার ঘরে।

দুটো কমপিউটারের মধ্যে যেটা ছোট, সেটার সামনে বসে রয়েছে হোয়েরটা। চাবি টিপছে। প্রতিটি চাপের পর পরই টিঁইট টিঁইট শব্দ করছে কমপিউটার।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এলেনা।

'এটা আব্বার ব্যক্তিগত কমপিউটার,' ছেলেদেরকে জানাল সে। 'আব্বার অফিসে যে কমপিউটার সিসটেম রয়েছে তারই একটা অংশ এই বড়টা। তবে ছোটটা একেবারে আলাদা। এটার সঙ্গে কোনটার যোগাযোগ নেই। মডেম নেই, কাজেই বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না এটাতে। সংকেতটা বের করতে পারলেই তার ফাইলগুলো দেখতে পারব। এমনও হতে পারে, বিশপের বই আসলে বইই নয়, অন্য কোন কিছুর সংকেত। কোড নেম।'

মাথা নাড়ল হোয়েরটা। 'বই না ছাই। আসলে মিস্টার লিসটারের ওপর ভীষণ রাগ আছে কারও। শোধ তুলছে। তিনি নিখোঁজ হলে অনেকেরই সুবিধে হয়, অনেকেই খুশি হবে। কি জানি কি করেছেন। মাথায় ছিট আছে তো। হয়ত

নিজেই বেরিয়ে চলে গেছেন।'

'উনি তোমার বস!' কঠিন কণ্ঠে বলল এলেনা। 'ভদ্রভাবে কথা বল!'

'সরি,' কীবোর্ডের দিকে ফিরল হোয়েরটা। 'কর্মচারীদের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করেন তিনি,' তিন গোয়েন্দাকে বলল সে। 'তাদের অতীত জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, সব। যেহেতু আমি তাঁর সেক্রেটারি, তাই জানি। এসব জানতে হলে গোয়েন্দা লাগাতে হয়। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর। তাদের বিলগুলো আমাকেই করতে হয়। তবে রিপোর্ট আমাকে দেখতে দেয়া হয় না। সেটা শুধু মিস্টার লিসটারই দেখেন। আমার বিশ্বাস কিছু কিছু কর্মচারীর অতীত এত বেশি গোলমেলে, অফিসের ফাইলে সেগুলো রাখা যায় না। তাই ব্যক্তিগত কমপিউটারে ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি। কিন্তু বিশপের বই? কোন বিশপের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই।'

'কোড নেম,' আবার বলল এলেনা। 'কোড নেম হতে পারে।'

'পাসওয়ার্ড নয়, এটা জেনে গেছি,' হোয়েরটা বলল। 'দেখলামই তো টেস্ট করে।'

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ভাবল সে। তারপর টাইপ করে লিখল 'হাসলার'।

'এইচ ইউ এস টি এল ই আর,' পড়ল মুসা। 'মানে কি?'

'হাসলার কি জান না?'

'আভিধানিক অর্থ জানি। তিনটে মানে হয়। কর্মতৎপর ব্যক্তি, যে লোক তাড়াহুড়ো করে কাজ করে এবং প্রতারক। কোনটা বোঝাতে চাইছেন?'

'ভেঙে বলি। ধর ফুটবল খেলতে নামল কোন লোক। তাকে ভালমত চেনে না অন্য খেলোয়াড়েরা। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। শুরুতে ভাল খেলতে না পারার অভিনয় করে গেল সে। তারপর সুযোগ বুঝে কায়দা করে গোল দিয়ে দিল। এমন সময় গোল, যখন প্রতিপক্ষের আর কিছুই করার থাকল না। ওই চালাকি অবশ্য মিস্টার লিসটারও পছন্দ করেন, তাই লিখলাম। চালাক লোক দরকার তাঁর। আর এমন লোক যাদের অতীত রহস্যময়, কোন গোলমাল আছে। ওই ধরনের লোককে খাটানোর সুবিধে, তার দুর্বলতা জানা থাকলে।'

'আব্বা খুব চালাক, তাই না?'

এলেনার কথার জবাব দিল না হোয়েরটা।

টিট টিট করছে কমপিউটার। মনিটরে লেখা উঠলঃ অশুদ্ধ সংকেত। আবার চেষ্টা করুন। এবার 'স্লাই ফক্স' টাইপ করল হোয়েরটা।

আবার টিট টিট করল যন্ত্র। আবার মেসেজ দিল, অশুদ্ধ। 'আমার বাবা ধূর্ত শেয়াল? তুমি...তুমি একটা শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠল আচমকা এলেনা। 'সে জন্যেই এসব লিখছ!'

'তাহলে বন্ধ করে দেব?' শীতল কণ্ঠে বলল হোয়েরটা। 'কমপিউটারে খোঁজার আইডিয়াটা কিন্তু তোমারই ছিল।'

'না, থামব না! জানতেই হবে আমাদের। কিন্তু আব্বার অপমান হয় এমন

কিছু করতে পারবে না তুমি। ভাল করেই জান ব্যবসাটা তার কাছে একটা মজার খেলা। উঁচু মানের ফুটবল কোচ বলা যায় তাকে। ভীষণ চালাক। তাতে দোষটা কোথায়? চালাক না হলে কি ব্যবসা করা যায়? আর আব্বা চায় সব সময় জিততে। জেতার জন্যে যা যা দরকার সবই করে।'

নীরবে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ঢুলু ঢুলু চোখ, যেন তন্দ্রালু হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল, 'খেলা? আপনার আব্বা ব্যবসাটাকে খেলা হিসেবে দেখেন? পাসওয়ার্ডের সূত্র এর মধ্যে নেই তো?'

দ্রুত 'গেম' শব্দটা টাইপ করে ফেলল হোয়েরটা। টিঁইট টিঁইট করে একঘেয়ে শব্দ করল যন্ত্র।

'নানা রকম খেলা চালিয়ে যান,' রবিন পরামর্শ দিল। 'ফুটবল দিয়ে শুরু করুন।'

ফুটবল দিয়ে লাভ হল না। বেজবল, বাস্কেট বল, হকি, কোনটা দিয়েই নয়।

'খেলাধুলায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না আব্বার,' এলেনা বলল। 'অন্য কিছু দিয়ে চেষ্টা করা যাক।'

'একচেটিয়া ব্যবসা করার খুব আগ্রহ,' হোয়েরটা বলল। 'মনোপলি লিখে দেখা যাক।'

তাতেও সুবিধে হল না।

'পোকার লিখে দেখুন তো,' মুসা বলল।

একে একে পোকার, জিন রামি, পিনোকল, ব্ল্যাকজ্যাক, সব কিছু দিয়েই দেখা হল। নিরাশ করল কমপিউটার।

'তাসের নাম দেয়া শুরু করি,' বলে 'এস' লিখল হোয়েরটা। তারপর কিং। সেই একই অবস্থা। কোন মেসেজ দিতে পারল না যন্ত্র। কিন্তু যেই জোকার লেখা হল, অন্য মেসেজ দেখা দিল স্ক্রীনে। 'আসুন, আমরা খেলা করি!' আমন্ত্রণ জানাল কমপিউটার।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

কমপিউটারকে একটা নির্দেশ দিল হোয়েরটা।

নামের একটা লম্বা তালিকা ফুটে উঠল মনিটরে। ডোপের ওপর একটা ফাইল খুলেছেন লিসটার। এনথনির নামেও আছে একটা। ভিজালিয়া ব্যাংকের ম্যানেজার আর বড় বড় অফিসারদের নাম চিনতে পারল হোয়েরটা। আরও অনেক নাম, এমনকি হাউসকীপার মিসেস বেকারের নামও রয়েছে ফাইলে।

আরেকটা ফাইল দেখা গেল কডি হোয়েরটার নামে।

'আপনাকেও বাদ দেননি,' মুচকি হাসল রবিন।

আড়চোখে সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে কিশোর দেখতে পেল হোয়েরটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এলেনারও নজর এড়াল না সেটা। 'আপনার ফাইলে কি আছে?'

'সাধারণত যা থাকে,' কোনমতে বলল হোয়েরটা। 'বয়েস, শিক্ষা, এসব।'

'দেখি তো,' খসখসে হয়ে গেছে এলেনার কণ্ঠ।

'এলেনা, আমার ফাইল দেখে···'

'আমি দেখব!'

শ্রাগ করল হোয়েরটা। একটা চাবি টিপল। লিস্টে তার নামের কাছে চলে এল কারসরটা। আরেকটা চাবি টিপল সে। মিলিয়ে গেল নামের তালিকা। পর্দায় ফুটল কডি হোয়েরটা। তার পরে দেখা দিলঃ আসল নাম আরনি ভিনসেনজো। বাবার নাম কার্লো ভিনসেনজো। আমাকে কিছু করার তালে আছে মনে হয়। আরও কিছুদিন কাছাকাছি রাখব। কর্মঠ লোক। আমার ভয়ে যখন কাঁপে, দরদর করে ঘামে, দেখতে খুব ভাল লাগে আমার।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হোয়েরটা। কমপিউটারের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি! আর কখনও ফিরব না!'

আট

'সর্বনাশ!' গলার কাছে হাত নিয়ে গেল এলেনা। কার্লো ভিনসেনজোর ছেলে কডি! সে-ই! কিডন্যাপ সে-ই করেছে!'

একটা ভুরু উঁচু করল কিশোর। 'সহায়তা করে থাকতে পারে। তবে সে নিজে কিডন্যাপটা করেনি। সারাক্ষণ পার্টিতে ছিল, মনে আছে? আর সহায়তাইবা করবে কেন? কার্লো ভিনসেনজোই বা কে?'

'একজন লোক···ওয়েস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন টায়ার ব্যবসায়ী। যে জায়গাটায় তার দোকান সে জায়গাটা আব্বার খুব পছন্দ। অফিসের জন্যে একটা বহুতল বাড়ি বানাতে চায় ওখানে। অনেক টাকার অফার দিয়েছে আব্বা, বিক্রি করতে রাজি হয়নি ভিনসেনজো। তখন তার দোকানের পাশে আরেকটা টায়ারের দোকান দিয়েছে আব্বা। শস্তায় ভাল জিনিস বিক্রি করছে। তাতে তার লস হলেও কেয়ার করছে না। আসলে ভিনসেনজোর ব্যবসা খারাপ করে দিয়ে তাকে ওখান থেকে তোলার জন্যেই একাজ করেছে আব্বা। টিকে থাকার চেষ্টা করেছে ভিনসেনজো। কম দামে টায়ার দেয়ার চেষ্টা করেছে। আব্বার সঙ্গে পারেনি, লস দেয়ার মত এত টাকা তার নেই। ছয় মাসের মধ্যেই কাবু হয়ে গেছে বেচারা।'

'কাজেই তার ছেলে ছদ্ম নামে চাকরি নিয়েছে এখানে,' এলেনার কথার খেই ধরল রবিন। 'আপনার আব্বার ক্ষতি করার জন্যে। কিন্তু তার আগেই আপনার আব্বা জেনে গেছেন হোয়েরটার আসল পরিচয়। হোয়েরটা কি করে ভাবতে পারল যে লোক অন্যের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে গোয়েন্দা লাগান, তাঁর বিরুদ্ধে সে কিছু করতে পারবে?'

'হয়ত ভেবেছে তার কভার স্টোরি এত ভাল যে গোয়েন্দাকে বোকা বানিয়ে দিতে পারবে,' কিশোর বলল। কীবোর্ডের সামনে বসে পড়ল। কডি হোয়েরটার ফাইলের ফুল প্রিন্ট দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে। জীবন্ত হয়ে উঠল প্রিন্টার। কটকট কটকট করে আধ মিনিটের মধ্যেই বের করে দিল হোয়েরটার ফাইল। বের করে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল কিশোর, সবাইকে শোনানোর জন্যে।

চাকরির দরখাস্তে যে ঠিকানা আর ফোন নম্বর ব্যবহার করেছে হোয়েরটা, সেটা তার হাই স্কুলের এক বন্ধুর। রুটিন চেক করে কিছু পাওয়া যায়নি। তারপর গোয়েন্দা লাগিয়েছেন লিসটার। জেনেছেন, কাজের শেষে ওশন পার্কে ভিনসেনজোর বাড়িতে রোজ যায় হোয়েরটা। প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়েছে গোয়েন্দা। বীমার দালাল পরিচয় দিয়ে। সত্যি কথাগুলো জেনে এসেছে।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'কিডন্যাপের একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না এতবড় একটা অপরাধ করতে পারে।'

'তা অবশ্য হয় না,' একমত হল এলেনা। 'আর এই বিশপের বই…এটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কডি হোয়েরটা…নাহ্, আমার ভাল লাগছে না!'

বড় কমপিউটারের সামনে বসে পড়ল সে। চোখ বন্ধ করে কপাল টিপে ধরল। 'কডি একাজ করেছে একথা বিশ্বাসই করতে পারছি না। করেওনি। তাহলে এই কমপিউটারটা নষ্ট করে দিতই, যাতে তার নাম না জানতে পারি। নাহ্, সে করেনি। অন্য কারও কাজ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ও-কে। আরও কিছু ফাইল দেখা যাক।' মিরহাম এনথনির ফাইলটার জন্যে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে।

শুরুতে এনথনির ওপরও রুটিন চেক করা হয়েছে। বিয়ে করেছিল, স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেমেয়ে নেই। লার্চমন্ট এলাকার একটা বাড়িতে বাস করে। ডি. এল. ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ম্যানেজারের পদটা নেয়ার আগে অন্য মালিকের আরেকটা স্টোরের ডিরেক্টর অভ অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে। লিসটারের স্টোরটা সান্তা মনিকায়।

খানিক পরেই এনথনির ডোসিয়ার আর সাধারণ রুটিন চেকের আওতায় থাকল না। আরও গভীরে ঢুকতে লাগল। একবার গ্রেফতার হয়েছে। একটা বীমা কোম্পানিতে জালিয়াতির অভিযোগে। একটা বাড়ির মালিক ছিল সে। আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার পর বীমা কোম্পানি সন্দেহ করে বসল এতে এনথনির হাত রয়েছে। অ্যারেস্ট করা হলেও পরে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ, কারণ কোম্পানি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। তারপর প্রথম স্টোরটায় চাকরি নিল এনথনি। সেখানেও তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সরাসরি কেউ কিছু বলেনি। তবে কানাঘুষা হয়েছে, কন্ট্রাক্টর আর সাপ্লাইয়ারদের কাছ থেকে ঘুষ নিত সে।

ফাইলের শেষে দুটো শব্দে খুব বাজে একটা মন্তব্য পেশ করা হয়েছেঃ উইমেন-চেজার। অর্থাৎ মহিলাদের পেছনে লাগার বদস্বভাব আছে।

লিসটারের উকিল ডোপের ডোসিয়ারও কম মজার নয়। ডোপ ছিল একজন জুয়াড়ি। রেসের খেলা আর পোকারে আসক্ত। স্টক মার্কেটেও বেশ বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছে। লিসটারের সন্দেহ জরুরী কাজে খরচের জন্যে যে ফাণ্ড রাখা আছে তার কাছে সেটা থেকে সে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে। বার অ্যাসোসিয়েশনে যোগাযোগ করে তার অ্যাকাউন্ট চেক করানোরও হুমকি দিয়েছেন তিনি। এক হুমকিতেই কাজ হয়ে গেছে বলে লিসটারের ধারণা।

ভিজালিয়া ব্যাংকের ম্যানেজারের ফাইল বলছে, ডোপ নেভিতে ছিল আগে। সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে, কি একটা অপরাধ করেছিল বলে। লিসটার যে একথা জেনেছেন, সেটা আবার জানিয়ে দিয়েছেন ম্যানেজারকে।

ফাইলের পর ফাইল দেখে চলল কিশোর। একের পর এক মজার তথ্য উঠে আসছে মনিটরের পর্দায়। মিসেস বেকারেরও একটা বড় রকমের দোষ রয়েছে। প্রতি হপ্তায়ই একটা বিশেষ জায়গায় জুয়া খেলতে যায়। নেশা হয়ে গেছে সেটা।

এসব দেখে কোন লাভ হবে না আমাদের,' এলেনা বলল অবশেষে। 'এখানে এমন একদল লোকের ডোসিয়ার যারা আব্বাকে দুচোখে দেখতে পারে না। ঘৃণা করে। তার কোন বন্ধু নেই। ভাবতেই খারাপ লাগছে আমার। লোকের ব্যক্তিগত জীবন ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, এটাও ভাল্লাগছে না আমার।'

কেঁদে ফেলবে যেন সে। এই একটি বার বাবার পক্ষে সাফাই গাইছে না।

কিশোরকেও স্বীকার করতে হল, এই সব গোপন ফাইল আসল কাজের কোন সাহায্য করছে না। প্রত্যেকেরই মোটিভ রয়েছে লিসটারের ক্ষতি করার। কিন্তু কোন একজন বিশেষ মানুষ বেরিয়ে আসছে না যাকে সন্দেহ করা যায়। সবাইকেই করা যায়, আবার কাউকেই করা যায় না।

'আর একটা ফাইল আছে,' বলল সে। 'এটাও দেখার দরকার।' ফাইলটার নাম 'মুজের/ভিয়েজা'। স্প্যানিশ এই শব্দের মানে 'বৃদ্ধা মহিলা'।

'বাহ্, ভাল কথা,' মুসা বলল। 'হয়ত মিসেস বেকারের সম্পর্কে আরও কিছু লেখা রয়েছে। তার দুর্বলতা যাতে প্রকাশ না হয় সে জন্যে মিস্টার লিসটারকে গায়েব করে দিয়েছে।'

'কিন্তু আবার ফেরত দেবেও বলেছে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'বিশপের বইটা দিলে। প্রতিশোধ বলতে পার। দুর্বলতা ঢাকা দেয়ার জন্যে কিডন্যাপটা করেনি।'

ওদের কথা শুনছে না কিশোর। আনমনেই বলল, 'মিসেস্ বেকারের ফাইল স্প্যানিশে লেখা থাকবে কেন?' চাবি টিপে ফাইলটা কল করল সে।

অন্য ফাইলের চেয়ে এটা আলাদা। একটা চিঠি। এলেনাকে লেখাঃ

> সোগামোসোকে দিয়ে শুরু কর। বৃদ্ধা মহিলার কাছে যাও। মধ্যগ্রীষ্মের দিনে সূর্যাস্তের সময় তার ছায়া স্পর্শ করে ঈশ্বরের অশ্রুকে। সব তোমার জন্যে। তবে সিয়েটার ব্যাপারে সাবধান থেক। সে কি লিগাল? চেক ইনস।

'চমৎকার,' এতক্ষণে খুশি হল কিশোর। চিঠিটার একটা প্রিন্ট আউট বের করে দিতে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে। কাগজের ওপর ছোটাছুটি শুরু করল প্রিন্ট হেড। এই সুযোগে এলেনার দিকে তাকাল সে। চোখে জিজ্ঞাসা।

মাথা নাড়ল এলেনা।

'কিছুই বুঝতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা বর্ণও না।'

'সিয়েটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।' বলেই সরাসরি এলেনার

চোখের দিকে তাকাল কিশোর। 'তাকে চেনেন?'

শ্রাগ করল এলেনা। 'আব্বার আরেক ফেরেশতা হবে হয়ত। কর্মচারী। ব্যবসার সহযোগীও হতে পারে। পার্টিতে কোন সিয়েটাকে আসতে দেখিনি। মারাত্মক কিছু শত্রুকে মনে হচ্ছে দাওয়াত থেকে বাদই দিয়েছিল আব্বা।'

কাঁদতে শুরু করল এলেনা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল পানি। মোছার চেষ্টা করল না সে।

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল। 'আর কোথাও কোন সূত্র আছে কিনা দেখা দরকার।'

টেবিলের ড্রয়ার ঘাঁটতে শুরু করল সে। রবিনও তাকে সাহায্য করল। একটা ছোট নোটবুক পেয়ে তুলে দেখাল। 'অ্যাড্রেস বুক। অনেক ঠিকানা আছে। হাতে লেখা।'

প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতিটা ঠিকানা খুঁটিয়ে দেখা হল, কিন্তু কোন সিয়েটাকে পাওয়া গেল না।

'আম্মা হয়ত জানতে পারে,' এলেনা বলল। সামলে নিয়েছে। 'ইদানীং আর আব্বার সঙ্গে দেখা হয় না তার, কথাও হয় না। তবে অনেক পুরনো কেউ হতে পারে, একসাথে যখন ছিল দু'জনে তখনকার কোন সিয়েটা থাকতেও পারে।'

'ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন?' মুসা জানতে চাইল।

'ইয়ে…তাতেও সমস্যা আছে। আম্মা রেগে আছে আমার ওপর। এখানে আসাটা একদম পছন্দ নয় তার। আমার হবু বরকেও দেখতে পারে না।…যাই হোক, চেষ্টা করে দেখি।'

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল এলেনা। ওপাশের কথা শুনে কানের কাছ থেকে সরিয়ে এনে বলল, 'ঘরে নেই। জবাব দিচ্ছে অ্যানসারিং মেশিন। রিসিভারে কিঁচকিঁচ শুনে তাড়াতাড়ি আবার কানে ঠেকাল সে। 'কে? আম্মা? কোথায় গিয়েছিলে? আমি। আম্মা, শোন, আব্বাকে মনে হয় কিডন্যাপ করা হয়েছে। তিনটে ছেলে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। ওরা তিন গোয়েন্দা, কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কথা বলবে?…আচ্ছা।…কিছু জানা থাকলে ওদেরকে বলে দিও। আমি চলে আসতাম তোমার কাছে, কিন্তু আব্বা বাড়িতে নেই। খালি ফেলে যেতেও পারছি না। আব্বার ব্যাপারটা ফয়সালা হলেই চলে আসব।'

মাকে গুড বাই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল এলেনা। 'যেতে পার। আমার আম্মা খুব ভাল। সবাইকেই সাধ্যমত সাহায্য করে।'

যতগুলো প্রিন্ট আউট বের করেছে, সব একখানে করল কিশোর। মায়ের ঠিকানা লিখে দিল এলেনা। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হল, মুসা থাকবে এ বাড়িতে। বাকি দিনটা। রাতটাও। মিসেস বেকার রাতে থাকে না, বাড়ি চলে যায়। তার স্বামী আছে। রবিন বাড়িতে যাবে, কিছু জরুরী কাজ আছে। সেখান থেকে মিউজিকের অফিসে গিয়ে ঢুঁ মেরে দেখে আসবে একবার কি পরিস্থিতি। রকি বীচ লাইব্রেরিতে যাবে। অনেক দিন যায় না ওখানে। অথচ কত বছর কাজ

করেছে। সময় পেয়েছে যখন লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে আসবে। আরও একটা কারণ আছে লাইব্রেরিতে যাওয়ার। রেফারেন্স বইতে সোগামোসো খুঁজবে।

'সিয়েটার রেফারেন্স খোঁজার বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই,' কিশোরকে বলল সে। 'লস অ্যাঞ্জেলেসের ফোন বুকে ওই নামের অভাব নেই। তবে সোগামোসোটা সাধারণ নাম নয়। এই রহস্য ভেদের শুরু এটা দিয়েও হতে পারে।'

'কোন লোকের নাম না-ও হতে পারে এটা,' কিশোর বলল। 'কোন জায়গা কিংবা কোম্পানির নাম হলে অবাক হব না।'

কিশোর যাবে এলেনার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এলেনা আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হল সে। সাইকেল নিয়ে চলল সান্তা মনিকায়। এই আরেকবার আফসোস হতে লাগল একটা গাড়ি নেই বলে। ভাল জিনিস ছাড়া তার মন ভরে না। আর ভাল কিনতে হলে নতুন দরকার। এত টাকা নেই। পুরনো ভাল জিনিস কে খুঁজে দেবে? মুসা তো কথা কানেই তোলে না। নিকভাইটারও দেখা নেই...

নির্জন একটা রাস্তার ধারে ভদ্রমহিলার বাড়ি। একতলা। লিসটারের বাড়ির ঠিক উল্টো। নতুন রং করা। ঝকঝকে তকতকে। সুন্দর বাগান। সবুজ লন। পায়ে চলা যে পথটা চলে গেছে বাড়ির দরজায়, সেটাতে একটা কুটোও পড়ে নেই। দিনে অনেকবার করে ঝাঁট দেয়া হয়, বোঝা যায়।

ঘন্টা বাজাতেই খুলে দিলেন এলেনার মা। সুন্দর চেহারা। কফি রঙের চুল। একই রঙের চোখ। মোটাই বলতে হবে তাঁকে। তবে চামড়া বেশ মসৃণ, কোথাও একটা ভাঁজ নেই। ডেভিড লিসটারের চেয়ে বয়স অনেক কম।

'তুমি নিশ্চয় তিন গোয়েন্দার একজন,' বললেন তিনি। 'বেরোতে হবে। বেশি সময় দিতে পারব না তোমাকে। এসো।'

হলঘরের ভেতর দিয়ে কিশোরকে লিভিং রুমে নিয়ে এলেন মহিলা। নরম সবুজ কার্পেট। সোফা আর অন্যান্য আসবাবপত্রের কভার শাদা মখমলের তৈরি।

ফায়ারপ্লেসের কাছে বড় একটা চেয়ারে বসলেন ভদ্রমহিলা। কিশোর বসল সোফায়। 'এলেনা ভাল আছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'সত্যি বল তো, ও আসছে না কেন?'

'ফোন করে খবর জানতে চাইতে পারে কিডন্যাপার,' জবাব দিল কিশোর। 'সে জন্যে রয়ে গেছে।'

'আমারও ওখানে যাওয়া উচিত, কিন্তু ভাল লাগে না। ওই বাড়িটাকে দেখলেই রাগ হয় আমার, ঘৃণা করি। ওখানে ঢোকার পর থেকে অশান্তি শুরু হল আমাদের। তার আগে ভালই ছিলাম।...এলেনা কি একা রয়েছে?'

'না। আমার বন্ধু মুসা রয়েছে তার সঙ্গে।'

'তোমার বন্ধু? নিশ্চয় তোমারই বয়েসী। পুলিশ কোথায়? এরকম পরিস্থিতিতে ওদেরকে দরকার। একটা ছেলে আর কতটা সাহায্য করতে পারবে এলেনাকে।'

'বয়েস অল্প, কিন্তু কোন বয়স্ক লোকের চেয়ে কম নয় মুসা। কারাত জানে।

গুলি চালাতে পারে। দু'চারজনকে খালি হাতেই পিটিয়ে তক্তা করে দিতে পারে। পুলিশকে খবর দিতে মানা করেছে কিডন্যাপার। হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তাহলে মিস্টার লিসটারের ক্ষতি করবে। বিশপের বইটা দিলেই তাঁকে ছেড়ে দেবে বলেছে।'

'বিশপের বই?' সামনে ঝুঁকলেন ভদ্রমহিলা। কিশোরের মনে হল অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন তিনি। যেন কোন শব্দ শুনে কান খাড়া করেছেন। অপেক্ষা করছেন আবার শোনার আশায়।

কিশোরও কান পাতল। কিছুই শুনল না। বাড়িটা বেশি নীরব।

'বিশপের বই সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

মাথা নাড়লেন ভদ্র মহিলা। 'না। কিছুই জানি না। আজকাল ডেভিড কি করছে না করছে কোন খোঁজই রাখি না আমি। এ জন্যেই কি দেখা করতে এসেছ? বইয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিতে? হাজার হাজার বই আছে ডেভিডের। ওগুলো দেখেছ?'

'দেখেছি। কিডন্যাপার যেটা খুঁজছে সেটা পাইনি। আপনি সিয়েটা নামে কাউকে চেনেন? আর সোগামোসো?'

'সোগা…কি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আমি খুব একটা সাহায্য করতে পারছি না, তাই না?' বললেন ভদ্রমহিলা। 'সরি। জানলে অবশ্যই বলতাম। আবার বল তো নামটা। সিয়েটা বাদে আরেকটার কথা যেটা বললে?'

'সোগামোসো।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'সরি।'

'মিস্টার লিসটারকে কি কখনও বৃদ্ধা মহিলার কথা বলতে শুনেছেন? স্প্যানিশে ওটার মানে মুজের ভিয়েজা।'

বলতে পারলেন না তিনি। ঈশ্বরের অশ্রুর কথাও তিনি কিছু জানেন না। দ্রুত জবাব সারছেন। কিশোর চলে গেলেই খুশি হন।

'ঈশ্বরের অশ্রু বেশ কাব্য করে বলা হয়েছে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু ডেভিড কবিতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সরি, আমি কিছুই বলতে পারব না। আইলিন লিসটারে খোঁজ নিয়েছ? অনেক সময় ওখানে জিনিস রাখে ডেভিড।'

'আইলিন লিসটার?'

'ওর ইয়টের নাম। আমার আর ডেভিডের নামে জাহাজটার নাম রেখেছে ও। ওটা কেনার সময় সম্পর্ক ভালোই ছিল আমাদের।'

উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। যেতে হবে এবার, সে কথা আর মুখ ফুটে বলতে হল না কিশোরকে। সে-ও উঠল। মহিলার পিছু পিছু চলে এল দরজার কাছে। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে পড়ে আপনার, আমাদের তদন্তে সাহায্য হবে ভাবেন, তাহলে দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করবেন।'

করবেন, বললেন তিনি। বেরিয়ে এল কিশোর।

মোড়ের কাছে এসে থামতে হল তাকে। একটা বাসকে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে। পেছন ফিরে তাকাল একবার, এলেনার মায়ের বাড়ির দিকে।

গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক বেরিয়ে আসছে পায়েচলা পথ ধরে বড় রাস্তার দিকে। লোকটাকে আগে দেখেছে কিশোর। লিসটারের বাড়িতে। এলেনার পার্টির একজন মেহমান ছিল ওই লোক।

'এনথনি!' বিড়বিড় করল বিস্মিত কিশোর।

লিসটারকে সরিয়ে দেয়ার যথেষ্ট মোটিভ রয়েছে লোকটার। ও বাড়িতে কি করছে সে? কিশোর যখন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল তখন নিশ্চয় সে বাড়িতে ছিল ও। দু'জনের কথা নিশ্চয় শুনেছে। কল্পনায় দেখতে পেল কিশোর, রান্নাঘরে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, দরজায় কান পেতে।

এ কারণেই উত্তেজিত হয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া করে বের করে দিতে চেয়েছিলেন কিশোরকে। বাইরে যাওয়ার কথা নয় তাঁর। ঘরে লোক রেখে বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যাপারটা কি? এলেনার মা আর এনথনি মিলে ষড়যন্ত্র করেছে? মহিলার চেহারা দেখে মনেই হয় না এরকম একটা অপরাধ করতে পারেন। তবে বলা যায় না কিছুই। অপরাধ জগৎ এমনই একটা জগৎ, যেখানে যা খুশি ঘটতে পারে। চেহারা কোন ব্যাপার নয়। যেটা অসম্ভব বলে মনে হয়, সেটাই ঘটে যেতে পারে।

রাস্তা পেরোল এনথনি। কিছুদূরে পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল। জ্বলে উঠল ব্রেক লাইট। একজস্ট পাইপ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া বেরোল। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

সাইকেল ঘোরাল কিশোর। পিছু নিল গাড়িটার। দু'শো গজ পেছনে থেকে অনুসরণ করে চলল। পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডাল করছে, যতোটা জোরে সম্ভব ঘোরাতে চাইছে চাকা।

নয়

যে সময় আসবে আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক পরে লাইব্রেরিতে আসতে পারল রবিন। কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করবে?—ঢুকেই ভাবল। টেলিফোন ডিরেক্টরির কথা প্রথমেই বাদ দিয়ে দিল। লাভ হবে না। তবু একবার চোখ বোলাতে অসুবিধে কি?

লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময় করে এল প্রথমে। তারপর ডিরেক্টরিটা দেখতে বসল। লস অ্যাঞ্জেলেস টেলিফোন বুকে সিয়েটার অভাব নেই। তবে একটা সোগামোসোও চোখে পড়ল না।

লিসটারের কমপিউটারে করা মেসেজের প্রিন্ট আউটটা বের করে টেবিলে বিছাল সে। শব্দগুলো যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। সোগামোসোকে দিয়ে শুরু কর…

কি করব? ভাবছে রবিন। মেসেজটায় সাঙ্কেতিক কথা রয়েছে। মানে বের করতে হলে আগে সিয়েটা আর সোগামোসোকে খুঁজে বের করতে হবে। শেষ শব্দ ইনস, আই এন এস। ইনিশিয়ালের সংক্ষেপও হতে পারে ওটা, কিংবা ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড নেচারালাইজেশন সার্ভিসের আদ্যাক্ষর। সিয়েটা হয়ত একজন ইলিগাল লোক এদেশে, অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছে। জানতে পারলে খুব সুবিধে হবে কি? সিয়েটার খোঁজ পেলে তাকে আই এন এস-এর হাতে ধরিয়ে দেয়ার কথা বলেননি তো এলেনাকে লিসটার? দূর! কিছু বোঝা না গেলে রাগই লাগে।

আর এরকম একটা নোটই বা কেন কমপিউটারের মেমোরিতে রেখে গেলেন লিসটার? কমপিউটারে আগ্রহ নেই এলেনার। মেসেজটা যে দেখবেই এরকম কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

হতে পারে, এর চেয়ে ভাল আর কোন উপায় বের করতে পারেননি লিসটার, তাড়াহুড়ায়। হয়ত হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছেন বিপদে পড়তে চলেছেন তিনি। যে লোকটা তাঁর হুমকির কারণ, কমপিউটার সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকলে নিরাপদে থাকবে মেসেজটা। কিন্তু এলেনাও যদি কিছু বুঝতে না পারে, ওই মেসেজ কোন উপকার করবে না তার।

রেফারেন্সের বই রাখা হয় যেসব তাকে সেখানে এসে দাঁড়াল রবিন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর অনেক ডিরেক্টরি রয়েছে এখানে। ডেভিড লিসটার ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসার সঙ্গে সোগামোসোর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। বড় একটা বইতে আমেরিকান কোম্পানিগুলোর তালিকা রয়েছে। নাম রাখা হয়েছে, 'স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাণ্ড পুয়োর'স'। সেটাতে সোগামোসো খুঁজল সে। পেল না। তারপর খুঁজল 'দা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' এবং 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনে। সোগামোসোর চিহ্নও নেই। 'হু'জ হু'-এর যতগুলো সংস্করণ পেল, সবগুলোতে দেখল, কোনটাতেই পাওয়া গেল না ওই নাম।

বিখ্যাত লোক নয় সোগামোসো, বোঝা গেল। ব্যবসায় জড়িত নয়। পুরোপুরি অন্য কিছু। স্প্যানিশ কোন শব্দ নয় তো? স্প্যানিশ শব্দ ব্যবহার করেছেন লিসটার। স্প্যানিশ টু ইংলিশ ডিকশনারিটা নামিয়ে আনল সে। পেল না ওটাতেও। বোকা হয়ে গেল। রেফারেন্স সেকশনের সব চেয়ে নিচের তাকটায় রয়েছে ম্যাপ। বড় একটা বই এনে ফেলল টেবিলে। অবশেষে দেখা মিলল সোগামোসোর।

কলাম্বিয়ার একটা শহর সোগামোসো।

'দশ মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে লাইব্রেরি!' ঘোষণা করল পাবলিক অ্যাড্রেস সিসটেমের যান্ত্রিক কণ্ঠ।

ইনডেক্স দেখে দ্রুত পাতা ওল্টাল রবিন। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটা ম্যাপ বেরিয়ে পড়ল। কলাম্বিয়া রয়েছে ওখানে। বেগুনী রঙে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। শাদাটে রঙে আঁকা রয়েছে অ্যানিডজ পর্বতমালা।

তেরছা দৃষ্টিতে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সোগামোসো! ইনডেক্সে বলা হয়েছে, শহরটার লোকসংখ্যা ঊনচল্লিশ হাজার। তার মানে বড় শহর নয়।

বোগোটার উত্তর-পুবে শাদা পর্বতের গায়ে ছোট্ট একটা ফোঁটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে সোগামোসো। এত দূরের একটা অঞ্চলে বৃদ্ধা মহিলাকে খুঁজতে কেন যেতে বলেছেন লিসটার? আসলেই কি তেমন কোন মহিলা আছে? বিশেষ কোন মহিলা? না যে কোন মহিলা হলেই চলবে?

ম্যাপের পাশে সোগামোসোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

'কলাম্বিয়ায় বসতি তেমন জমে ওঠেনি,' পড়ছে রবিন। 'মানুষজন বাস করে শুধু উপকূলের কাছে, আর অ্যানডিজ পর্বতমালার পশ্চিম দিকের পাদদেশে। উপকূলের কাছের ভেজা অঞ্চলে ইক্ষু আর ক্যাকাও-এর চাষ হয়। আর অনেক উঁচুতে, তিন থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় বিশ্বের সব চেয়ে বড় কফি খেত রয়েছে। উপত্যকায় জন্মে বার্লি আর গম। পাহাড়ী চারণভূমিতে ভেড়া চরার ব্যবস্থা আছে, তাই বিপুল পরিমাণে ভেড়া পোষা হয় সেখানে। অ্যানটিওকুইয়া ভ্যালিতে রয়েছে টেক্সটাইল মিল। সোগামোসোর কাছে কয়লা আর লোহার খনি রয়েছে, তাই সেখানে গড়ে উঠেছে ইস্পাতের কারখানা। সোনা আর পান্নার খনিও রয়েছে পর্বতের গায়ে। বেশির ভাগ কলাম্বিয়ানই কফির আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।'

মিটমিট করতে লাগল মাথার ওপরের আলো। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে লাইব্রেরি,' ঘোষণা করল লাউড স্পীকার।

ম্যাপটা ঠেলে সরিয়ে তাড়াহুড়া করে এনসাইক্লোপেডিয়ার তাকগুলোর কাছে চলে এল রবিন। 'আমেরিকানা'য় বেশ কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা রয়েছে কলাম্বিয়া সম্পর্কে। ব্রিটানিকাতেও বেশ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সব পড়ার সময় নেই। রেফারেন্স বই লাইব্রেরির বাইরে নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই।

আবার জ্বলতে লাগল আলো। তাকের কাছে দৌড়ে গেল রবিন। দক্ষিণ আমেরিকার ওপর লেখা দুটো বই বের করল। একটার নাম কলাম্বিয়া, ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড কনট্রাস্টস। আরেকটা কলাম্বিয়া, ফ্রম নিউ গ্র্যানাডা টু বলিভার।

মেসেজটা টেবিল থেকে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে চেকআউট ডেস্কে চলে এল সে। একটু পরেই বেরিয়ে এল বাইরে, লাইব্রেরির গেটের পাশের সাইকেল র‍্যাক থেকে সাইকেল বের করল। কলাম্বিয়ার ওপরে লেখা বইগুলো পড়তে পারলে খুশি হত। যতগুলো রয়েছে লাইব্রেরিতে। সময় পায়নি। যেদুটো নিয়েছে সেগুলো পড়ার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সে। কোন সূত্র মিলতেও পারে, যা দিয়ে লিসটার রহস্যের সমাধান হবে।

প্রায় দশটা বাজে। পায়ের শব্দ শুনতে পেল মুসা। লিভিং রুমে রয়েছে সে আর এলেনা। রেস্টুরেন্ট থেকে ফ্রাইড চিকেন এনে খেয়েছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলে দিয়ে আরাম করে বসেছে। বেশি গরম হয়ে গেছে ঘর। তবে বেশ আলো হয়েছে। অন্ধকার ছায়াগুলোকে একেবারে ঘরের কোণে ঠেলে নিয়ে গেছে যেন আগুনের লালচে আভা।

তাস খেলছিল দু'জনে। এলেনা জিতছিল। এই সময় থেমে যেতে হল পায়ের

শব্দে। শুনেই বুঝল মুসা চিলেকোঠার দিকে যাচ্ছে কেউ। নীরব বাড়িটাতে সেই শব্দ বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, যেন সমস্ত বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

দমে গেল মুসা। ওপরতলায় যেতে চায় না সে। লিসটারের বাড়িটা ভাল লাগেনি। কেমন যেন! ভূত থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানকার সব কিছুই তার অপছন্দ। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। অনেক ধোয়ামোছা দরকার। দরজা-জানালা সব খুলে দিয়ে রোদ বাতাস লাগানো দরকার। আর এমন একটা চিলেকোঠা রয়েছে যেটা কারও প্রয়োজনই নেই, কেউ ব্যবহার করে না। গত রাতেও নাকি পায়ের শব্দ পাওয়া গেছে, অথচ রবিন আর কিশোর গিয়ে কিছুই দেখেনি।

গত রাতে হয়েছিল, আজ আবার শুরু হয়েছে।

মুখ তুলল এলেনা। 'শুনছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

না বলতে চাইল মুসা। কিছুই বলতে পারল না। আরেকদিকে মুখ ফেরাল।

'পেছনের দরজায় তালা লাগিয়েছিলে?' এলেনার প্রশ্ন।

'আমি তো মনে করেছি আপনি লাগিয়েছেন।'

উঠে দাঁড়াল এলেনা। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'কেউ ঢুকেছে।'

'ওপথে ঢুকলে শুনতে পেতাম। দরজা খুললেই টের পেয়ে যেতাম আমরা।'

রান্নাঘরের দিকে এগোল মুসা। দরজাটা পরীক্ষা করল। তালা দেয়া। ছিটকানি লাগানো ওপথে। কেউ আসেনি।

নাকি কেউ ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকানি লাগিয়ে দিয়েছে?

রান্নাঘরে এসে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল এলেনা। ভ্রূকুটি করল। তারপর পিছিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে হলে চলে এল মুসা। সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে এলেনা।

'শুনছো!' এলেনা বলল।

জোরালো হয়েছে পদশব্দ। চিলেকোঠার কাঠের মেঝেতে ফাঁপা আওয়াজ তুলছে।

'মরুক!' টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এল এলেনা। রিসিভার তুলে ৯১১ ডায়াল করল। 'শয়তানটার কথা পুলিশকে না বলে আর পারছি না।'

শয়তান, অর্থাৎ মানুষের কথা বলছে এলেনা। কিন্তু আসলে কি মানুষ? কিশোর বলেছে গতরাতে সিঁড়ি দিয়ে কাউকে উঠতে দেখেনি। কাউকে নামতেও দেখেনি। কিন্তু চিলেকোঠায় গিয়েছিল কেউ। হেঁটেছিল।

'আমার ভাল্লাগছে না!' বলেই ফেলল মুসা।

শুনলই না যেন এলেনা। লাইনের অন্য পাশে ডিসপ্যাচারকে ঠিকানা বলছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মুসা। কাঁপছে সে। গলা এত শুকিয়ে গেছে ঢোকই গিলতে পারছে না। তবু উঠছে...এক ধাপ...আরেক ধাপ...আরও এক ধাপ...

চিলেকোঠায় পায়চারি চলছেই। ভূত? নাকি ভূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু?'

রিসিভার রেখে মুসাকে অনুসরণ করল এলেনা। সে-ও ভয় পেয়েছে। মুসার

কাছাকাছি থাকতে চাইছে।

'যখন ছোট ছিলাম,' বলল সে। 'আমাদের বাড়িতে একজন বাবুর্চি ছিল। মানুষকে ভয় দেখানোর ওস্তাদ। বিশেষ করে ছোটদেরকে। ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল ও। ও বলেছিল এ বাড়িতে ভূত আছে…'

তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বাধা দিল মুসা। 'আর বলবেন না, প্লীজ!'

ওপরের হলে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। পায়চারি বন্ধ হয়ে গেছে। কান পেতে রইল আবার শব্দ শোনার অপেক্ষায়।

ওপরেও কি কেউ কান পেতে রয়েছে? চিলেকোঠার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে? শিকার দেখলেই ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ওত পেতে রয়েছে?

'এখানেই থাকি,' যেতে চায় না মুসা। একটা চেয়ার নিয়ে এল কমপিউটার রুম থেকে। বসার ইঙ্গিত করল এলেনাকে।

'পুলিশ এসে যদি দেখে,' এলেনা বলল। 'কিছুই নেই, সব সময়ই যেমন থাকে না, তাহলে কি ভাববে বলতো?'

'পাগল।'

'ঠিক। আর এরকম করে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে যদি করতে থাকি, এক সময় আসাই বন্ধ করে দেবে ওরা। আমি ফোন করলেই হাসবে। বলবে কিপটে লিসটারের পাগলা মেয়ে ডাকছে।'

'কিন্তু আমার মনে হয় যতবারই ফোন করুন না কেন পুলিশকে আসতেই হবে। বলা যায় না, কখন সত্যিকারের বিপদে পড়ে যাবেন আপনি। ওই ঝুঁকি ওরা নিতে চাইবে না। এসে কিছু না দেখলে বকাঝকা করবে হয়ত, কিন্তু আসতে ওদেরকে হবেই।'

পুরো এক মিনিট চুপ করে থেকে ভাবল মুসা। কিশোর এখন এখানে থাকলে কি করত? প্রমাণ খুঁজত, যেটা দেখিয়ে পুলিশকে বিশ্বাস করানো যায়। ভাঙা তালা…পায়ের ছাপ! হ্যাঁ, পায়ের ছাপ!'

লিসটারের বাথরুমে একটা জিনিস দেখেছিল মনে পড়ল মুসার। গতকাল ওখানে আটকে ছিল, তখন দেখেছে। বেসিনের ওপরের তাকে রাখা ট্যালকম পাউডারের একটা টিন।

দৌড়ে এসে লিসটারের ঘরে চলে এল সে। বাথরুমে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জেলে দেখল টিনটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। থাবা দিয়ে ওটা নামিয়ে নিয়ে আবার দৌড়ে ফিরে এল হলে। চিলেকোঠার দরজার কাছে মেঝেতে পাউডার ছিটিয়ে দিল।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল এলেনা।

'মানুষ হলে এপথে ছাড়া বেরোতে পারবে না।' বুঝিয়ে বলল মুসা, 'আর এদিকে এলে তাকে দেখতে পাবই। এই পাউডার মাড়িয়ে যেতে হবে। পায়ের ছাপ রেখে যাবে। পুলিশকে দেখাতে পারব তখন। প্রমাণ।'

'ঠিক! ঠিক বলেছ!' হাততালি দিতে গিয়েও থেমে গেল এলেনা, 'কিন্তু যদি

পায়ের ছাপ না পড়ে?'

জবাব দিল না মুসা। ড্রাইভওয়েতে ইঞ্জিনের শব্দ হল। দড়াম করে বন্ধ হল গাড়ির দরজা। বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগল কেউ। শব্দ হচ্ছে। দেখছে বোধহয় ঝোপঝাড়ে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

সিঁড়িতে অর্ধেক নেমে গেছে এলেনা, এই সময় বাজল কলিং বেল। দরজা খুলে দিল সে। রকি বীচ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দু'জন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। এলেনাকে বলতে শুনল মুসা, 'ওপরে। চিলেকোঠায়। আসুন।'

'চলুন,' বলল একজন অফিসার। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

আরেকটা শব্দও কানে আসছে মুসার। চিলেকোঠার সিঁড়িতে, নামছে বোধহয় রহস্যময় অনুপ্রবেশকারী।

ঝট করে দরজার দিকে ফিরল সে। এখান থেকেই সিঁড়ির গোড়াটা দেখা যায়।

হঠাৎ করেই থেমে গেল চিলেকোঠার সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। হল না আর। মেইন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে লাগল একজন অফিসার।

সাহস পেয়ে চিলেকোঠার দরজার কাছে উঠে এল মুসা। যেমন পাউডার তেমনি রয়েছে। কোন ছাপ পড়েনি। মানুষের চিহ্নও চোখে পড়ছে না।

'ভূত!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। 'ভূতের বাড়ি এটা!'

সব শুনে এলেনা বলল, 'তোমরা থাকলে থাক! আমি আর এক মুহূর্তও না! মার কাছে চলে যাচ্ছি!'

দশ

তিন ব্লক পেছনে রয়েছে কিশোর, এই সময় সান্তা মনিকা বুলভার ধরে পুবে মোড় নিল এনথনির গাড়ি। চার ব্লক পেছনে পড়ে গেল যখন মেফিল্ডে ঢুকল গাড়িটা। গতি কমাল। একটা মার্কেটের পার্কিং লটে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল। ডি. এল. ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেখা গেল কমপ্লেক্সের পশ্চিম প্রান্তে। এই ব্রাঞ্চেই লিসটারের ম্যানেজারি করে সে। র‍্যাকে সাইকেল তালা দিয়ে রেখে দোকানের দিকে এগোল কিশোর।

এখন কেনাকাটার সময় লোকের। দোকানদারী ফেলে এই সময়ে ওবাড়িতে কেন গিয়েছিল এনথনি? অবাকই লাগছে তার। দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করছে মিস্টার লিসটারের বিরুদ্ধে? এতে কি লাভ ওদের?

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। এনথনির সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। তাকে বলবে, সে আর তার বন্ধুরা মিলে এলেনা লিসটারকে সাহায্য করছে। বিশপের বইয়ের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করবে। সিয়েটা আর সোগামোসোর কথাও জানতে চাইবে। এসব প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয় এনথনির জন্যে। এলেনার মায়ের রান্নাঘরে লুকিয়ে থেকে তো সবই শুনেছে। তবু তার প্রতিক্রিয়া দেখার কৌতূহল সামলাতে পারছে না কিশোর। এমনও হতে পারে মুখ ফসকে কোন

তথ্য দিয়ে ফেলতে পারে এনথনি, যেটা তদন্তের সুবিধে করে দেবে।

স্টোরের অফিসগুলো রয়েছে তিনতলায়। চিলড্রেনস ডিপার্টমেন্টের পেছনে ডেস্কের ওপাশে বসা এক মহিলা কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'কি সাহা করতে পারে' জিজ্ঞেস করল। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড দিয়ে নিজের নাম ব জিজ্ঞেস করল কিশোর মিস্টার এনথনির সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা।

কার্ডটার দিকে তাকাল মহিলা। 'গোয়েন্দা?' কিছুটা অবাক হয়েই আ কিশোরের দিকে মুখ তুলল।

'মিস্টার লিসটারের নিখোঁজের ব্যাপারে কথা বলব,' কিশোর বলল। 'গতক এলেনা লিসটারের এনগেজমেন্ট পার্টিতে ছিলাম। মিস্টার এনথনির সঙ্গে ওখানে দেখা হয়েছে।'

'মিস্টার লিসটার?' হাসি চলে গেছে মহিলার মুখ থেকে। 'তিনি নিখোঁ হয়েছেন?'

'মিস্টার এনথনি সব জানেন।'

কিশোর আর কিছু বলতে চায় না এটা বুঝে ফোন তুলল মহিলা এক্সটেনশনে ডায়াল করে বলল কিশোর পাশা এসেছে, মিস্টার এনথনির সঙ্গে দে করতে চায়। তারপর বলল মিস্টার লিসটারের সম্পর্কে কথা বলবে।

ওপাশের কথা শুনল। রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে তাকি বলল, 'মিস্টার এনথনি খুব ব্যস্ত। আজ কথা বলতে পারবেন না।'

'তাই?' অতীতে বহুবারই বহুজন কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে অসম্ম জানিয়েছে, এটা নতুন নয় তার কাছে। একটুও নিরাশ হল না। তবে একটা উপ বের করতেই হবে দেখা করার। এবং আজই। লিসটারের কমপিউটারের ফাইলে কথা হয়ত জানে না এনথনি। ওটার কথা শুনলে নরম হতেও পারে।

'আমি জানি মিস্টার এনথনি ব্যস্ত মানুষ,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'কি তারপরেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইবেন। তাঁর জন্যে খবর আছে মিস্টার লিসটারের ব্যক্তিগত ফাইলে লেখা রয়েছে তাঁর নাম।'

মোলায়েম হাসি হাসল মহিলা। 'বেশ, তোমার কার্ড আর মেসেজ রেখে যাও তাঁকে দেব । দরকার মনে করলে ফোন করবেন।'

বসকে পাহারা দেয়ার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন যেন মহিলা। কিছুতেই দে করতে দেবে না। কিশোরকে সরাতে বদ্ধ পরিকর। ঘড়ি দেখল কিশোর। পাঁচটা বেশি। আরেকটু পরেই শেষ হয়ে যাবে অফিসের সময়। 'ঠিক আছে, বসি,' বল সে। 'তিনি বেরোলেই নাহয় কথা বলব।'

'অনেকক্ষণ বসতে হবে তাহলে। দোকান বন্ধ হতে ন'টা।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। এসকেলেটর, অর্থাৎ চলমান সিঁড়ি নে যাচ্ছে নিচে। তাতে উঠল। হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে? নাকি অপেক্ষা কর এনথনির জন্যে? কাপড় আর পারফিউমের দোকানের পাশ দিয়ে নামতে নামতে এসব কথা ভাবছে সে। দোতলা থেকে একতলায় নামল, আসবাব আর নিত প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ওখানে।

এনথনির জন্যে অপেক্ষাই করবে, ঠিক করল কিশোর। অফিস বন্ধ করার আগে নিশ্চয় তার মেসেজ পেয়ে যাবে ম্যানেজার। ঘাবড়ে গিয়ে কথা বলতে চাইবে। আর তা যদি না করে, লোকটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আইলিন লিসটার আর এনথনির মাঝে কোন একটা সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। কি, সেটা বের করতে হবে। হয়ত লিসটারের কিডন্যাপিঙের সঙ্গেও এর যোগাযোগ রয়েছে।

নিচে আঙিনায় নেমে এল কিশোর। এখন সময় কাটাতে হবে, কয়েক ঘন্টা। কয়েকটা ইলেকট্রনিকের দোকানের সামনে ঘুরল। বিভিন্ন মডেলের স্টেরিও সেট আর রেকর্ড দেখল। একটা স্ন্যাকস শপে ঢুকে চিকেন বারগার আর কোক খেল। একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে ব্যায়ামের জন্যে কিছু পোশাক পছন্দ করল। একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে বই বের করে পড়তে শুরু করে দিল। দোকানদার বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকানো শুরু করতে করতে শেষ করে ফেলল অর্ধেকটা কাহিনী।

বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। আরও এক ঘন্টার বেশি রয়েছে। একটা আসবাবের দোকানে ঢুকে চামড়ায় মোড়া একটা বড় সোফায় বসল হেলান দিয়ে। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

দোকানের এই কোণটা নীরব, বড় বেশি নীরব। খরিদ্দার বেশি নেই। নিঃসঙ্গ একজন সেলসম্যান পায়চারি করছে আসবাবের সারির মাঝের লম্বা একটা ফাঁকে। তার পায়ের শব্দ ঢেকে দিচ্ছে মেঝেতে বিছানো কার্পেট। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে গেল কিশোরের। ঢুলতে শুরু করল। আগের রাতে লিসটারের বাড়িতে ভাল ঘুম হয়নি। এখন সেটার খেসারত দিতে হচ্ছে।

চিলেকোঠায় অনুপ্রবেশকারীর কথা মাথায় ঢুকতেই তন্দ্রা টুটে গেল তার। যদিও মাথাটা ঝুলেই রইল বুকের ওপর। এই আরেকটা রহস্য। কি ঘটেছে চিলেকোঠায়? ভূতে হাঁটাহাঁটি করেছে?

কিন্তু ভূত বিশ্বাস করে না কিশোর। ব্যাপারটা অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভূত নয়। কবর থেকে উঠে আসতে পারে না প্রেতাত্মা। গলা কেটে বললেও কিশোরকে অন্তত একথা বিশ্বাস করাতে পারবে না কেউ। ওই শব্দের অন্য ব্যাখ্যা আছে। হতে পারে সাগরের দিক থেকে জোরাল হাওয়া এসেছিল ওই সময়, কোনভাবে শব্দের সৃষ্টি করেছে। তবে এটা একটা সম্ভাবনা, অন্য কিছুও হতে পারে। এই যেমন, বড় ইঁদুর।

আবার ঢুলতে লাগল সে। হঠাৎ চমকে জেগে গেল। চোখ মেলল।

অন্ধকার। চারপাশে তাকিয়ে নানারকম আকৃতি দেখতে পেল সে। কালো কালো অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি যেন। চিনতে অবশ্য দেরি হল না। দোকানের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, ওয়ারড্রোব এসব।

সতর্ক হয়ে গেল সে। দেরি করে ফেলেছে! দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। টেরই পায়নি সে কখন বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে সেলসম্যান।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। কান পাতল। নিশ্চয় ঝাড়ুদার আছে বাইরে। কিন্তু ঝাড়ুর শব্দ কানে এল না। পাহারাদার থাকবেই। ওরা এসে তাকে জাগিয়ে দিল না

কেন? সেলসম্যানই বা এভাবে দোকান বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল কেন? তাকে জাগিয়ে বের করে দিতে পারত।

একটাই কারণ হতে পারে। এমন এক কোণে ঢুকে বসে আছে সে, যেখানে ভাল করে না তাকালে কারও চোখ পড়বে না। তার তিন ফুট দূর দিয়ে হেঁটে গেলেও না।

চোখ ডলল কিশোর। আলমারি আর কিছু উইং চেয়ারের ওপাশে একটা আলো জ্বলছে, ঘোলাটে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে শুধু। তার নিচে লেখা রয়েছে 'এক্জিট', তার মানে বেরোনোর পথ।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেদিকে এগোল কিশোর। এক্জিটের কাছে পৌঁছে আরেকটা নির্দেশ দেখতে পেলঃ ইমারজেন্সি এক্জিট ওনলি। অ্যালার্ম উইল রিং ইফ দিস ডোর ইজ ওপেনড। —জরুরী অবস্থায় বেরোনোর পথ। দরজা খুললে সতর্কীকরণ ঘন্টা বেজে উঠবে।

কল্পনায় দেখতে পেল কিশোর, ইমারজেন্সি ডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে বাজতে আরম্ভ করেছে অ্যালার্ম বেল। জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে বিশেষ আলো। কোন সন্দেহ নেই টিভি মনিটরের সামনে পাহারাদার বসে রয়েছে, চোখ রাখছে সর্বত্র। পর্দায় কিশোরকে দেখামাত্র ছুটে আসছে ওরা। পিস্তল বের করে ফেলেছে। মার্কেটের সীমানা পেরোনার আগেই ধরে ফেলা হয়েছে তাকে। তার পরের ঘটনা আর মনে করতে চায় না সে।

কেঁপে উঠল কিশোর। কয়েক মাস আগে একটা ছেলেকে পাওয়া গিয়েছিল আঙিনার ভেতরে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। ধরে তাকে প্রথমে ভালমত ধোলাই দিয়েছে পাহারাদাররা, যদিও সেটা আইন বিরুদ্ধ। তারপর পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। জেলখাটা কিছুতেই এড়াতে পারেনি ছেলেটা। কিশোরের ক্ষেত্রে জেলটা না থাকলেও ধোলাইটা খেতেই হবে। ধরলে কিছু উত্তম মধ্যম না দিয়ে ছাড়বে না প্রহরীরা। তার ওপর রয়েছে লোকাল নিউজপেপারগুলো। ছবিসহ বড় করে ছাপবে সামনের পাতায়, হেডিং লিখবে 'সুপার মার্কেটে চোর'। রাতের বেলা কি কারণে আসবাবের দোকানে ঢুকে লুকিয়ে বসেছিল কিশোর, কিছুতেই বোঝাতে পারবে না রিপোর্টারদেরকে।

ইমারজেন্সি এক্জিটের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রধান প্রবেশ পথের দিকে চলল। ইস্পাতের মস্ত শাটার লাগানো রয়েছে সেখানে।

সাবধানে এগোল সে। সামান্যতম শব্দ না করে এসে খুঁজে বের করল কর্মচারীদের প্রবেশ পথটা। এই দরজাতেই সাবধান বাণী লেখা রয়েছে। জোর করে বেরোতে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

দরজার পাশের একটা ঘড়িতে দেখা গেল রাত এগারোটা বাজে। বাড়িতে খবর দিতে পারেনি কিশোর। রেগে কাঁই হয়ে যাবেন মেরিচাচী।

খুঁজতে খুঁজতে একটা পে ফোন বের করল সে। স্লটে পয়সা ফেলে বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল। মেরিচাচী ধরলেন। কণ্ঠ শুনেই কিশোর বুঝে ফেলল উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। সে নাম বললেই ফেটে পড়বেন এখন। তা-ই করলেন। জিজ্ঞে

করলেন, 'তুই কোথায়?'

'আমাদেরকে এলেনা লিসটারের প্রয়োজন,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর। সত্যি কথাই বলল।

'মাঝে মাঝে আমারও তোকে প্রয়োজন হয়! সেকথা কখনও ভেবেছিস? লিসটারের বাড়ি থেকে বলছিস নাকি? ওর বাপের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। চাচী, শোন, আজ রাতেও থাকতে চাই। তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'রাতে আর কি অসুবিধে? ইয়ার্ডের কাজ তো দিনের বেলা। থাকতে চাইলে থাক। তবে সাবধানে থাকবি। বিপদ-আপদ ঘটাবি না।'

লাইন কেটে দিলেন তিনি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার আসবাবের দোকানে ফিরে এল, ঘরের কোণে তার সেই সোফায়। সোফাটাকেই এখন তার বাড়ি ভাবতে আরম্ভ করেছে। বসে পড়ল। সকাল হতে অনেক দেরি। কি করে যে রাতটা কাটবে কে জানে।

মোচড় দিয়ে উঠল পেট। খিদে জানান দিচ্ছে। একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। একটা ছেলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রাতের বেলা আটকা পড়েছিল। রেস্টুরেন্টের রেফ্রিজারেটর থেকে খাবার বের করে খেয়েছিল সে। কিন্তু বিকেলে ভেতরে কোন রেস্টুরেন্ট দেখতে পায়নি কিশোর। আছে বলেও মনে হয় না। রাখার কোন প্রয়োজন মনে করেননি লিসটার। কারণ স্টোরের বাইরেই চত্বরে অনেক খাবারের দোকান রয়েছে।

তবু, খাবার কি খুঁজবে? সুইট কাউন্টার কিংবা ছোটখাট স্ন্যাকস থাকতে পারে কোথাও।

বাতিল করে দিল ভাবনাটা। অতিরিক্ত ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে।

চোখ মুদল সে। আবার তন্দ্রা এসে গেল। ঢুলতে শুরু করল। স্বপ্ন দেখল লিসটারের বাড়িতে রয়েছে আর কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়। স্বপ্নের মধ্যেই বুঝতে পারল কে লোকটা, ডেভিড লিসটার। ভেতরে ঢুকতে চাইছেন। 'আসছি!' চিৎকার করে সাড়া দিল কিশোর। 'যাবেন না! এখুনি আসছি!'

জোর করে যেন টেনে তুলল শরীরটাকে। আলোকিত হয়ে গেছে। লোকজন দেখতে পেল সামনে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাসাহাসি করতে লাগল ওরা। সকালের খরিদ্দার। বিজনেস স্যুট পরনে, হাতে খবরের কাগজ। ওদেরই একজন টোকা দিচ্ছিল জানালায়।

জানালা! কাল সন্ধ্যায় যখন বসেছিল তখন তো ওটা ছিল না! এখন এল কোথা থেকে?

বুঝতে পারল অন্ধকারে অন্য জায়গায় এসে বসেছে। আগের দিন সন্ধ্যায় শুরুতে যে সোফায় বসেছিল এটা সেটা নয়। ডিসপ্লে উইনডোতে জমায়েত হয়েছে লোকে দোকানের ভেতর তাকে ঘুমোতে দেখে। যেন এটা তাদের কাছে এক সাংঘাতিক মজার ব্যাপার।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। যে কোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে

প্রহরীরা, চেপে ধরতে পারে তাকে। পুলিশ ডাকবে। তারা খবর দেবে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচাকে।

প্রহরীদের গলা শোনা গেল। কর্মচারীদের ঢোকার দরজা খুলছে ওরা।

দৌড়ে গিয়ে বড় একটা টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।

আসবাবের সারির মাঝের পথ দিয়ে এগিয়ে এল ওরা। 'এখানেই আছে,' বলল একজন। 'আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।'

কিশোর যে টেবিলের নিচে লুকিয়েছে তার কাছে এসে দাঁড়াল আরেকজন। মোটা গলায় বলল, 'কাল রাতে দেখলে না কেন? কারও চোখে পড়ল না?'

'সব কটা চেয়ার টেবিলের তলায় তো আর উঁকি দেয়া সম্ভব না,' প্রথম লোকটা জবাব দিল। 'টহল দিই। তখন চোখে পড়লে তো ধরতামই।'

লোকগুলো চলে গেলে বেরিয়ে এসে মাথা তুলে উঁকি দিল কিশোর। ডিসপ্লে উইনডোর কাছে দেখতে পেল ওদেরকে। সোফাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ওটাই ওদেরকে বলে দেবে কিশোর কোথায় আছে।

পেছনে শব্দ হল। ফিরে তাকাল কিশোর। হাড়সর্বস্ব একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে দোকানের প্রধান প্রবেশ পথের কাছে। পরনে জলপাই রঙের জাম্প স্যুট। তালা খুলল লোকটা। তারপর টান দিয়ে তুলতে শুরু করল ইস্পাতের শাটার।

পথ পরিষ্কার হয়ে আসছে।

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। একছুটে লোকটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করল না লোকটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে শুধু তার দিকে।

চত্বরে বেরোল কিশোর। এই সময় শুনতে পেল চিৎকার। দেখার জন্যে থামল না, ফিরেও তাকাল না। ছুটে চত্বর পার হয়ে অটোমেটিক দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এল পার্কিং এরিয়ায়।

র‍্যাকে আগের জায়গাতেই বাঁধা রয়েছে সাইকেলটা। খুলতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় হাত থেকে চাবিই ফেলে দিয়েছিল প্রায়। কাঁপা হাতে খুলল তালাটা। একটানে সাইকেলটা বের করে নিয়েই চেপে বসল। প্যাডাল ঘোরাতে শুরু করল। পেছনে ছুটে আসছে লোকজন।

এবারও ফিরে তাকাল না কিশোর। এখন একটাই করণীয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া; লোকগুলোর হাতে পড়ার আগেই।

এগারো

'ভূত বিশ্বাস করি না আমি,' ঘোষণা করল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে মুসার দিকে।

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু ভূত না হলে কী?'

'বাতাসের কারসাজি হতে পারে। ইঁদুর হতে পারে,' রবিন বলল।

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। কিশোর বসেছে তার

নির্দিষ্ট ডেস্কের ওপাশে। চোখ লাল। ঘুম ঘুম দৃষ্টি। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রাতের ধকলের স্বাক্ষর। মুসার চোখেও ক্লান্তি। শুধু স্বাভাবিক দেখাচ্ছে রবিনকে। তিনজনের মধ্যে রাতে একমাত্র তারই ভাল ঘুম হয়েছে।

লাইব্রেরি থেকে যে বই দুটো পড়তে এনেছিল রবিন সেদুটো নিয়ে এসেছে এখানে। পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'ভূত হলেই বা কি?' বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'লিসটারের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক দিন ধরে বাস করছে সে। হঠাৎ করে লিসটারকে নিয়ে পরপারে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নিশ্চয় তার হয়নি। আমাদেরকে এখন বিশপেরই বই খুঁজে বের করতে হবে। আর সেটা করতে পারলেই লিসটারকেও বের করে আনতে পারব। কাজেই ভূতের ওপর জোর না দিয়ে এখন বিশপের বইয়ের ওপরই জোর দেয়া উচিত। আর সেজন্যে কমপিউটারের মেসেজের মানে বের করতে হবে আমাদের। যাই হোক, তোমাদেরকে থ করে দেয়ার মত খবর আছে আমার কাছে।' মুখ তুলল রবিন। হাসল। 'হাততালি দেয়ার দরকার নেই। বাহবা দেয়ার দরকার নেই। শোন, আমি সোগামোসো খুঁজে পেয়েছি।'

ঘুম থেকে যেন জেগে গেল কিশোর। একেবারে সজাগ। 'পেয়েছ! কে?'

'কে নয়, কি। দক্ষিণ আমেরিকার কলাম্বিয়ার একটা ছোট শহর। মাত্র উনচল্লিশ হাজার লোকের বাস। এখন এলেনা গিয়ে যদি বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞেস করে সে কি চায় তাহলে হয়ত জেনে আসতে পারবে। ওই মহিলা নিশ্চয় সোগামোসোরই বাসিন্দা।'

'আর সেটা করতে গেলে সিয়েটার ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতে হবে তাকে,' মুসা মনে করিয়ে দিল। 'কমপিউটারের মেসেজে সেকথা বলা আছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'মহিলাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হুঁশিয়ার থাকতে হবে যাতে সিয়েটার কানে এসব কথা চলে না যায়।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সিয়েটা কলাম্বিয়ায় নেই। লিসটার কমপিউটারে মেসেজ লেখার সময় অন্তত ছিল না। লিসটার জানতেন না সিয়েটা বৈধ কিনা। আই এন এস-এর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। আই এন এস মানে ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড নেচারালাইজেশন সার্ভিস। সুতরাং ধরে নিতে পারি বেআইনী ভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে সিয়েটা, তার কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই।'

'বেশ,' রবিন বলল। 'তাহলে এখানেও হুঁশিয়ার থাকতে হবে এলেনাকে। যতক্ষণ সোগামোসোয় রওনা না হচ্ছে ততক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যাতে সিয়েটার সামনে না পড়ে যায়। কিংবা সামনে পড়লেও কোন কথা ফাঁস না করে দেয়। কিশোর, তোমাকে চিলেকোঠায় যে আক্রমণ করেছিল সে-ই সিয়েটা হতে পারে। তোমার ওপর হামলা চালিয়েছিল একজন মানুষ, ভূত-প্রেত নয়।'

'ভূত তো হতেই পারে না,' কিশোর বলল। 'মানুষ। জীবন্ত মানুষ।'

টেলিফোন বাজল।

'এলেনা হয়ত ভাবছে আমরা কি করছি,' মুসা আন্দাজ করল। 'কাল রাতে মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। বাবার ওখানে থাকতে সাহস পায়নি।'

'তাকে দোষ দেয়া যায় না।' রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। এলেনার ফোন নয়। আরনি ভিনসেনজো ওরফে হোয়েরটার।

টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো লাউডস্পীকারের সুইচ অন করে দিল কিশোর, সকলের শোনার জন্যে। 'আপনি ফোন করলেন, অবাকই লাগছে মিস্টার ভিনসেনজো। কাল তো বেরিয়ে চলে গেলেন...'

'আমাকে কডিই বলবে। ওটা ছদ্মনাম নয়। মিডল নেম। আরনি কডি ভিনসেনজো। বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে। আর কাল চলে না গিয়ে কি করতে পারতাম। এত বড় অপমান...থাক ওসব কথা। আজ থানায় গিয়েছিলাম। লিসটারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নয় পুলিশ। তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। তবে কিডন্যাপের কথা জানলে হয়ত ঘামাত। আর তখন আমিও তাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ে যেতাম।'

'কারণ লিসটারকে কিডন্যাপের মোটিভ রয়েছে আপনার,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল আরনি। 'ওই বুড়ো ভামটাকে একটা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। আমার বাবার সর্বনাশ করার জন্যে।'

সহজ সরল স্বীকারোক্তি। বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর।

'সত্যিই বলছে মনে হয়,' বিড়বিড় করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বেশ, বিশ্বাস করলাম আপনার কথা। কিন্তু আমাকে ফোন করেছেন কেন?'

'তোমাদের ওপর এলেনার বিশ্বাস আছে, তাই আমারও হয়েছে। মিস্টার লিসটারকে খুঁজে বের করতে আমার কোন সাহায্য দরকার হলে, করব। এটা তার জন্যে দয়া নয়, আমার নিজেরই স্বার্থে। যতদিন লিসটার নিখোঁজ হয়ে থাকবে, আমার ওপর সন্দেহ থাকবে তোমাদের। এটা বয়ে বেড়াতে পারব না আমি। কাজেই, আমাকে দরকার হলেই ফোন করবে।'

'এখনই একটা কথা ভাবছি,' কিশোর বলল। 'সোগামোসো সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'সোগা...সোগা...কে?'

নামটা আবার বলল কিশোর। কিছু বুঝতেই পারল না আরনি, বলা তো দূরের কথা। সিয়েটার কথা শুনে বলল, 'ওই নামে কয়েকজনকে চিনি। খুব প্রচলিত এই নাম, অনেকেই রাখে। তাদের কেউই লিসটারকে চেনে না এটাও বলতে পারি।'

'কখনও ঈশ্বরের অশ্রুর কথা বলতে শুনেছেন মিস্টার লিসটারকে?'

'ঈশ্বরের অশ্রু? তা কি করে হয়?'

'কি করে হয় জানি না। তবে ওটা মিস্টার লিসটারের কাছে খুবই জরুরী।'

'সরি। শুনিনি। শুনলে ওরকম একটা কথা মনে না থাকার কথা নয়।'

'তা ঠিক। আরেকটা প্রশ্ন। সোগামোসোর কথা আমরা জানি। ওটা কলাম্বিয়ার একটা ছোট শহর। কোকেনের প্রধান ঘাঁটিগুলোর একটা। মাদকদ্রব্য চোরাচালানের সঙ্গে মিস্টার লিসটারের কোন যোগ নেই তো?'

'মোটেই না,' জোর দিয়ে বলল আরনি। 'মাদককে ঘৃণা করে লিসটার। নেশা

করে শুনলেই যত ভাল কর্মচারীই হোক চাকরি থেকে বের করে দেয় সে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে এলেনাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

তাকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

যোগাযোগের জন্যে টেলিফোন নম্বর দিয়ে লাইন কেটে দিল আরনি।

'অসংখ্য ছেঁড়া সুতো রয়েছে এই কেসে,' কিশোর বলল। 'সব জোড়া দিতে না পারলে রহস্যের কিনারা করা যাবে না। অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি না এখনও। দু'দিন আগে যে অন্ধকারে ছিলাম এখনও তা-ই রয়েছি।'

'সোগামোসোও কোন সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না,' মুসা বলল। 'ওখানে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে এলেনা যোগাযোগ করার আগেই হয়ত এদিকে তার বাপ মরে ভূত হবে।'

'স্বাভাবিক মৃত্যু যদি হয়,' বলল রবিন। 'বয়েসের কারণে। ও-কে, এর পর কি করব?'

'এলেনার মা পরামর্শ দিয়েছেন আইলিন লিসটারে খোঁজ নিতে,' কিশোর বলল।'লিসটারের বাড়িতে তো আর খোঁজা বাদ রাখিনি। এখন জাহাজটায় গিয়ে খুঁজলে মন্দ হয় না। কোথায় আছে ওটা এলেনা নিশ্চয় জানে।'

'জানতে পারে,' মাথা দোলাল রবিন। 'আর ওখানে বিশপের বইটা খুঁজে বের করতে পারলে তার বাবা মুক্তি পাবে। লিসটারই তখন বলে দিতে পারবে বৃদ্ধা মহিলাকে কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় মিলবে ঈশ্বরের অশ্রু।'

সান্তা মনিকায় এলেনার মায়ের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। ফোন ধরল এলেনা। সে ওদেরকে বলল সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিন করপোরেশনের ড্রাই ডকে রয়েছে ইয়টটা। 'ওটা একটা শিপইয়ার্ড,' এলেনা বলল। 'বোস্প্রিট ড্রাইভে। ফোন করে আমি ওদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা যাচ্ছ। তোমাদের যাতে ইয়টে উঠতে দেয়া হয়।'

মিনিট কয়েক পরেই কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। বিশ মিনিট একটানা প্যাডাল করে এসে পৌঁছল বোস্প্রিট ড্রাইভে।

তীর থেকে মাইলখানেকেরও বেশি সাগরের ভেতরে ঢুকে গেছে মানুষের তৈরি এক টুকরো জমি। মাটি ফেলে ফেলে তৈরি করা। বিশাল এক দানবের আঙুল যেন। আঙুলের মাথায় জেটি। একটা ইয়ট ক্লাব আর এক সারি দোকানপাট জেটির দক্ষিণ পাশে। উত্তর পাশে কয়েকটা শিপইয়ার্ড। বড় রাস্তা থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল ভেতরে সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিন করপোরেশন। ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে বেশ শক্ত বেড়া চারপাশ ঘিরে। গেটে পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান। গেটের পাশে ছোট গার্ডহাউসে বসে আছে সে।

গেটের কাছে এসে থামতে হল তিন গোয়েন্দাকে। পরিচয় দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, মিস লিসটার ফোন করেছিলেন,' দারোয়ান বলল। 'তবে বয়স্ক মানুষ আশা করেছিলাম আমি। যাকগে, মিস যখন বলেছেন, আমার কি···এখানে সই করতে হবে।'

একটা নোটবুক বের করে দিল লোকটা। এক এক করে সই করল তিন গোয়েন্দা। তিনজনের নামের পাশে নোট লিখল দারোয়ান। তারপর তার পেছনের পেগবোর্ড থেকে একগোছা চাবি নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'আইলিন লিসটারের কেবিন আর হুইলহাউসগুলোতে তালা দেয়া। এটা দরকার হবে।'

ডানে দেখাল সে। 'ওদিক দিয়ে পথ। ওই যে স্কুনারটা, ওটার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। ওই যে, নিচের রঙ চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে যে। হ্যাঁ, তার পরেই রয়েছে আইলিন লিসটার। ড্রাই ডকে। বড় জাহাজ। কালো খোল। গলুইয়ের কাছে সোনালি রঙে নাম লেখা রয়েছে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। সাগর থেকে আসছে তাজা বাতাস। মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে গাল, কর্কশ চিৎকার করছে। বাতাসে শুকনো শ্যাওলা, ঝিনুক, মাছ আর জাহাজের রঙের মিশ্র গন্ধ। পানি থেকে মেরামতের জন্যে শুকনোয় তোলার পর খোলে লেগে থাকা শ্যাওলা শুকিয়ে এক ধরনের শুঁটকি শুঁটকি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

অনেক জাহাজের পাশ কাটাল ছেলেরা। বেশির ভাগই সেইলবোট। কাঠ আর ফাইবারগ্লাসে তৈরি বোটগুলো লম্বায় চল্লিশ থেকে ষাট ফুট। আইলিন লিসটার জাহাজটাকে অনেকটা আলাদা লাগল ওগুলোর তুলনায়, অন্য রকম। ছোট একটা ওশন লাইনার। কালো খোল। শরীরটা শাদা। বিলাসতরীর রূপ দিয়েছে ইয়টটাকে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'বুড়োটার রুচি আছে! বাড়িঘরগুলো অমন করে রাখে কেন? এখানে তো কিপটেমি নেই!'

'থাকবে কি করে,' রবিন মন্তব্য করল। 'এটা কাজের জিনিস যে। কমপিউটার রুমটা দেখনি। কেমন ঝকঝকে তকতকে, দামী মেশিন।'

সেইলবোটগুলোকে যেভাবে পানি থেকে টেনে তোলা হয়েছে সেরকম করে তোলা হয়নি এটাকে। কংক্রিটের মস্ত ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে আনা হয়েছে, এটাকেই বলে ড্রাই ডক। ট্রেঞ্চের সাগরের দিকের বিশাল ওয়াটারপ্রুফ গেটগুলো বন্ধ, তালা দেয়া। জাহাজটাকে এখানে আনার পর দমকলের সাহায্যে সমস্ত পানি বের করে দেয়া হয়েছে। খটখটে শুকনো এখন খোলের নিচে। ড্রাই ডকের ভেতরে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কাঠামোর ওপরে ডিমে তা দিতে বসা হাঁসের মত করে যেন বসে রয়েছে আইলিন লিসটার।

সিঁড়ি উঠে গেছে জাহাজের ওপর। প্রথম ডেকে উঠল কিশোর। তারপর রবিন আর মুসা।

সামনের দিকে এগোল তিনজনে। ব্রিজে ওঠার মই বেয়ে উঠে এল। চাবি বের করল কিশোর। এক এক করে তালায় ঢোকাতে শুরু করল। লেগে গেল একটা। হুইলহাউসের দরজা খুলল সে। ভেতরে ঢুকল ওরা। চারপাশে বড় বড় কাচের জানালা। বালি আর লবণ লেগে নোংরা হয়ে আছে। জানালার নিচে কেবিনেট, অনেক ড্রয়ার ওগুলোতে। অল্প আসবাবে সুন্দর করে সাজানো ঘরটা, জাহাজের হুইলহাউস যে রকম হয়।

'আমি আশা করেছিলাম অগোছাল হবে,' রবিন বলল। 'মিস্টার লিসটারের যা স্বভাব। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কথা সব।'

'জাহাজের ব্যাপারে হয়ত তাঁর অন্য মনোভাব,' কিশোর বলল। 'পুরনো জিনিস ছড়িয়ে রাখার জায়গা নয় জাহাজ।'

'কিংবা এমন কাউকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন,' মুসা বলল। 'যে নোংরামি একদম সইতে পারে না। তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না লিসটার।'

টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল কিশোর। সুন্দর করে একটার পর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে ম্যাপ। দ্রুত ওগুলো উল্টে দেখতে শুরু করল সে। সবই নটিক্যাল চার্ট, কোথায় প্রবাল প্রাচীর, কোথায় গভীরতা কম, এসব দেখানো রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের কাছের চার্ট ওগুলো।

'সোগামোসোতে বন্দর নেই,' রবিন বলল। 'ওখানে যেতে চাইলে স্থলপথে যেতে হবে লিসটারকে। কিংবা ভেনিজুয়েলার কোন বন্দরে নেমে গাড়িতে করে।'

'আমরা এখানে সোগামোসো খুঁজতে আসিনি,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'এসেছি বিশপের বই খুঁজতে। সেটাই খোঁজা দরকার। কোথায় ওটা?'

'ভাল প্রশ্ন।' একটা ড্রয়ার খুলল রবিন। আরেকটা। তারপর আরেকটা। ড্রয়ারের পর ড্রয়ার ঘেঁটে চলল, যা পেল, বেশির ভাগই চার্ট। আলমারিগুলোতে খুঁজছে মুসা। কিশোর খুঁজছে কয়েকটা খোলা তাকে। জাহাজ চালানোর ওপর কিছু বই পাওয়া গেল, আর কিছু যন্ত্রপাতি, কিন্তু বিশপের বইটা মিলল না। বিশপের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এরকম কিছুও না।

হুইলহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খোঁজার পর বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে মই বেয়ে আবার নেমে এল ডেকে। দুই ধারেই সারি সারি কেবিন রয়েছে। ওগুলোতে ঢুকে দেখতে লাগল ওরা।

বেশির ভাগই মনে হল অব্যবহৃত। বাংক আর বেডগুলোতে চাদর বালিশ কিছুই নেই। উল্টে ফেলে রাখা হয়েছে ম্যাট্রেস। নাবিকদের কোয়ার্টারটা দেখে মনে হল, অল্প কিছু দিন আগেও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংকের নিচে একটা টি-শার্ট দলা পাকিয়ে ফেলে রেখে গেছে একজন নাবিক। ময়লা ফেলার ঝুড়িতে পড়ে রয়েছে পোড়া সিগারেটের গোড়া, দলা পাকানো কাগজ।

অবশেষে সবচেয়ে বড় একটা কেবিনে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। জানালায় পর্দা টানা। অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা। দরজার পাশের সুইচ টিপল কিশোর। আলো জ্বলল না।

'পাওয়ার নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আইলিন লিসটার এখন মরা জাহাজ।'

দরজার পাল্লা পুরোটা খুলে দিল কিশোর। চওড়া একটা বিছানা প্লাস্টিকের চাদরে ঢাকা। চেয়ার আর টেবিলগুলোও ঢেকে রাখা হয়েছে একই রকম চাদর দিয়ে। কেবিনের একধারে রয়েছে অসংখ্য তাক। তাকের সামনের ধারগুলোতে নিচু রেলিঙ দেয়া, যাতে কোন জিনিস গড়িয়ে পড়তে না পারে।

একটা তাকে টর্চ দেখতে পেল কিশোর। নামিয়ে এনে জ্বালল। সারা ঘরে

আলো বোলাল।

'হ্যাঁ, এটাই লিসটারের ঘর,' মুসা বলল।

তাকের ওপর যা থাকার কথা তা-ই রয়েছে। বই আর বই। যেখানেই ফাঁক পাওয়া গেছে ঠেসে ভরে দেয়া হয়েছে কাগজপত্র। বইয়ের ফাঁকে টোল পড়ে যাওয়া দুটো টেনিস বলও ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। চামড়ার একটা দস্তানা ফেলে রাখা হয়েছে একটা বাউলিং ট্রফির পাশে, আরনেস্ট জে. ক্র্যাবস নামে একজনকে ওটা পুরস্কার দিয়েছে ওয়েস্টসাইড কেগলারস ক্লাব।

'আরেকজনের পুরস্কার লিসটার রেখেছেন কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

এগিয়ে গেল কিশোর। ট্রফিটার দিকে চোখ। মেঝেতে স্তূপ করে রাখা জিনিসে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ত আরেকটু হলেই। পেছনের দেয়াল থেকে টেনে সরিয়ে আনা হয়েছে একটা তাক। কাত হয়ে রয়েছে ওটা। বইপত্র মেঝেতে ছড়ানো। নিচু হয়ে স্তূপের সব চেয়ে ওপরের বইটা তুলে নিল কিশোর। অনেক পুরনো একটা বই। চামড়ায় বাঁধানো। শক্ত হয়ে গেছে পুট, ফলে খুলে ছেড়ে দিলেই ঝট করে বন্ধ হয়ে যায়, যেন স্প্রিং লাগানো রয়েছে।

আলো ফেলে ভাল করে দেখল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কাভারের ডিজাইনটার দিকে। চোখা, উঁচু চূড়াওয়ালা একটা টুপির মত দেখতে। টুপিটার সামনের দিকে একটা ক্রস।

দুই সহকারীকে দেখাল ওটা সে। 'বিশপের টুপির মতই তো লাগছে। বিশপের বইটা বোধহয় খুঁজেই পেলাম অবশেষে।'

দরজার দিকে ঘুরল সে। ডেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে। বাধা পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ। চওড়া কাঁধ। নীল রঙের ওয়ার্ক শার্ট পরা।

ভালুকের থাবার মত বড় একটা হাত বাড়াল লোকটা। 'ওটা নিয়ে যেতে পারবে না এখান থেকে। দেখি, দাও!'

বারো

বিশালদেহী লোকটার পেছনে এসে হাজির হল আরও দু'জন। চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই তিন গোয়েন্দার।

বইটা দিতে চাইল না কিশোর। তার হাত থেকে কেড়ে নিল বিশালদেহী লোকটা।

পেছনের একজনের হাতে একটা পাইপ। এক হাতে আলতো করে ধরে ওটার মাথা বাড়ি মারতে লাগল আরেক হাতের তালুতে। এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল, যেন তার মাথায় বাড়িটা মারতে পারলে খুশি হত।

'বিরক্ত করে ফেলেছে,' লোকটা বলল। 'কি করে যে বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসে! আর এলেই কেবল চুরির তাল! এবার আর ছাড়ছি না। চুরির মজা এবার টের পাবে।'

'আমরা চোর নই,' জবাব দিল কিশোর। 'মিস এলেনা লিসটারের অনুরোধে

এসেছি। গেটে সই করেছি। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

সন্দেহ ফুটল লোকগুলোর চোখে। একজনও স্বীকার করতে রাজি নয়, ভুল করেছে।

'আমাদের কিছু হলে মিস লিসটারের কাছে জবাব দিতে হবে আপনাদেরকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আবার কিশোর।

'এবং শুধু দিয়েই পার পাবেন না,' আরেকটু ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে বলল মুসা, 'আরও ভোগান্তি আছে।'

সেটা বুঝতে পেরে রবিন বলল, 'পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার আমাদের বন্ধু। যান। বিশ্বাস না করলে থানায় ফোন করে দেখতে পারেন। কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করুন।'

'কি বল, ডিক?' পাইপওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন।

'আমাদের বোকা বানাচ্ছে,' বলল বিশালদেহী ভালুক। কিন্তু গলায় জোর নেই। তাকিয়ে রয়েছে গেটের দিকে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ছেলেরা।

'শিওর হওয়া দরকার,' বলল তৃতীয়জন। 'আগেই কিছু করা উচিত হবে না।' গেটে যাওয়ার জন্যে রওনা হল সে।

অপেক্ষা করতে লাগল অন্য দু'জন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল লোকটা। সঙ্গে এসেছে দারোয়ান। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এরাই। আধ ঘন্টা আগে ঢুকতে দিয়েছি।'

'তাই,' সাংঘাতিক নিরাশ হল যেন বিশালদেহী লোকটা। কিছু কিলচড় দেয়ার জন্যে হাত নিশপিশ করছিল বোধহয়। সেটা আর পারল না। 'বেশ। কর, যা করছিলে।'

'বইটা দিন,' হাত বাড়াল কিশোর।

'সরি!' বইটা ফেরত দিল লোকটা। 'ভুল হয়ে গেছে। অনেক চোরছ্যাঁচড় আসে তো, বড্ড জ্বালাতন করে।'

চলে গেল লোকগুলো। লোহালক্কড়ের জঙ্গলে ওরা হারিয়ে না যাওয়া তক অপেক্ষা করল ছেলেরা। তারপর লম্বা দম নিয়ে হাতের বইটার দিকে তাকাল কিশোর।

'তুমি কাঁপছ,' মুসা বলল।

'দূর!' মনে মনে ধমক দিয়ে হাতটাকে কাঁপতে নিষেধ করল কিশোর। 'ধাপ্পা দিচ্ছিল লোকগুলো। কিছুই করত না।'

বইটার মলাট ওল্টাল সে। ভয় হল পাতা খুলে ছড়িয়ে যাবে, কিন্তু গেল না। শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে। বেশি জোরে চাপ লাগলে মুড়মুড় করে ভেঙেও যেতে পারে, এমনই মনে হল তার কাছে। বইয়ের মাঝের কয়েকটা পাতা নেই। কেটে নেয়া হয়েছে।

'এটা একটা ডায়রি,' ঘোষণা করল যেন গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিংবা ডায়রির মতই কিছু। হাতে লেখা। তারিখ রয়েছে। শুরু হয়েছে 'এনিরো' দিয়ে। স্প্যানিশে

জানুয়ারিকে এনিরো বলে। জানুয়ারির পয়লা তারিখে বিশপ সান্তাফে বোগোটা নামে একটা জায়গায় গিয়েছিল…'

'বোগোটা!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। 'ওটা তো কলাম্বিয়ায়! তাহলে সোগামোসোর সঙ্গে একটা যোগাযোগ পাওয়া গেল। সোগামোসোও কলাম্বিয়ায়।'

'ঠিক!' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে কিশোর, কিন্তু পারছে না, চকচক করছে চোখ। 'এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই ডেভিড লিসটারের গায়েব হওয়ার সঙ্গে ওই কমপিউটারের মেসেজেরও সম্পর্ক রয়েছে। হয়ত ওটাই আসল কারণ।'

'কিন্তু বইটার ব্যাপারে কি হবে?' মুসার প্রশ্ন। 'কিশোর, কি আছে, বলত?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। অনেক শব্দই অপরিচিত। লেখাও আবছা। আর এত ঘন, মাঝে মাঝে দুটো লাইন প্রায় এক হয়ে গেছে। 'আমার পড়ার সাধ্য হবে না,' বলল সে। 'ইংরেজি হলেও পারতাম না, যা অবস্থা।'

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। 'হ্যাঁ। পুরনো দলিলের মত। যেগুলোতে এস লিখলে এফ-এর মত লাগে।'

'তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?' মুসা বলল, 'জলদি চল, প্রফেসর সাইনাসের কাছে চলে যাই।' ডক্টর ওয়ালটার সাইনাস, রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রফেসর, স্প্যানিশ আর মেকসিকান ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের বন্ধু। আগেও অনেক সাহায্য করেছেন তিন গোয়েন্দাকে।

'তাঁর কাছে গেলেই ভাল হয়,' কিশোর বলল। 'তবে বইটা নিতে হলে এলেনার অনুমতি দরকার। আমাদেরকে বইটা খুঁজে দিতে অনুরোধ করেছে সে, যাতে ওটা দিয়ে তার বাবাকে উদ্ধার করে আনতে পারে কিডন্যাপারদের হাত থেকে। হয়ত বইটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তার। বাবাকে উদ্ধার করতে পারলেই খুশি।'

'তা বটে,' একমত হল মুসা। 'কেসটা এমনই, মাঝে মাঝেই আমি কিডন্যাপিঙের কথা ভুলে যাই। অথচ ওটাই আসল ব্যাপার।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। লিসটারের কেবিনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গেটে এসে চাবির গোছা বুঝিয়ে দিল দারোয়ানকে। তারপর চলল একটা পে ফোন খুঁজে বের করতে। এলেনার মায়ের বাড়িতে ফোন করে এবার আর তাকে পেল না। জবাব দিল অ্যানসারিং মেশিন। একটা মেসেজ রেখে দিয়ে, রকি বীচে লিসটারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর।

ফোন ধরল মিসেস বেকার। বলল, 'ধর। আমি ডেকে আনছি ওকে।'

এলেনা লাইনে এলে তাকে সব কথা খুলে বলল কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত যেন স্তব্ধ হয়ে রইল সে, যেন খবরটা হজম করতে সময় লাগছে, তারপর বলল, 'থ্যাঙ্ক গুডনেস!'

'বইটা কেন এত জরুরী,' কিশোর বলল, 'বের করতে চান? নাকি শুধু পেলেই খুশি, কিডন্যাপারদের দিয়ে দেবেন?'

দ্বিধা করল এলেনা। 'সময় কম। আবার ফোন করেছিল লোকটা। তাকে

বলেছি বইটা খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর মাত্র একদিন সময় দিয়েছে।'

'তার মানে আগামী কাল পর্যন্ত সময় পাচ্ছি,' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। ডক্টর সাইনাসের কথা বলল। 'তিনি হয়ত পড়ে দেবেন। আর তাঁর সময় না থাকলে অন্য কারও কাছে পাঠাবেন। তো বইটা কি নিয়ে যাব?'

'নিতে পার।' আরেক মুহূর্ত দ্বিধা করল এলেনা। 'সেটাই বোধহয় ভাল হবে। কি জিনিসের জন্যে আব্বাকে আটক করেছে ওরা জানার আগ্রহটা চেপে রাখতে পারছি না। লেগে যাও কাজে। এছাড়া আর কিছু করারও নেই এখন আমাদের। বইটা যে পেয়েছি লোকটাকে জানানোর উপায় নেই। সে ইচ্ছে করে যখন ফোন করবে তখন বলতে পারব। তার আগে সম্ভব না।'

একটা সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল এলেনা, 'আর বাড়িতে এখন বইটা রাখতেই সাহস পাচ্ছি না আমি। যেটার জন্যে আব্বা কিডন্যাপড হয়েছে সেটার জন্যে আমারও ক্ষতি করতে পারে অন্য কেউ, বলা যায় না। কাল রাতে কেউ ঢুকেছিল এ বাড়িতে। আমার ঘর, আলমারি, ড্রয়ার সব খুঁজেছে। মনে হচ্ছে চাবি আছে লোকটার কাছে। আব্বাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হয়ত তার কাছ থেকে আদায় করেছে। ইচ্ছে মত আসাযাওয়া করতে পারছে এখন লোকটা।'

'একজন চাবিওয়ালাকে ডাকুন,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'তালাগুলো বদলে দিয়ে যাক। এভাবে চলতে পারে না। ঠিক আছে, আমরা প্রফেসর সাইনাসের ওখানে যাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে আপনাকে জানাব।'

রুক্সটনে প্রফেসর সাইনাসকে ফোন করল কিশোর। ভাগ্য ভাল। গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, তবু অফিসেই পাওয়া গেল প্রফেসরকে। নিয়মিত অফিসে আসেন তিনি ছুটিতেও। ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হলেন।

তাড়াতাড়ি ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রাশেদ চাচাকে অনুরোধ করল পিকআপটা দেয়ার জন্যে। তিনি তখন বেরোচ্ছিলেন, তিন গোয়েন্দাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামিয়ে দিয়ে যেতে রাজি হলেন। সেখান থেকে কাজে চলে যাবেন। ফেরার পথে সুযোগ পেলে আবার তুলে নেবেন ওদেরকে। আপাতত এই ব্যবস্থাই মেনে নিতে হল কিশোরকে।

একজন বন্ধুর সঙ্গে অফিসে বসে রয়েছেন প্রফেসর সাইনাস। তাঁর বন্ধুটি ভীষণ রোগা। চকচকে টাক। 'ইনি ডক্টর ক্রুগার মনটাগো,' পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। 'আমাদের ডিপার্টমেন্ট অভ রোমান্স ল্যাঙ্গুয়েজের হেড। তোমাদের জন্যেই বসিয়ে রেখেছি। পুরনো স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপির প্রতি তাঁর সাংঘাতিক আগ্রহ।'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। এরকম একজনকেই আশা করছিল মনে মনে। প্রফেসর সাইনাসের চেয়ে ডক্টর মনটাগোকে দিয়ে বেশি সাহায্য হবে, বুঝতে পারছে সে। বিশপের বইটা বের করে বাড়িয়ে দিল ডক্টরের দিকে।

বই খুলে প্রথম পৃষ্ঠাটার দিকে চেয়েই বলে উঠলেন তিনি, 'বাহ্!' পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকলেন তিনি। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। 'সাংঘাতিক জিনিস!'

'কি, স্যার?' জানতে চাইল কিশোর।

'পয়লা জানুয়ারি, সান্তা ফে বোগোটায়,' আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এলেন মনটাগো। 'লেখক নিউ গ্র্যানাডার মানুষের জন্যে ঈশ্বরের কাছে দোয়া করছেন। বলছেন যেন তাদের চেষ্টা সফল হয়। তারপর রয়েছে একটা চিঠির কথা। প্রাসাদে অপেক্ষা করছিল হিজ মোস্ট গ্রেশাস ম্যাজেসটি কিং কার্লোসের চিঠিটা।'

বই থেকে মুখ তুললেন ডক্টর। 'এ তো একটা গুপ্তধন পেয়ে গেছ। এই জার্নালের লেখক সম্ভবত বিশপ ছিলেন। একটা প্রাসাদের কথা লিখেছেন তিনি। আসলে বলতে চেয়েছেন প্যালেস। বিশপের বসত বাড়িকে প্যালেসই বলে। তাঁর কাছে চিঠি লিখতেন রাজা। ওই বিশপ সাধারণ পাদ্রী হলে এভাবে তাঁর কাছে লেখার কথা নয় রাজার। সেটা অবশ্য জানা যাবে একটু পরেই। এসব পুরনো লেখা থেকে তথ্য খুঁজে বের করার কায়দা আছে। কাগজ, কালি এসব পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মনে হচ্ছে ডায়রিটা এনরিক জিমিনির, রক্তাক্ত বিশপ বলা হত যাকে!'

'রক্তাক্ত বিশপ?' প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর।

ঢোক গিলল মুসা। 'কিছু হয়েছিল নাকি তাঁর?'

'আসলে, আমাদের সবারই কিছু না কিছু ঘটে,' ডক্টর মনটাগো বললেন। 'জীবন হল একটা সাময়িক ব্যাপার। তাই মৃত্যু থেকে মুক্তি নেই কারও। রক্তাক্ত বিশপের ঠাণ্ডা লেগেছিল। তখনকার দিনে ঠাণ্ডা ছিল মারাত্মক অসুখ। সহজেই নিউমোনিয়ায় রূপ নিয়ে শেষ করে দিত মানুষকে। শোনা যায়, অসুস্থতার সময় তাঁকে এড়িয়ে চলেছিল তাঁর একজন চাকর। ইচ্ছে করেই। যাতে তাঁর মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি হয়। তবে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না একথা। সন্দেহটা গাঢ় হয় একটা ব্যাপার থেকে, বিশপের মৃত্যুর পর পরই পালিয়েছিল সেই চাকর। প্রতিদিন জার্নাল লিখতেন বিশপ জিমিনিজ, কিন্তু তাঁর সেই জার্নাল পাওয়া যায়নি।'

প্রফেসর সাইনাস দরাজ হাসি হাসলেন তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে। 'যাও, পেয়ে গেলে আরেকটা রহস্য। পুরনো রহস্য খুঁচিয়ে বের করতে তো ওস্তাদ তোমরা। বেশি না, মাত্র চারশো বছরের পুরনো এই ঘটনা। সূত্রটুত্র এখনও নিশ্চয় কিছু পাবে।'

'স্বর্ণ জড়িত থাকতে পারে এতে,' মনটাগো বললেন। ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'দক্ষিণ আমেরিকায় এসে ঢুকল স্প্যানিশ সৈন্যরা। মার্চ করে এগিয়ে চলল। চলার পথে যত জমি পড়ল, সব দখল করে নিল রাজা আর রানীর নামে। সোনাও পাওয়া যেত মাঝে মাঝে। জাহাজ বোঝাই করে সেসব সোনা চালান যেত স্পেনে। মূল্যবান যা কিছু পেয়েছে নিয়ে গেছে স্প্যানিশরা। জোর করে ধরে এনে ইনডিয়ানদেরকে খনির কাজ করতে বাধ্য করেছে। শোনা যায় সোনার খনিতে যে সব ইনডিয়ানরা কাজ করত তাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছেন বিশপ জিমিনিজ। সে জন্যেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল রক্তাক্ত বিশপ...'

'ও,' কথাটা শোনামাত্রই বিশপের ওপর থেকে শ্রদ্ধা চলে গেল রবিনের। 'এই

ব্যাপার। তাহলে তো তার নাম রাখা উচিত ছিল রক্তখেকো বিশপ।'

'তবে সত্যিই তিনি অত্যাচারী ছিলেন কিনা জানা যায়নি,' মনটাগো বললেন। 'হতে পারে রাজার লোকেরাই গিয়ে মিথ্যে কথা ছড়িয়েছে। খনির ওভারশিয়ার নিজেই হয়ত ওসব অত্যাচার করেছে, দোষ দিয়েছে বিশপের। শত শত বছর পরে এখন আর কে ঠিক করে করে বলবে?

'যাই হোক, বিশপ নাকি পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন। বৃদ্ধ বয়েসে ইনডিয়ানদের সঙ্গে ভাব করে অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। লোকে মানুষের ভালটার চেয়ে খারাপটাই বেশি দেখে। ভাল বেশি হলেও দেখে না, খারাপ কম হলেও সেটা মনে রেখে দেয়। রক্তাক্ত বিশপের বেলায়ও এই ব্যাপারই ঘটেছে। তাঁর কুকর্মগুলোর কথাই বেশি মনে রেখেছে লোকে।'

নীরব হয়ে রইল ছেলেরা। ভাবছে সেই চারশো বছর আগের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান লিসটার কিডন্যাপিঙের কি যোগাযোগ?

অবশেষে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বিশপ জিমিনিজের জার্নালটা কি খুবই দামী কিছু? যেটা খোয়া গেছে?'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন ডক্টর মনটাগো। 'দামী? তা সবার জন্যে না-ও হতে পারে। স্কলার আর ঐতিহাসিকদের কাছে হয়ত অমূল্যই হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নয়। এই যেমন ম্যাগনা কার্টা-র লেখার খসড়া, কিংবা কলম্বাসকে লেখা রানী ইসাবেলার চিঠির মত অনেক দামে বিক্রি হবে না এটা।'

বইটা বগলদাবা করলেন মনটাগো। 'কিন্তু একজন স্কলারের কাছে? অসাধারণ! আমি আর থাকতে পারছি না। এখনই গিয়ে অনুবাদে বসতে চাই...'

'না না!' রবিন বলল।

'সময় পাবেন না!' বলল মুসা।

'মানে?' হাসি মুছে গেছে মনটাগোর।

'এর বর্তমান মালিক কিডন্যাপড হয়েছেন,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'তাঁকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে এই বইটা দাবি করেছে কিডন্যাপার। কালকের মধ্যে না দেয়া গেলে কি করে বসে ঠিক নেই।'

'ও,' চিন্তায় পড়ে গেলেন যেন ডক্টর। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হল মুখ। 'তাহলে...ফটোকপি করার সময়...নাহ্, হবে না। এরকম বই সাধারণ জেরোক্স মেশিনে করা যাবে না। ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থায় ফটোকপি করে নেবে ওরা।'

বগলের নিচ থেকে বইটা বের করে ওটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর যেন ওটা একটা মহামূল্যবান বস্তু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

'আশা করি,' বললেন তিনি। 'আর এটা নিখোঁজ হবে না। কোনভাবে বাঁচাতে যদি পার...'

'চেষ্টা তো নিশ্চয় করব, স্যার,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'আর রাখতে পারলে

অনুবাদের জন্যে আপনাকেই প্রথম দেব।'

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ ফিরে তাকাল কিশোর, 'আচ্ছা, ঈশ্বরের অশ্রুর কথা আপনি কিছু জানেন, স্যার?'

'ঈশ্বরের অশ্রু?' ভুরু কোঁচকালেন মনটাগো। 'পান্নার ওই নাম রেখেছে ইনডিয়ানরা। কেন? তার সঙ্গে এই বইয়ের কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকতে পারে!'

তেরো

'পান্না!' চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসল রবিন। তাকিয়ে রয়েছে হেডকোয়ার্টারের ছাতের দিকে। 'স্প্যানিশ সৈন্য! চোরাই ডায়রি! নিরুদ্দেশ চাকর! সব মিলিয়ে চমৎকার এক রহস্য! মিস্টার ক্রিস্টোফার শুনলে খুব খুশি হবেন। এরকম কাহিনীই তো তিনি চান ছবি বানানোর জন্যে।'

কিশোরও হাসল। 'বানাতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। সমস্ত রহস্যের জট খুলে পুরো একটা কাহিনী তৈরি করতে হবে, তার পর না ছবি।'

মেসেজের কমপিউটার প্রিন্ট আউটটা ডেস্কে রেখে দেখছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'ঈশ্বরের অশ্রু। এলেনার জন্যে সূত্র। কিন্তু অশ্রুগুলো কোথায়? আর রক্তাক্ত বিশপের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ছিল?'

'কলাম্বিয়ায় প্রচুর পান্না পাওয়া গেছে,' রবিন বলল। 'পান্নার খনি আছে ওখানে। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পান্নার খনি, রেফারেন্স বইতে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওগুলো খুঁজে আনার জন্যে এলেনাকে সোগামোসোতে যেতেই হবে। পান্নার খনির সঙ্গে বিশপের কোন যোগাযোগ ছিল না তো? নাকি শুধুই সোনা?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিকেল তো শেষ। ফোন করে এলেনাকে জানানো দরকার সব কথা।' রিসিভার তুলল সে। লিসটারের নম্বরে ডায়াল করল। দ্বিতীয়বার রিঙ হতেই জবাব দিল এলেনা।

'আমি,' কিশোর বলল। 'কি ব্যাপার? উত্তেজিত লাগছে। ফোন করেছিল নাকি আবার?'

'না। তুমি করলে তো, ভাবলাম কিডন্যাপারই করেছে। রুক্সটনে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছি। বইটা একজন বিশপের ডায়রি। কয়েক শো বছর আগে কলাম্বিয়ায় বাস করতেন। সোনার খনিতে সাংঘাতিক অত্যাচার করতেন ইনডিয়ানদের ওপর, সে জন্যে নাম হয়ে গেছে রক্তাক্ত বিশপ। অসুখ হয়ে বিশপ মারা গেলে ডায়রিটা নিখোঁজ হয়ে যায়। সব কিছু পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না, কারণ বইটার পুরো অনুবাদ করা হয়নি। ডক্টর মনটাগোর কাছে রেখে আসতে পারলে, সময় দিতে পারলে, হত। আমরা তো সেটা করতে পারি না।'

'না, পার না।'

'আরেকটা কথা, ঈশ্বরের অশ্রু জিনিসটা কি জানতে পেরেছি। অ্যানডিজ পর্বতের ইনডিয়ানরা পান্নার ওই নাম দিয়েছে।'

'পান্না?' এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল এলেনা। তারপর আবার বলল, 'পান্না? আমাকে এতগুলো দামী জিনিস দান করে দিল আব্বা? মধ্য গ্রীষ্মের দিন আর বৃদ্ধা মহিলা বলতেই বা কি বোঝাতে চেয়েছে? আরও যেসব সংকেত?'

'আপনার আব্বাকে উদ্ধার করে আনতে পারলে সমস্তই জানা যাবে। এখন যেটা জরুরী, বইটা কিডন্যাপারকে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনা। আজ রাতে কোথায় থাকবেন? ওখানেই? কাউকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে?'

'না,' এলেনা বলল। 'দরকার নেই। আজ রাতে আম্মা এসে থাকবে বলেছে। কিছু জানতে পারলে তোমাদেরকে জানাব।'

লাইন কেটে দিল এলেনা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেজে উঠল ফোন। হেনরি বেসিন ফোন করছে। 'এলেনা লিসটার আমার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে। দোকানে আসতে পারবে? তোমাদের টাকাটা দিয়ে দিতাম।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল কিশোর।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বইটা আলমারিতে ভরে তালা দিল কিশোর। তারপর দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল ট্রেলার থেকে। সাইকেল নিয়ে রওনা হল।

রকি বীচের একটা গলিতে বেসিনের দোকান। ছেলেরা পৌঁছে সামনের অংশে কাউকে দেখতে পেল না। রান্নাঘরে চলে এল ওরা। ওখানে পাওয়া গেল বেসিনকে। টেবিলে খাতা বিছিয়ে গভীর মনোযোগে হিসেব করছে। কিশোররা ঢুকতে একটা মেয়ে বেরিয়ে গেল। সে-ও পার্টিতে কাজ করতে গিয়েছিল। পাওনা বুঝে নিয়ে গেল বোধহয়।

হাসল বেসিন। 'টাকা রেডিই রেখেছি।' একটা করে খাম তুলে দিল তিনজনের হাতে। 'সবাইকেই দিয়েছি। বাকি রইল একমাত্র পিকো।'

'পিকো?' কিশোর বলল। 'ওহহো, মনে পড়েছে। ধোয়ামোছার জন্যে যাকে নেয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। গত দু'হপ্তা ধরে আমার এখানে কাজ করছে। অনেক সাহায্য হচ্ছে আমার।'

নিজের খামটা খুলল রবিন। নোটগুলো গুণে বলল, 'বেশি দিয়ে ফেলেছেন।'

'কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বেসিন বলল। 'এত কম হাতে উঠছিল না। অনেক খেটেছ, দেখেছি তো। চকলেট কেক খাবে? কাল বিকেলে একটা বাচ্চার জন্মদিনে গিয়েছিলাম। অনেক কেক বেঁচেছিল, নিয়ে এসেছি। আমি মুখেও দিতে সাহস করিনি। এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছি। আমার গার্লফ্রেণ্ডও জানলে মাথায় বাড়ি দেবে।'

'কেকটা ভালই হয়েছে, না?' জানতে চাইল কিশোর।

হাসল বেসিন। 'প্যানট্রিতে রয়েছে। ওই দরজাটার ওপাশে, তাকে।'

প্যানট্রিতে এসে ঢুকল কিশোর। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত রয়েছে অসংখ্য তাক। জিনিসপত্র বোঝাই। চকলেট, ময়দা, চিনি, তেল, খাবার বানাতে লাগে এরকম নানা জিনিস।

চকলেট কেকটা নামাতে দরজাটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। পাল্লাটা অর্ধেক ভেজিয়ে দিল কিশোর। কেকের পাত্রের পাশে যে ছুরিটা রেখে দিয়েছে বেসিন সেটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে সে, এই সময় পায়ে লাগল কি যেন। নিচে চেয়ে দেখল দরজার পেছনে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ঠেলে রাখা হয়েছে। লাল ব্যাগ। উজ্জ্বল বেগুনী রঙে লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম। ডি·এল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে এসেছে জিনিসটা।

একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তাহলে লিসটারের দোকানে গিয়েছিল বেসিন। তা যেতেই পারে। জিনিস কিনতে যে কেউ যেতে পারে ওই দোকানে। ক্যাটারার গেলেও কোন দোষ নেই। কি কিনতে গিয়েছিল? শার্ট? জুতো? এনথনির সঙ্গে নিশ্চয় ব্যবসার সম্পর্ক নেই বেসিনের।

এলেনার মায়ের বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছে এনথনি, দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। ঠিক কোন জায়গাটায় ছিল সে, যখন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল কিশোর?

লুকিয়ে ছিল! আর কোন ব্যাখ্যাই হতে পারে না। যদি কোন কুমতলব না থাকত, আর শুধুই দেখা করতে যেত তাহলে লিভিং রুমেই বসে থাকত, স্বাভাবিক ভাবে। কিশোরের সামনে থাকতে দ্বিধা করত না। কিন্তু সে লুকিয়েছিল। কেন?

তার সঙ্গে হেনরি বেসিনেরও কোন সম্পর্ক রয়েছে? লিসটারের কিডন্যাপের ব্যাপারে তারও হাত রয়েছে? নাহ্, লোকটাকে দেখে সেরকম মনে হয় না। তবে মুখ দেখে সব সময় অপরাধীকে সনাক্ত করা যায় না। তাহলে মোটিভটা কি? লিসটারের কমপিউটারে বেসিনের নাম নেই। থাকার কথাও নয়। লিসটারের কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে না বেসিন। কিন্তু তাই বলে শত্রুতা থাকতে পারে না এমন কোন কথা নেই। কে যে কখন কিভাবে কার শত্রু হয়ে উঠবে বলা মুশকিল। এমনও হতে পারে রক্তাক্ত বিশপের ডায়রির কথাটা জানে বেসিন। কিংবা এনথনি জানিয়েছে। বেসিনের টাকার দরকার। কাজেই সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। ঘুস নিয়েছে।

প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের ওপর দিকটায় নীল রঙের কি যেন রয়েছে। ঝুঁকে ছুঁয়ে দেখল কিশোর। একটা উইণ্ডব্রেকার। নাড়া লেগে কাত হয়ে পড়ে গেল ব্যাগটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল উইণ্ডব্রেকারটা। ওটার নিচে রয়েছে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ। ছুঁলো না কিশোর। শুধু তাকিয়ে রইল।

দেখতে পাচ্ছে কাগজটার বিভিন্ন জায়গা কাটা। শব্দ! প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন থেকে শব্দ কেটে নেয়া হয়েছে। ওগুলো কেটেই লাগিয়েছিল এলেনার কাছে পাঠানো নোটে…

'কিশোর?' রান্নাঘর থেকে ডাকল বেসিন। 'কি করছ? পাওনি?'

ভীষণ চমকে গেল কিশোর। তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতরে উইণ্ডব্রেকারটা ঢুকিয়ে আগের মত করে রেখে দিল। দ্রুত হাতে তিন টুকরো কেক কেটে নিয়ে বেরিয়ে এল প্যান্ট্রি থেকে।

'আপনার জন্যে আনলাম না,' বেসিনকে বলল সে।

'না, খাব না। ঠিকই করেছ।'

খেতে শুরু করল রবিন আর মুসা। একটা টুল টেনে নিয়ে নিজের টুকরোটায় কামড় বসাল কিশোর।

'তারপর?' যেন নিছকই আলোচনার জন্যে বলল বেসিন। 'এলেনার সঙ্গে কেমন কাটছে তোমাদের? কিছু পেলে? বাবাকে মুক্ত করতে পারবে মেয়েটা?'

'চেষ্টা তো নিশ্চয় করবে। কিন্তু খুব কঠিন কাজ। কিডন্যাপার এমন একটা জিনিস চাইছে যেটার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না। টাকাটুকা কিছু না, লোকটা চাইছে বিশপের বই।'

খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে রবিন আর মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জনে। মুসা বলেই ফেলতে যাচ্ছিল, 'কিন্তু আমরা তো জানি!'

কি ভেবে বলল না সেকথা। বলার জন্যে মুখ খুলে ফেলেছে, কিছু একটা বলতেই হয়, 'লিসটারের বাড়ির হাজার হাজার বই ঘেঁটে ফেলেছি আমরা। আরও কত জিনিস যে ঘেঁটেছি। কোন কিছুই ফেলে দেয় না লোকটা। এক অদ্ভুত চরিত্র।'

হাসল বেসিন। 'হ্যাঁ। বেশির ভাগেরই কানাকড়ি দামও নেই।'

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনেও যাব। বোস্প্রিট ড্রাইভের শিপইয়ার্ডটার কথা শুনেছেন? সেখানে ড্রাই ডকে লিসটারের একটা ইয়ট তুলে রাখা হয়েছে। আইলিন লিসটার। দেখা যাক, বিশপের বই মেলে কিনা ওখানে। ওখানেও নিশ্চয় বাড়ির মতই জঞ্জাল বোঝাই করে রেখেছেন লিসটার।'

'রাখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।' কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল বেসিন। 'এসেছ। এস। টাকা রেডি। যা বলেছিলাম তার চেয়ে বেশিই পাবে।'

ফিরে তাকিয়ে কিশোরও দেখতে পেল পিকোকে। ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে এগিয়ে গেল বেসিনের কাছে।

'তোমাদের হল?' রবিন আর মুসাকে বলে শেষ টুকরোটা মুখে পুরল কিশোর।

বেসিনকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দাঁড়িয়ে রয়েছে বেসিনের ভ্যান। সেটার পাশ কাটাল ওরা। গলি পার হয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। ফিরে তাকাল কিশোর।

'ব্যাপারটা কি বল তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওরকম না জানার ভান করলে কেন?'

'নিশ্চয় কিছু বের করেছ,' মুসা বলল।

'প্যানট্রিতে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ আছে,' কিশোর বলল। 'লিসটারের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জিনিস। তার মধ্যে একটা খবরের কাগজ আছে। কিছু কিছু শব্দ কেটে নেয়া হয়েছে।'

'বল কি!' হাঁ হয়ে গেল রবিন।

'ঠিকই বলছি।'

'বেসিন?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'ও কিডন্যাপার? যত যাই বল

আমার বিশ্বাস হয় না! তোমার দাদা ড্রাকুলা ছিলেন একথা বললে যেমন বিশ্বাস হবে না...'

'বিশ্বাস না হলেও ব্যাপারটা সত্যি হতেই পারে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'বেসিনের ব্যাপারটাও অসম্ভব কিছু নয়। নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'তার মানে তার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করে এলে,' রবিন বলল।

'করে এলাম। সে ভাববে শিপ ইয়ার্ডে ইয়টের মধ্যে থাকতে পারে বিশপের বই। জানল তো। দেখা যাক এখন কি করে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মুসা। 'তার পিছু নিতে হলে একটা গাড়ি এখন জরুরী। আমাদেরগুলো তো জাহান্নামে গেছে! কোথায় যে পাই...'

'আরনি ভিনসেনজোর কাছে,' সমাধান করে দিল কিশোর। 'আমাদেরকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে সে।'

চোদ্দ

পনেরো মিনিটেই পৌঁছে গেল আরনি। ধূসর রঙের একটা সিডান নিয়ে এসেছে। বাম্পারে মরচে পড়া। রঙ চটে গেছে জায়গায় জায়গায়। 'পাশের বাড়ির একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি,' জানাল সে। 'ইচ্ছে করেই আনলাম। এত পুরনো গাড়ির ওপর নজর দেয় না কেউ। তা কার পিছু নিতে হবে?'

'হেনরি বেসিন,' কিশোর বলল। 'ওদিকটায় তার দোকান। বেরোবে এখনই।'

'বেসিন?' অবাক হল আরনি। 'সে এতে জড়িত? এত ভাল একটা লোক?'

'বিশ্বাস করা শক্ত,' স্বীকার করল কিশোর। 'কিন্তু আমি প্রমাণ পেয়েছি...ওই যে, বেরোল।'

ক্যাটারিং শপের পেছন দিকে তাকাল সবাই। ছিটকানি লাগাচ্ছে বেসিন।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আরনি।

ভ্যানে উঠল বেসিন। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেরা।

মোড়ের কাছে গিয়ে ব্রেক করল বেসিন। ডানে বাঁয়ে তাকাল। তারপর মোড় নিয়ে কোস্ট হাইওয়ের দিকে রওনা হল।

একটা ব্লক তাকে এগোতে দিল আরনি। তারপর অনুসরণ করে চলল।

চৌরাস্তায় এসে থামতে হল বেসিনকে। লাল আলো জ্বলেছে। দূরে থাকতেই গতি কমিয়ে দিল আরনি। আরেকটা ভ্যান পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল মাঝের ফাঁকে। গাড়িটাতে কয়েকজন লোক, সার্ফ করতে চলেছে সাগরে।

'বেশ সাবধানী লোক আপনি,' প্রশংসা করল মুসা।

হাসল আরনি। 'ডিটেকটিভ ছবি দেখেছি অনেক। কি করে অনুসরণ করতে হয় শিখে নিয়েছি।'

সবুজ আলো জ্বলল। হাইওয়েতে উঠল গাড়িগুলো। উত্তরে চলল, বোস্প্রিটের দিকে। শেষ মোড়টার কাছে গিয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেল কিশোরের স্নায়ু। কিন্তু তাকে হতাশ করে দিয়ে থামল না ক্যাটারারের ভ্যান, সোজা এগিয়ে চলল।

'কিশোর,' রবিন বলল। 'থামল না তো! তার মানে এসবে নেই?'

জবাব দিল না কিশোর।

চ্যাপারাল ক্যানিয়নে পৌঁছে ব্রেক করল বেসিন। ডানে মোড় নিল। হাইওয়ে থেকে তিন ব্লক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। ওটার সামনে গাড়ি রেখে গিয়ে সামনের দরজায় উঠল সে। বেল বাজাল।

ভ্যানের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল আরনি। পরের ব্লকের কাছে গিয়ে থামল। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখল বেসিনকে। কয়েক মিনিট পরে একটা মেয়েকে সহ বেরিয়ে এল। সুন্দর চেহারা মেয়েটার, কালো চুল। দু'জনে এসে উঠল ভ্যানে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে চলল আবার গাড়িটা।

কিন্তু এবারেও গতি কমাল না শিপইয়ার্ডের কাছে।

'নাহ্, যাচ্ছে না তো,' নিরাশ হয়ে বলল রবিন। 'আজ রাতে আর যাবে না।'

সত্যিই গেল না বেসিন। সোজা দক্ষিণে মেরিনা ডেল রে-এর কাছে একটা রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে গিয়ে ঢুকল।

'বুঝলাম,' আরনি বলল। 'গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে গেছে ডিনারে। এতে কোন দোষ নেই। ক্রাইম করেনি। ও শিপইয়ার্ডে ঢুকলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত আমার।'

আরনি কথা বলছে, বেসিন তখন রেস্টুরেন্টের সামনের দরজায় গিয়ে দঁড়িয়েছে। দরজা ঠেলে খুলে ধরে রাখল যাতে মেয়েটা ঢুকতে পারে। তারপর ফিরে তাকাল। যেন আরনির গাড়িটার দিকেই তার নজর। একটু মুহূর্তের জন্যে ডেভিড লিসটারের দাঁড়ানোর ভঙ্গি মনে পড়ে গেল কিশোরের। গেলাস ভাঙার পর রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন লিসটার, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বেসিন আর পিকোর দিকে। কল্পনায় দেখতে পেল পিকোর চেহারা, তাকিয়ে রয়েছে লিসটারের দিকে। আরনির বলা 'হার্ট অ্যাটাক' শব্দটা যেন প্রতিধ্বনি তুলল কিশোরের মনে।

'আমি একটা গাধা!' কপালে চাপড় মারল কিশোর। 'বেসিন কি করে হয়? ও হতেই পারে না। এখন আমার মনে পড়ছে। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন লিসটার, বেসিনকে শাসানোর জন্যে, তার ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া একটা মেয়ে গেলাস ভেঙে ফেলেছে বলে। তখন থেকেই সমস্ত ঘটনা শুরু।'

নীরব হয়ে গেল সে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। চোখ মুদে ফেলল ধীরে ধীরে। 'ওখানে হেনরি বেসিনও ছিল। ট্রেতে খাবার রাখছিল। পিকো কাজ করছিল সিংকে। সাবান দিয়ে বাসন ডলছিল। হাত ভেজা। ওই মুহূর্তের আগে কিডন্যাপিঙের প্লটই তৈরি হয়নি। বাজি ধরে বলতে পারি। নিরাপদেই ছিলেন লিসটার, হঠাৎ করেই পরিস্তিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠল তাঁর জন্যে। মারাত্মক বিপদ। সেটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। আমি দেখেছি সেটা। অথচ তখন বুঝতে

পারিনি।'

সামনে ঝুঁকল রবিন। 'কেন পারলে না? কি ঘটেছিল?'

'কি রকম রেগে গিয়েছিলেন লিসটার মনে আছে? চিৎকার করছিলেন। তাঁকে থামানোর চেষ্টা করছিল এলেনা। তারপর পিকো তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। হাত থেকে বাসন ফেলে দিয়েছিল। আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছিল লিসটারের।'

'তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই,' আরনি বলল। 'কোন জিনিস ভাঙলে ভীষণ খেপে যায় বুড়োটা। চোখের সামনে একগাদা বাসন ভাঙতে দেখলে শান্ত থাকার কথা নয় তার।'

'আসল কারণ সেটা নয়,' কিশোর বলল। 'বাসনগুলো ভাঙার পর প্রথম ভালমত পিকোর ওপর নজর দিয়েছিলেন লিসটার। তাঁর দিকে তাকিয়েছিল পিকো। লিসটারের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি, কিন্তু পিকোর পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছিল তার চোখে। আমি তখন ভেবেছিলাম বুঝি ভয় পেয়েছে। এখন বুঝতে পারছি ভয় নয়, ঘৃণা। কেঁচোর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় মানুষ, সেই দৃষ্টি। লিসটারকে চিনতে পেরেছিল পিকো। আগে থেকেই পরিচয় ছিল। লিসটারও চিনতে পেরিছিলেন তাঁকে। এ কারণেই অ্যানজিনার অ্যাটাক হয়।'

হাঁ করে শুনছে রবিন। 'পিকো...পিকোই সিয়েটা!'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'ওর ব্যাপারেই এলেনাকে হুঁশিয়ার করেছেন হয়ত লিসটার। আমার ভুল না হয়ে থাকলে এ মুহূর্তে আইলিন লিসটারে বিশপের বই খুঁজতে চলে গেছে পিকো। আমি বেসিনের সঙ্গে যখন ইয়টটার সম্পর্কে কথা বলছিলাম, ওই সময়ই সে ঢুকেছিল। নিশ্চয় শুনে ফেলেছে। প্যান্ট্রিতে যে ব্যাগটা পেয়েছি ওটা বেসিন রাখেনি ওখানে, পিকো রেখেছে।'

'চল তাহলে!' তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাল আরনি। তীব্র গতিতে ছুটল বোস্প্রিট ড্রাইভের দিকে।

সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনে পৌছতে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। মুসার ভয় হতে লাগল, দারোয়ান ওদেরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

'গেট দিয়ে যাওয়ার দরকারও নেই,' কিশোর বলল। 'ওই দেখ।'

দেখল সবাই। আরনির গাড়ির হেডলাইটে ধরা পড়েছে পিকো। শিপইয়ার্ডের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। বেড়ার এক জায়গায় বেশ বড় একটা ফোকর কাটা হয়েছে।

'থামবেন না!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। 'আমরা যে দেখেছি বুঝতেই যেন না পারে। আগে হাতেনাতে ধরি, তারপর জিজ্ঞেস করা যাবে লিসটারকে কি করেছে।'

'চলে যান,' কিশোর বলল। 'পরে নেমে তার পিছু নেব।'

এগিয়ে গেল আরনি। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। দেখল, বেড়ার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে পিকো। দৌড় দিল হাইওয়ের দিকে।

পুরো আধপাক ঘুরে গাড়ির মুখ আবার ঘুরিয়ে ফেলল আরনি। হেডলাইট

নিভিয়ে দিয়ে এগোল। আরেক-বার পাশ কাটাল পিকোর। লোকটা তখন হেঁটে চলেছে। আরনির গাড়ির পার্কিং লাইট শুধু জ্বলছে। অন্য গাড়ি মনে করল পিকো। হাত তুলল থামানোর জন্যে। লিফট চায়।

'তুলে নেব?' আরনির প্রশ্ন।

'মাথা খারাপ?' কিশোর বলল। ' চিনে ফেলবে না?'

'থামল না আরনি। দক্ষিণে এগিয়ে গেল ব্লক দুয়েক। তারপর একটা রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে ঢুকে থামল। এবারও পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। রাস্তায় একটা ভ্যানকে দেখল থেমে পিকোকে তুলে নিতে।

'ডার্ক শেভি ভ্যান,' বলল কিশোর।

'বুঝেছি,' আরনি বলল।

আবার অনুসরণের পালা। দুটো গাড়ির পেছনে রইল আরনি সর্বক্ষণ। চলে এল সান্তা মনিকায়। লিংকন বুলভারে পৌঁছে থেমে গেল ভ্যান। পিকো নেমে গেলে চলতে শুরু করল গাড়িটা।

আরেকবার পিকোর পাশ কাটাল আরনি। কোণের কাছে পৌঁছে থামল। পেছনের জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে ছেলেরা।

মাথা নিচু, কাঁধ বাঁকা করে হাঁটছে পিকো। ফিরে এল আরনি। পাশ কাটাল। দাঁড়াল। আবার ঘুরল। পাশ কাটাল। দাঁড়াল। এভাবেই অনুসরণ করে চলেছে। খেয়ালই করছে না যেন পিকো।

কয়েক ব্লক পরে একটা নির্জন জায়গায় চলে এল ওরা। জায়গাটা পতিত। যেন দানবীয় কোন রেজর ব্লেড দিয়ে চেঁছে তুলে নেয়া হয়েছে ওপরের মাটি।

'পুরনো বাড়িঘর সব ভেঙে ফেলা হয়েছে এখানে,' আরনি বলল। 'পার্ক বানাবে বোধহয়। রাস্তার এত কাছে, যা শব্দ, পার্ক কেমন হবে কে জানে। জায়গা সিলেকশন ভাল হয়নি ওদের। পার্ক হওয়া দরকার নীরব জায়গায়।' গাড়ি থামিয়ে তাকিয়ে রয়েছে পিকোর দিকে।

লোকটা এখন শুধু একটা ছায়া। কয়েকটা অন্ধকার আকৃতির দিকে হেঁটে চলেছে। আলো নেই এখানটায়। খোলা জায়গাটার ওপাশের আকৃতিগুলো বাড়িঘরের। নির্জন, শূন্য, ধ্বংস হয়ে আসা সব বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝের গলিতে হারিয়ে গেল পিকো।

'গাড়ি নিয়ে না গিয়ে,' কিশোর বলল, 'হেঁটেই যাই। সুবিধে।' দরজা খুলল সে।

বেরিয়ে এল চারজনেই। নীরবে পিছু নিল পিকোর। যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সে সেদিকে চলল দ্রুতপায়ে।

'এখানে কোথায় এল?' অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মুসা।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'দেখ!'

সামনে ম্লান আলো। আলোর আভা বললেই ঠিক বলা হয়, পরিত্যক্ত একটা বাড়ির ভেতর থেকে আসছে। পা টিপে টিপে এগোল গোয়েন্দারা। আরও কাছে এলে দেখল জানালার ভেতর দিয়ে আসছে আলোটা। শাটার লাগানো। কিন্তু

কয়েক জায়গায় ভাঙা, আলো বেরোচ্ছে ওই পথে।

অন্য পাশ দিয়ে বাড়ির একেবারে গা ঘেঁষেই চলে গেছে গাড়ি চলাচলের পথ। এত জোরে হর্ন বাজাল একটা লরি, চমকে উঠল ওরা।

গর্জন করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। শাটারের একটা ভাঙা অংশে চোখ রাখল কিশোর। একটা ঘর। একটা বিছানা। পাশে একটা পুরনো আলমারি। তার ওপর হারিকেন জ্বলছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পিকো। লোকটাকে মনে হচ্ছে বেহুঁশ। কাত হয়ে আছে। মুখটা জানালার দিকে ফেরানো। চোখ বন্ধ। এক গোড়ালিতে একটা আংটা, সেটার সঙ্গে শেকল লাগানো। শেকলের আরেক মাথা মেঝের বড় একটা পাথরের ফলকে গাঁথা আরেকটা আংটার সঙ্গে লাগানো। বেঁধে রাখা হয়েছে লোকটাকে।

পিছিয়ে এল কিশোর। সঙ্গীদেরকে ইশারা করল সরে যাওয়ার জন্যে।

বেশ কিছুটা সরে এসে ফিসফিস করে ওদেরকে জানাল কিশোর, 'ডেভিড লিসটারকে পেয়েছি। বের করে আনতে হবে এখন।'

পনেরো

আরেকটা পরিত্যক্ত বাড়িতে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। পরিকল্পনা করার জন্যে।

'সোজা ঢুকে পড়তে পারি আমরা,' আরনি বলল। 'পিকোর কাছ থেকে জোর করে চাবি আদায় করে খুলে নিয়ে আসতে পারি। তবে পিস্তল থাকতে পারে পিকোর কাছে। তাহলে মুশকিল হবে। রাগের মাথায় লিসটারকেই গুলি করে বসতে পারে।'

'আমাদেরকেও করতে পারে,' মুসা বলল। 'এত ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে পুলিশকে ফোন করতে পারি আমরা।'

'তা পারি। বেশ, আমি ফোন করতে যাচ্ছি। ওরা এসে হাতে নাতে ধরবে পিকোকে। আমি সন্দেহ থেকে বাদ যাব। বেঁচে যাই তাহলে।' একটু থেমে আরনি বলল, 'তোমরা এখানেই বসে থাক।'

ছেলেদেরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল আরনি।

'আমাদের কারও যাওয়া উচিত ছিল ওর সঙ্গে,' আরনির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আফসোস করল মুসা।

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'সে কি পুলিশকে ফোন করতে পারবে না?'

'তা পারবে। কিন্তু করবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। লিসটারকে ঘৃণা করার তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মত বদলাতে পারে। চলে যেতে পারে। তাহলে আমরা এখানে বসেই থাকব বসেই থাকব, গাধা হয়ে।'

'থাকতে যাচ্ছে কে?' মুখ খুলল কিশোর। 'আরনিও ভাল করেই জানে বেশিক্ষণ তার জন্যে এখানে বসে থাকব না আমরা। আর চলে গেলে তো সন্দেহমুক্ত হতে পারল না, বরং তার ওপর আমাদের সন্দেহ আরও বাড়বে। নাহ্, সে যাবে না। পুলিশকে ফোন করবে। লিসটারকে এখন আর হাতছাড়া করতে

চাইবে না।' এক সেকেণ্ড চুপ করে ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। 'শোন, পিকোর হাবভাব একটুও ভাল লাগেনি আমার। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। খারাপ কিছু করে বসতে পারে।'

অযথা বসে না থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। চলে এল ম্লান আলোকিত জানালাটার কাছে। ফোকরে চোখ রাখল কিশোর। এখনও আগের জায়গাতেই রয়েছে পিকো। ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে লিসটারের দিকে। হারিকেনের আবছা আলোয় মনে হচ্ছে তার গালে মাংস নেই, গর্ত। আর সারাটা জীবনই যেন ক্ষুধার্ত রয়ে গেছে লোকটা।

'বুড়ো ভাম,' বিড়বিড় করে বল পিকো। 'আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না। এইই, এইই!' বলে জোরে চিৎকার করে ডাকল সে। জানালায় কাচ নেই। তাই রাস্তার গাড়িঘোড়ার শব্দকে ছাপিয়ে সেই চিৎকার কানে এল গোয়েন্দাদের।

'এইই, শুনছো!' আরও ঝুঁকে লিসটারের পা চেপে ধরল পিকো। জোরে ঝাঁকি দিল। 'ঠিকই শুনতে পাচ্ছ। ভান করছ না শোনার। যেন বেহুঁশ হয়ে গেছে, এঁহ্! আমার সঙ্গে ওসব চালাকি খাটবে না।'

ঘাবড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। লিসটারকে কিছু করবে না তো পিকো? পুলিশ নিয়ে আরনি ফেরার আগেই ওরা কিছু করার চেষ্টা করবে?

'বইটা চাই আমি!' লিসটারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল পিকো। 'ওটা আমার জিনিস, আমি অনেক কষ্ট করেছি, আদায় করে নিয়েছি বলা যায়। সারাটা জীবনই নষ্ট করেছি ওটার জন্যে। জেল খেটেছি। তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু তুমি এমনই লোভী, পুরোটা একাই মেরে দেয়ার তালে ছিলে। তুমি আমাকে জেলে পাঠিয়েছ, পাঠাওনি? বইটা হাতে পেতেই চলে গিয়েছ পুলিশের কাছে। গিয়ে বলেছ ওটা কার কাছে আছে জান। আমার নাম বলে দিয়েছ। আমাকে অ্যারেস্ট করল ওরা। আমার মত একজন মানুষকে! পিকো সিয়েটাকে! ছ্যাচড়া চোরের মত কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গিয়ে আমাকে জেলে ভরল পুলিশ!

'আমার ঘরে বইটা পায়নি ওরা, তা-ও জান তুমি। জানবেই তো, তোমার কাছেই তো ছিল। ওরা আমাকে কি করেছে জান? পিটিয়েছে। বার বার জিজ্ঞেস করেছে, বইটা কি করেছি। বলতে পারলাম না। ওরা ধরে নিল আমি ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। জেলে ভরলই ওরা আমাকে।

'তারপর তুমি কোথায় গিয়েছ লিসটার, আমি জানি। সোজা সেই জায়গাটায় চলে গিয়েছিলে। পকেট ভর্তি করার জন্যে। ধনী হওয়ার জন্যে!'

বিছানার কাছ থেকে সরে এল পিকো। ঘুরে দাঁড়াল। পায়চারি শুরু করল। মুঠো শক্ত হয়ে গেছে।

আরনি যেদিকে গেছে অধৈর্য হয়ে সেদিকে তাকাল মুসা। এখনও আসছে না কেন? এত দেরি কেন?

পায়চারি থামাল পিকো। বিছানার কাছে গিয়ে আবার কথা বলতে লাগল। অন্য রকম হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। মানসিক চাপের লক্ষণ। 'তার জন্যে এখন তোমাকে

জবাবদিহি করতে হবে। তুমি ভেবেছ , তোমার মেয়েটা গিয়ে পুলিশকে বলবে। ওরা খুঁজতেই থাকবে,খুঁজতেই থাকবে, তারপর নাটকীয় ভাবে চলে আসবে এখানে, তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে। না, তা হবে না। সে রকম কিছু যাতে না ঘটতে পারে সেজন্যে সতর্ক রয়েছি আমি। মেয়েটা আস্ত ভীতু। রাতে একা বাড়িতে থাকতে পারে না বলে কয়েকটা ছেলেকে ডেকে এনেছে সঙ্গ দেয়ার জন্যে। আরও বেশি যখন ভয় পেলে, পালিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে। ও রকম একটা মেয়ের ওপর ভরসা করে আছ তুমি। পুলিশ নিয়ে আসবে। হুঁহ্! এখানেই থাকতে হবে তোমাকে, বুঝলে?

'কোথায় আনা হয়েছে ভাল করেই জান তুমি, লিসটার। এখানে কেউ আসে না। কেউ চলাচল করে না এদিক দিয়ে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কারও কানে যাবে না। সময়ের অভাব নেই আমার। তাড়াহুড়া করব না। যতক্ষণ না বলছ, ছাড়ছি না। বুঝলে?'

গটমট করে শাটারের কাছে এসে দাঁড়াল পিকো।

ঝট করে একপাশে সরে গেল মুসা।

আরেক পাশে সরল রবিন।

কিশোর পিছিয়ে গেল। লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সময় মত পারল না, দেরি করে ফেলল। শাটার খুলে দিল পিকো। আরেকটু হলেই বাড়ি লাগত কিশোরের মুখে।

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। পুরো একটা সেকেণ্ড নড়তে পারল না কিশোর, পা যেন অসাড় হয়ে গেছে। তারপর পাশ থেকে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে নিল মুসা। ততক্ষণে গোলমাল যা হওয়ার হয়ে গেছে।

দৌড় দিল তিনজনে।

চেঁচিয়ে উঠল পিকো। দড়াম করে আবার বন্ধ হয়ে গেল শাটার। আরও জোরে শব্দ হল দরজার।

ওদের পেছনে ছুটে আসছে পিকো।

পেছনে তাকাল কিশোর। লোকটার হাতে অস্ত্র দেখতে পেল। পিস্তল নয়। লাঠি জাতীয় কিছু। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না সে, আন্দাজ করল পুরনো বেজবল ব্যাট হবে। পিকোর মত লোকের হাতে ওই জিনিসই আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। ওই ব্যাটের কাছে কিশোর আর মুসার জুডো ক্যারাট খাটবে না। লোকটার গায়ে ষাঁড়ের শক্তি। বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে যদি এগিয়ে আসে, কাছেও ঘেঁষতে পারবে না তিনজনের কেউ। পালানো ছাড়া গতি নেই।

ছুটছে তিন গোয়েন্দা। তেড়ে আসছে পিকো, চিৎকার করে গালাগাল করছে। স্প্যানিশ আর ইংরেজিতে। সব বুঝতে পারল না ওরা। এটুকু বোঝা গেল, ধরতে পারলে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। গালাগাল থামিয়ে দিল আরও জোরে দৌড়ানোর জন্যে।

তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত গুঙিয়ে উঠল মুসা। দুটো বাড়ির মাঝের অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। তার পেছনে গেল রবিন। সব শেষে কিশোর। নিজেকে

যেন ছুঁড়ে দিল অন্ধকার ছায়ায়। মিশে যেতে চাইছে।

পিকো থামছে না। আসছেই। ছুটে আসছে ব্যাট উঁচু করে।

আর দৌড়ানোর কোন মানে হয় না। বুঝতে পারছে তিনজনেই। রুখে দাঁড়ানোই দরকার।

ঝুঁকিটা অনেক বেশি হয়ে যাবে, ভাবল মুসা। মাথায় এক বাড়ি পড়লে দু'ফাঁক হয়ে যাবে খুলি। বাড়ি লাগার আগেই ব্যাট ধরে হ্যাঁচকা টানে যদি নিয়ে চলে আসা যায় তাহলে...তবে তার জন্যে সুযোগ দরকার।

অযথা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। পিকো একা, ওরা তিনজন, সুযোগ আসবেই। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মুসা। কিশোর এগোল ওদের পেছনে। আবার ফিরে তাকাল পেছনে, পিকো কতখানি এসেছে দেখার জন্যে।

অনেক কাছে চলে এসেছে।

মুসা এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে। রবিনকে সরিয়ে দিয়ে এসেছে। হাত তুলে দেখাল। অন্ধকারে আবছামত চোখে পড়ল কিশোরেরও, একটা দরজা। শূন্য বাড়িটাতে ঢুকে লুকিয়ে পড়া যায়।

ঢুকে পড়ল কিশোর আর মুসা। আগেই ঢুকে বসে আছে রবিন। হাত ধরাধরি করে এগোল তিনজনে, যাতে আলাদা হয়ে না যায়। অত অন্ধকার, চোখ খোলা রাখা আর বন্ধ রাখা সমান কথা।

কয়েক পা এগিয়েই ফিরে তাকাল দরজার দিকে। বাইরের আলো আসছে, ফলে ওখানটায় অন্ধকার কিছুটা কম। ফ্যাকাশে। দরজার বাইরে থামতে শোনা গেল পিকোকে। খসখসে হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দরজার কাছে ঘাপটি মেরে রয়েছে, ভাবল কিশোর, ওদের বেরোনোর অপেক্ষায়। শব্দ শোনার চেষ্টা করছে, যাতে বুঝতে পারে ওরা কোথায় আছে।

অবশেষে নড়ল পিকো। একটা পা বাড়াল, নীরবতার মাঝে এত মৃদু শব্দও কিশোরের কান এড়াল না। পিছিয়ে যেতে লাগল সে। দরজার কাছ থেকে যতটা সম্ভব সরে যাওয়া উচিত।

এক পা এক পা করে পিছাতে পিছাতে দেয়ালে এসে ঠেকল পিঠ। মুসা এসে থামল তার পাশে। নাকি রবিন? যে-ই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। তিনজনের একসঙ্গে থাকার দরকার,ব্যস।

পাশে সরতে শুরু করল তিনজনে। এক সময় পিঠের কাছটায় শূন্য মনে হল কিশোরের। দেয়াল নেই। ফাঁকা। তার মানে দরজা। যেটাতে রয়েছে ওরা তার পেছনে আরেকটা ঘর। দরজা দিয়ে পিছাতে লাগল কিশোর। সঙ্গে এল অন্য দু'জন। আপাতত নিরাপদ। তবে কয়েকটা সেকেণ্ড কিংবা মিনিটের জন্যে। ওঘরেই রয়েছে পিকো। চুপ করে আছে। কান পেতে শুনছে নিশ্চয়। শব্দ শুনলেই ছুটে আসবে।

চারপাশে তাকাল কিশোর। আর কোন দরজা কিংবা জানালা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। বেরিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। নেই। শুধু নিচ্ছিদ্র অন্ধকার।

আরনি! এতক্ষণে মনে পড়ল তার কথা। আরনি কোথায়? পুলিশ নিয়ে আসছে না কেন?

মুসার সন্দেহই সত্যি হল, তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। মত বদল করেছে আরনি। ওদেরকে ফেলে চলে গেছে। যা করার এখন নিজেদেরকেই করতে হবে। কারও সাহায্য পাবে না। পিকোকে আক্রমণ করে তার হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিতে হবে। তার পরেও কথা থাকে। পিকোর পকেটে পিস্তল থাকতে পারে। ব্যাট হাতছাড়া হয়ে গেলে বের করবে ওটা। তাহলে মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে ওরা।

আচমকা কেঁপে উঠল মেঝেটা। ওদের পায়ের তলায় মাটির গভীরে যেন প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভারি কোন লরি রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন কেঁপে ওঠে মাটি অনেকটা তেমনি।

তারপর গর্জে উঠল ধরণী। গর্জন বাড়ছেই, আরও, আরও। এমন ভাবে ভরে দিল দিগ্বিদিক, যেন ওই শব্দটাই একমাত্র আছে পৃথিবীতে, আর কিছু নেই। টলতে শুরু করল বাড়িটা। ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। বিদ্যুৎ চমকের মত উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো। বাইরের টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো চোখে পড়ল, মাটিতে দেবে যাচ্ছে, যেন মুহূর্তে নরম কাদা হয়ে গেছে কঠিন মাটি।

অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে যেন বাড়িটার। তীব্র আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ রোম খাড়া করা শব্দ করে তক্তা থেকে খুলে আসছে খুঁটিতেমারা পেরেক।

ভূমিকম্প! আর বুঝতে অসুবিধে হল না ছেলেদের। যে কোন মুহূর্তে এখন ধসে পড়তে পারে পুরনো বাড়িটা। দেয়াল থেকে সরে যাবে ছাত, ধুড়ুম করে ভেঙে পড়বে ওদের মাথায়। বাঁচতে চাইলে এখনি বেরিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু বেরোতে পারছে না কিশোর। এমনকি সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। মেঝে দুলছে অশান্ত সাগরের মত। তক্তা আঁকড়ে ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা চালাল।

আটকা পড়ল ও।

ষোলো

কেঁপেই চলেছে ধরণী। থামবে না নাকি? বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে কিশোর। সিনেমায় দেখেছে, ভূমিকম্পের সময় কি রকম করে মাটি ফাঁক হয়ে যায়। তার ভেতরে তলিয়ে যায় ডাইনোসরের মত বিশাল প্রাণীও। কল্পনায় সেসব দেখতে দেখতে শিউরে উঠল সে। তার নিচেও ওরকম ফাঁক হয়ে যাবে না তো? তলিয়ে যাবে না তো মাটির গভীরে? তার পর হাজার বছর পরে ভবিষ্যতের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁড়ে বের করবে তার ফসিল হয়ে যাওয়া কঙ্কাল...

চারপাশে গুঁড়িয়ে চলেছে খুঁটি আর তক্তা। দেয়াল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে টানাটানি করছে ছাত। কাছেই বিকট একটা শব্দ হল। ধড়াস করে এক লাফ

মারল কিশোরের বুক। এই বুঝি গেল বাড়িটা। না, পুরোটা নয়, একটা দেয়াল ধসে পড়েছে। আরও বিকট আরেকটা শব্দ হল। আস্ত একটা বাড়ি ধসেছে। এটাও পড়বে। ইটকাঠের তলায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দার।

অবশেষে দীর্ঘ এক যুগ পরে যেন থামল ধরণীর কম্পন। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘরের কালো অন্ধকারের মাঝে চারকোণা একটা ফ্যাকাশে ফোকর চোখে পড়ল। জানালা। তারমানে দেয়ালটা দাঁড়িয়েই আছে। সাংঘাতিক শক্ত বাড়ি তো! ধসে পড়ার আর ভয় নেই।

অন্ধকারে বলে উঠল মুসা, 'বাপরে বাপ! কাণ্ডটা কি হল। এভাবে ভূমিকম্পের মধ্যে আর পড়িনি কখনও।'

'নাগরদোলায় চড়লাম!' রসিকতার চেষ্টা করল রবিন, জমল না, কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল তার গলা দিয়ে।

পিকোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। ভূমিকম্প শুরুর আগে পাশের ঘরটায় ছিল সে। এখনও কি আছে?

কাঁপা পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ঘরটা এখন আর আগের মত অন্ধকার নয়। দেয়াল ধসেছে। রাস্তার গাড়ির আলো এসে পড়েছে ভেতরে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। ভারি, কেমন যেন শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ। পিকোকে দেখা গেল না।

অসংখ্য আলো আছে রাস্তায়। গাড়ির। তবে সব অচল হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে গেছে সব। লোকের চিৎকার, গাড়ির তীক্ষ্ণ হর্ন, আগের নীরবতার কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এখন। নড়ছে না একটা গাড়িও, কিংবা হয়ত নড়তে পারছে না।

রাস্তার পাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে গেল কিশোর। কয়েক মিনিট আগেও যেটা আস্ত ছিল, সেটার অনেকখানিই ধসে পড়েছে এখন। বাড়ি বলেই চেনা যায় না আর। তিন দিকের দেয়াল নেই। বাকি একটা দেয়ালের ওপর কাত হয়ে ঠেস দিয়ে রয়েছে কোনমতে ছাতটা।

'ওটাই সেই বাড়ি! যেটাতে লিসটারকে বন্দি করে রেখেছিল পিকো!

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'ভ-ভর্তা হয়ে গেছে...'

থেমে গেল একটা গাড়ির আলো দেখে। উঁচুনিচু জমিতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে ওটা। অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে দিয়েছে যেন ওটার হেডলাইট। বিদ্ধ করেছে পিকোকে।

ধসে যাওয়া বাড়ির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সে। এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে তাকাল। অন্ধ করে দিয়েছে যেন তাকে হেডলাইট। পেছনে যে আরেকটা গাড়ি আসছে দেখতেই পেল না। ছাতের ওপর জ্বলছে লাল-নীল আলো। পুলিশের গাড়ি।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। এসে গেছে পুলিশ।

ফিরে তাকাল পিকো। ছেলেরা যে বাড়িটায় রয়েছে সেদিকে। হাতে এখনও রয়েছে বেজবল ব্যাটটা। বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সতর্ক রয়েছে। পিকো ব্যাট উঁচিয়ে তেড়ে এলেই সরে যাবে তিন দিকে। কিন্তু এল না লোকটা। বরং

ব্যাটটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে হারিয়ে গেল ধসে পড়া বাড়ির দেয়ালের আড়ালে।

জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল পুলিশের গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নামল দু'জন অফিসার। ধসে পড়া বাড়িটার দিকে দৌড় দিল। আরনিও নামল। লিসটারের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটল, বলল, আর কোন ভয় নেই।

জবাবে ভেসে এল আরেকটা কণ্ঠ, রেডিওর স্পীকারের মত কড়কড় করে উঠল যেন, 'জলদি এস! গাধা কোথাকার! আস্ত একটা বাড়ি ধসে পড়েছে আমার ওপর, আর বলছে কোন ভয় নেই! রামছাগল!'

ডেভিড লিসটার। বেঁচে আছেন এখনও। ধসে পড়া বাড়ির নিচে চাপা পড়েছেন। এত বড় বিপদে থেকেও মেজাজের সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি তাঁর।

পিকোর পিছু নিয়েছে পুলিশ। রাস্তায় পৌঁছার আগেই ধরে ফেলল তাকে। হাতকড়া পরিয়ে দিল। নিয়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে।

'ও-ই কিডন্যাপার,' অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল রবিন।

পুলিশের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পিকো। লাফ দিয়ে এসে লাথি মারার চেষ্টা করল রবিনকে। ঝট করে সরে গেল রবিন।

আবার তাকে চেপে ধরল পুলিশ। শক্ত করে, যাতে আর ছুটতে না পারে। টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে এনে তুলল।

দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আরনি। চিৎকার করে বলল, 'ভয় নেই, মিস্টার লিসটার, আমরা আপনাকে বের করে আনব।'

'তাহলে করছ না কেন? সারারাত লাগাবে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন লিসটার।

এই সময় মনে পড়ল আরনির, সে কে, কেন এখানে এসেছে। বাবার কথা ভাবল। যাকে ধ্বংস করে দিয়েছে দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকা ওই বুড়োটা।

'মিস্টার লিসটার, চুপ করে থাকুন!' বলল সে। ফিরে গেল তার গাড়িতে। ভেতরে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। আর কোন সাহায্য করতে রাজি নয়। বেরোলই না আর। মাঠের ওপর দিয়ে যখন নাচতে নাচতে ছুটে এল এলেনার গাড়িটা, তখনও না।

'আসার সময় ফোন করে এসেছে নিশ্চয় এলেনাকে,' অনুমান করল মুসা। 'আসতে এত দেরি হয়েছে সে জন্যেই। সব দিক গোছগাছ করেই এসেছে।'

এলেনার সঙ্গে এসেছেন ওর মা। বাবা কোথায় আছে জানতে পেরে যেন পাগল হয়ে গেল মেয়েটা। দেয়ালের জানালা দিয়েই গিয়ে ঢুকতে চাইল। তাকে ধরে রাখলেন মা, যেতে দিলেন না।

'আপনারা কিচ্ছু ভাববেন না,' একজন অফিসার বলল। 'যা করার আমরা করছি।'

'যা করার একটু জলদি করলে ভাল হয় না?' চেঁচিয়ে বললেন লিসটার। 'ধুলোয় দম আটকে যাচ্ছে তো! লাশ হয়ে গেলে আর বের করে লাভ কি?'

মড়মড় করে উঠল কাত হয়ে থাকা ছাত। গোঙাল। বাকি দেয়ালটাকেও

ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে।

জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল দুই অফিসার। বাইরে যারা রইল, তারা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আপাতত পড়বে না আর দেয়ালটা, যতই হুমকি দিক। ছাতটাও এমনভাবে আটকে গেছে পড়ার ভয় নেই। যদি আবার কাঁপুনি শুরু না হয়। বড় ভূমিকম্পের পরে মাঝে মাঝেই আবার শুরু হয় কাঁপুনি, বিরতি দিয়ে দিয়ে। সে রকম একটা কম্পন এলেই সর্বনাশ। এখন সামান্য একটা কাঁপুনিই ছাতটাকে ধসিয়ে দিতে যথেষ্ট।

তবে আর কোন কম্পন শুরু হল না। খানিক পরে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একজন অফিসার। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল। 'মেঝের সঙ্গে শেকলে বাঁধা। একথাটা জানানো হয়নি আমাদের।' অনেকটা অভিযোগের সুরেই বলে গাড়িতে ফিরে গেল সে। সাহায্যের জন্যে ফোন করতে।

দমকলের গাড়ি এল ফোন পেয়ে। আধ ঘণ্টা পর। তবে এসে আর দেরি করল না একটা মুহূর্ত। আটকা পড়া মানুষকে উদ্ধার করার ট্রেনিং আছে ওদের। দু'জন ঢুকে গেল জানালা দিয়ে। ভেতরের অবস্থাটা দেখে এল। একটা লোহাকাটার করাত চাইল সহকর্মীদের কাছে। করাত দিয়ে কাজ সারার পর চাইল একটা শাবল। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তাদের কাজ করার বিচিত্র শব্দ হতে লাগল। একটা স্ট্রেচার ঢোকান হল জানালা দিয়ে। এর খানিকক্ষণ পরে ওই পথেই বের করে আনা হল লিসটারকে।

ততক্ষণে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে।

'খবরদার, মাথামোটার দল!' অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় চিৎকার করে বললেন লিসটার, 'ছেড়ে দিও না!'

বাবার পাশে পাশে এসেছে এলেনা। 'ওফ, আব্বা, একটি বারের জন্যেও কি চুপ থাকতে পার না!' বাবার সঙ্গে সে-ও অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। হাসপাতালে যাবে।

ঠিক ওই সময় আবার কেঁপে উঠল মাটি। মা-ভূমিকম্প ঘুরে যাওয়ার পরে হাজির হয়ে গেছে ছানা-ভূমিকম্প। ছোট ছোট কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল। যেন হ্যাঁচকা টানে কাত করে ফেলল অবশিষ্ট দেয়ালটাকে, পুরোপুরি ধসিয়ে দিল ছাত, একটু আগেও যেটার নিচে আটকা পরে ছিলেন ডেভিড লিসটার। ধুলো উড়তে লাগল চারদিকে।

সতেরো

তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে আসবেন ডক্টর ক্রুগার মনটাগো। লিসটারকে উদ্ধার করে আনার পর পুরো একটা হপ্তা পেরিয়ে গেছে। তিনি এলে তাঁকে নিয়েই মিস্টার ভিকটর সাইমনের ওখানে যাবে ওরা। চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার নেই হলিউডে। জরুরী একটা কাজে ইউরোপ চলে গেছেন। তবে যাবার আগে দেখা হয়েছে গোয়েন্দাদের সঙ্গে। কেসের রিপোর্ট পড়েছেন। গল্পটা ভারি পছন্দ হয়েছে তাঁর। ছবি বানাবেন।

চিত্রনাট্য লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন মিস্টার সাইমনকে।

তাঁকে পুরো গল্পটা শোনাতেই তিন গোয়েন্দার যাওয়ার কথা আজ। রওনা হবে হবে করছে, এই সময় ফোন এসেছে রুকস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ডক্টর মনটাগোর। দেখা করতে আসতে চাইলেন তিনি। বিশপের বইটাতে কি লেখা আছে বলার জন্যে।

গাড়ি নিয়ে এলেন তিনি। কোথায় কি জন্যে যেতে হবে তিন গোয়েন্দাকে, খুলে বলল তাকে কিশোর।

'আপনিও যেতে পারেন,' মুসা বলল। 'অসুবিধে নেই। মিস্টার সাইমন খুব ভাল মানুষ। তাঁকে আপনারও ভাল লাগবে। অনেক বড় গোয়েন্দা। তেমনি বড় লেখক। কোনটাতে যে বেশি সুনাম কামিয়েছেন, বলা মুশকিল। বিরাট এক বাড়ির মালিক। এককালে ওটা সরাইখানা ছিল।'

'তাই নাকি?' মনটাগো বললেন। 'শুনে তো যাওয়ার জন্যে লোভই হচ্ছে।'

লোভটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই রবিন বলল, 'শুধু কি বাড়ি। ভিয়েতনামী একজন কাজের লোকও আছে। নাম নিসান জাং কিম। সে-ও খুব ভাল। তবে একটা দোষ আছে, অদ্ভুত সব খাবার রান্না করার ঝোঁক। আর সুযোগ পেলেই মানুষকে খাইয়ে সেসব রান্না কেমন হয়েছে পরীক্ষা করার প্রবণতা। কিছু কিছু রান্না তো দারুণ! আর কিছু কিছু···মুখেই দেয়া যায় না!'

আর লোভ সামলাতে পারলেন না ডক্টর মনটাগো। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। বিশপের বই নিয়ে আলোচনা ওখানেও করা যাবে।

ডক্টরের গাড়িতেই চলল তিন গোয়েন্দা। সামনে বসল কিশোর, ড্রাইভারের পাশের সীটে। রবিন আর মুসা বসল পিছনে। পথ দেখিয়ে দিতে লাগল কিশোর। কোস্ট হাইওয়ে থেকে মোড় নিয়ে সরু একটা পাহাড়ী পথে উঠল গাড়ি। কিছু দূর এগোনোর পর বিরাট একটা শাদা রঙ করা বাড়ি চোখে পড়ল।

'এই কিশোর, দেখ,' পেছন থেকে বলল মুসা। বাড়ির দরজা খোলা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট একটা মেয়ে। একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে কপাল আর চুল বাঁধা। তাতে পাখির লাল পালক গোঁজা।

'ইনডিয়ান মেয়ে!' মনটাগো বললেন। 'ওর কথা তো কিছু বলনি।'

'নতুন এসেছে মনে হয়,' জবাব দিল কিশোর। 'ইনডিয়ানদের মত লাগছে, তবে ইনডিয়ান নয়।'

ভাল করে দেখে ডক্টরও একমত হলেন কিশোরের সঙ্গে। মেয়েটা এশিয়ান। লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে হাত নাড়ল। নিসান জাং কিম বেরিয়ে এল বারান্দায়। মেয়েটার হাত ধরল।

'চুমাশ রাজকুমারীর পোশাক পরেছে। সুন্দর না?' মেয়েটার কথা বলল কিম, 'ক্যালিফোর্নিয়ার আদিম মানুষের আচার আচরণ শিখছে।'

মনটাগোকে নিয়ে বারান্দার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। আরও কয়েকটা বাচ্চা বেরিয়ে এল। সবাই এশিয়ান। পরনে ইনডিয়ান পোশাক।

'পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে এরা,' বুঝিয়ে বলল কিম।

'আমেরিকানদের রীতিনীতি শেখাচ্ছে আমাদের দেশের বাচ্চাদের। যাতে সহজেই যে কোন আমেরিকান ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে। সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পড়তে গেলে আর সে দেশের কিছুই জানা না থাকলে অসুবিধে হয়ে যায়।'

'প্রজেক্টটা তাহলে নতুন শুরু করলেন,' হেসে বলল রবিন।

'হ্যাঁ, করলাম।'

'ইনডিয়ানদের দিয়েই শুরু? আরও তো লোক রয়েছে আমেরিকায়।'

'তা আছে। তবে আসল অধিবাসী তো ইনডিয়ানরাই। এখানে তাদের রীতিনীতিই হল খাঁটি। বাকি সব ভেজাল। নানা দেশের লোক এসে ভিড় জমিয়েছে আমেরিকায়, সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে জন্যে ইনডিয়ানদেরই বেছে নিয়েছি। আজকে ওদেরকে রান্না শেখাচ্ছি। চুমাশ ইনডিয়ানদের রান্না। পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে শিখে এসেছি। অ্যাক্রন কেক। ক্রীমড ড্যানডেলিয়ন। আর হজমের সুবিধের জন্যে রোজহিপ চায়েরও ব্যবস্থা করব।'

'মারছে!' বিড়বিড় করল মুসা, অবশ্যই নিচু স্বরে, যাতে কিম শুনে না ফেলে।

বেরিয়ে এলেন ভিকটর সাইমন। বাচ্চাদেরকে ভেতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল কিম। ডক্টর মনটাগোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। আসার উদ্দেশ্যও জানাল। বিশপের বই নিয়ে আলোচনা করতে চান ডক্টর। হাত মেলালেন সাইমন। খুব খুশি হলেন। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে ওয়েলকাম জানালেন ওদেরকেও।

প্রথমেই প্রশ্ন করল মুসা, 'আচ্ছা, স্যার, এই ক্রীমড ড্যানডেলিয়নের ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

মুচকি হাসলেন সাহিত্যিক গোয়েন্দা। 'ভয় নেই। কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি আমি। আমরা চুমাশ নই, ভিয়েতনামী শিশুও নই যে আমেরিকানদের রীতি শিখতে হবে। কাজেই পাহাড় থেকে শিখে আসা কোন ইনডিয়ান খাবার চলবে না। সকালে আমি নিজে বাজারে গিয়ে পছন্দ মত খাবার কিনে এনেছি। আলাপ আলোচনা শেষ হোক, তারপর খেতে বসব।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন তিন গোয়েন্দা। যাক, অন্তত এই একটা দিন সাইমনের বাড়িতে এসে তাঁর ভিয়েতনামী বাবুর্চি কিমের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। অ্যাক্রন কিংবা ড্যানডেলিয়ন চেখে দেখার কোন ইচ্ছেই ওদের নেই।

পথ দেখিয়ে মেহমানদেরকে মস্ত ঘরটায় নিয়ে এলেন সাইমন, যেটা থেকে সাগরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সরাইখানা চালু থাকার সময় এ ঘরটা ছিল প্রধান ডাইনিং রুম। এখন হয়েছে একাধারে লিভিং রুম, লাইব্রেরি আর অফিস। কফি টেবিল ঘিরে বসল সবাই। কেসের রিপোর্ট ফাইলটা ঠেলে দিল রবিন। 'এতে সব নেই,' বলল সে। 'সেগুলো ডক্টর মনটাগো মুখেই বলবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। 'আগে ফাইলটা পড়া শেষ করুন। আমার কাহিনী অনেক পুরনো একটা রহস্য নিয়ে। চারশো বছর আগের। তাড়াহুড়া নেই। সব

বলা যাবে।'

পড়তে আরম্ভ করলেন সাইমন। রান্নাঘরে শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের কলরব। কিন্তু পড়তে পড়তে এতই মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি, সে সব শব্দ কানেই ঢুকল না। শেষ পৃষ্ঠাটাও শেষ করে মুখ তুললেন। হাসলেন। 'ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি খেয়েও তাহলে লিসটারের মেজাজ ঠিক হয়নি! হাহ্ হাহ্।'

কিশোরও হাসল। 'চিতাবাঘ কি আর চামড়ার ফোঁটা মুছে ফেলতে পারে। সিয়েটাও কিন্তু কম বদমেজাজী নয়। দু'জনে মিলেছিল ভাল।'

'দুটো দক্ষিণ আমেরিকান দেশে সিয়েটাকে খুঁজছে পুলিশ,' রবিন জানাল। 'বড় রকমের অপরাধী। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছে জেলখানায়। বিশপের ডায়রি চুরির ব্যাপারে তার হাত কতটা ছিল, ডক্টর মনটাগো সেটা ভাল বলতে পারবেন। এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। আগেও অনেক অপরাধ করেছে সিয়েটা। তবে বিশপের বই হাতাতে গিয়েই প্রথমবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। জেলে গেল। তার পরে কুকাজ করতে গিয়ে আরও কয়েকবার জেলে গেছে।'

অ্যাটাচি কেস খুলে চামড়ায় বাঁধানো পুরনো বইটা বের করলেন মনটাগো। আইলিন লিসটারে ওটা খুঁজে পেয়েছিল কিশোর। 'আমি এখন শিওর,' ডক্টর বলতে লাগলেন, 'এটাই বিশপ এনরিক জিমিনিজের হারানো ডায়রি। অনেক বছর আগে বোগোটাতে বাস করতেন তিনি। সোনার খনিতে ইনডিয়ান শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করার কারণে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল রক্তাক্ত বিশপ। স্প্যানিশ বিজেতাদের দখল করা পান্নার খনিও দেখাশোনা করেছেন তিনি। স্প্যানিশ কলোনির একজন উঁচুদরের লোক ছিলেন। গভীর আঁতাত ছিল সরকারের সঙ্গে।

'লোকে বলে তিনিও অত্যাচারী ছিলেন। অথচ বিশপ তাঁর ডায়রিতে লিখে গেছেন, খনির শ্রমিকদের ওপর স্প্যানিশদের অত্যাচারে তিনি মর্মাহত। সেসব অত্যাচার ঠেকানোর জন্যেই নাকি খনি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন তিনি। একটা পান্নার খনিতেও গিয়েছিলেন। এক চিলতে জমিতে পাওয়া গিয়েছিল খনিটা। বেশি গভীরে খুঁড়তে পারেনি ইনডিয়ানরা, কেবল ওপরটা কিছুদূর খুঁড়েছিল। আরও ভেতরে কেন নামতে পারছে না ওরা সেজন্যে সাংঘাতিক অত্যাচার চলছিল ওদের ওপর। দেখেশুনে আর স্থির থাকতে পারেননি বিশপ। ছুটে এসেছিলেন বোগোটায়। স্প্যানিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে। যাতে ইণ্ডিয়ানদেরকে খনির কাজ থেকে রেহাই দেয়া হয়। সরকার কিছু করার আগেই পর্বতে ভূমিধস ঘটল। যে খনিটা দেখে এসেছিলেন বিশপ, সেটা চাপা পড়ে গেল অনেক মাটির তলায়।''

এ পর্যন্ত বলে থামলেন মনটাগো। দম নিলেন। তারপর ডায়রি খুলে পড়ে অনুবাদ করে বলতে লাগলেন, 'কয়েক মাস ধরে খুঁড়ল অনেক লোক মিলে। মাটি সরানোর চেষ্টা করল। কাজটা মারাত্মক বিপজ্জনক। আরও ভূমিধস নামতে পারে। আলগা মাটি খসে পড়ে মানুষকে চাপা দিতে পারে। কিন্তু এত বিপদের মধ্যেও

লোকগুলোকে কাজ করতে বাধ্য করল সৈন্যরা। বিদ্রোহী হয়ে উঠল ইনডিয়ানরা। আর খুঁড়তে অস্বীকার করল। এই সময় আদেশ এল সরকারের কাছ থেকে, খনিটা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওটাতে আর কাজ করানোর দরকার নেই। বাঁচল ইনডিয়ানরা। তবে ঈশ্বরের অশ্রু খুঁজতে গিয়ে অনেক অশ্রু ঝরে গেছে ততদিনে।'

'হুঁমম!' মাথা দোলালেন সাইমন। 'এতদিন তাহলে ভুল কথা জেনে এসেছি। বিশপ অন্যায় করেননি। অত্যাচারী ছিলেন না।'

'অযথা বদনামের ভাগী হয়েছেন,' মুসা বলল। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস...'

'বইয়ের মাঝখানে নাকি কিছু পৃষ্ঠা নেই।' সাইমন জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলোতে কি লেখা ছিল? কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

'ওগুলোই ছিল আসল,' মনটাগো জানালেন। 'খনিটার অবস্থান। বোগোটা থেকে রওনা দিয়ে খনিতে পৌঁছতে যে কদিন লেগেছিল সে কদিনের কথা নিশ্চয় লেখা ছিল ওই পৃষ্ঠাগুলোতে। ওই লেখার নির্দেশ পড়ে গিয়ে পৌঁছানো যাবে সোগামোসোর সেই পান্নার খনিতে। যে জায়গায় বৃদ্ধা মহিলা তার ছায়া ফেলবে সেখানেই পাওয়া যাবে খনিটা। বৃদ্ধা মহিলা, অর্থাৎ ওল্ড উয়োমেন হল অ্যানডিজ পর্বতমালার একটা চূড়ার নাম। স্থানীয় ইনডিয়ানরা ওই নাম রেখেছে।

'বহু বছর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বিশপের ডায়রি। মালিক জানতই না এটাতে কি লেখা রয়েছে। তার হাত থেকে চলে গেল এক বই ব্যবসায়ীর হাতে, দুর্লভ বই কিনে বিক্রি করত ওই ব্যবসায়ী। তার মনে হয়েছিল মূল্যবান আবিষ্কার করা যাবে ও বইয়ের লেখার মানে বের করতে পারলে। কিন্তু বের করার আগেই চুরি হয়ে গেল বইটা। পুলিশ সন্দেহ করল ব্যবসায়ীর অ্যাসিসটেন্টকে। লোকটার বাসায় গিয়ে হানা দিল একদিন। বেশ কিছু দুর্লভ দলিল বের করল ওখান থেকে। সব চোরাই মাল। দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে যেটার জন্যে যাওয়া সেই ডায়রিটাই পেল না।'

'তাই?' ডিটেকটিভ বললেন। 'ওই অ্যাসিসটেন্ট নিশ্চয় আমাদের সিয়েটা।'

'হ্যাঁ,' জবাবটা দিল মুসা। 'শুরুতে সব অস্বীকার করে সিয়েটা। বলে সে কিছু জানেই না। শেষে চাপে পড়ে বলে একজন আমেরিকান দোকানে ঢুকে ডায়রিটা নিয়ে চলে গেছে। জ্যাকেটের নিচে লুকিয়ে। একথাও বিশ্বাস করেনি পুলিশ। জেলে পাঠিয়ে দিল তাকে।'

'আসলে কি ঘটেছিল আন্দাজ করতে পারি আমরা,' রবিন বলল। কিমের রান্নাঘরে হঠাৎ যেন এক ঝলক হাসির ঝড় উঠল। সেটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তাকে। 'এখনও কেউ মুখ খুলছে না, সিয়েটাও না, লিসটারও না। এলেনার কাছে তার বাবার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে একটা ধারণা করতে পারি আমরা। এক সময় নাবিক ছিলেন লিসটার, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বন্দরে জাহাজ থামলে বসে থাকতেন না। যতটা পারতেন ঘুরে বেড়াতেন দেশের ভেতরে। প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। সব সময় সুযোগ খুঁজতেন। বোগোটায় কোন ভাবে পরিচয় হয়েছিল সিয়েটার সঙ্গে। ডায়রিটা পড়েই হোক কিংবা যে

ভাবেই হোক-সোগামোসোর পান্নার খনির কথা জেনে ফেলেছিল সিয়েটা। সেটা বলেছিল লিসটারকে। তারপর দু'জনে মিলে চুরি করে ডায়রিটা। সিয়েটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন লিসটার। ফলে সিয়েটা গেল জেলে আর তিনি দেশে ফিরে এলেন বিপুল টাকার মালিক হয়ে।'

'তার মানে পান্নার খনিটা তিনি পেয়েছিলেন,' সাইমন বললেন।

'তাই তো মনে হয়,' কিশোর বলল। 'বিশপের ডায়রিতে যে পথের কথা লেখা আছে সে ভাবে চলে আমরাও পৌঁছতে পারব খনির কাছে। পড়া খুব কঠিন। স্প্যানিশ না জানলে হবে না।'

মাথা ঝাঁকালেন মনটাগো। 'কিছু কিছু জানা থাকলে অবশ্য পারতেও পার। ডিকশনারি আর রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নিয়ে। আমার বিশ্বাস লিসটারও তাই করেছিলেন। গত চারশো বছরে স্প্যানিশ ভাষার ততটা পরিবর্তন হয়নি।'

'আইলিন লিসটারে গেল কি করে ডায়রিটা?' জানতে চাইলেন সাইমন।

'মনে হয়,' রবিন বলল। 'পান্নার দরকার হলেই জাহাজ নিয়ে কলাম্বিয়ায় চলে যেতেন লিসটার। ওই ডায়রিটাই হল খনিতে যাওয়ার পথ নির্দেশক। তাই ওটা সঙ্গে রাখতেন। যদি ভুল হয়ে যায় দেখে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে। শেষবার যাওয়ার পর আর অনেকদিন যাবেন না বুঝতে পেরেই হয়ত আসল পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলেন। লুকিয়ে রেখেছিলেন বাড়িতে। ডায়রিটা ফেলে রেখেছিলেন সাধারণ বইয়ের সঙ্গে। কারণ ওটার আর তখন দাম নেই। তবু কোন জিনিস ফেলে দেয়ার স্বভাব নয় তো, রেখে দিয়েছিলেন।'

'হুঁ। তাহলে বড় লোক হওয়ার পুঁজিটা তিনি পান্নার খনি থেকেই জোগাড় করেছেন।' জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকালেন সাইমন। আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তারপর তাঁর অপরাধের সঙ্গী এসে সেদিন মেয়ের পার্টিতে হাজির হল। দেখে ভীষণ চমকে যাওয়ারই কথা।'

'হয়েছেন মানে। একেবারে অ্যানজিনার অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল। অনেক বছর পরে দেখা। তবু তাঁকে চিনতে ভুল করেনি সিয়েটা।'

মুসা বলল, 'আমি যখন লিসটারের কাছে বসে ছিলাম, ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলেন তিনি। আসলে তাঁর মনে তখন দুশ্চিন্তার ঝড়। বুঝে ফেলেছিলেন সিয়েটা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবেই। ডায়রিটা চাইবে। কিন্তু তখনও ওটা দেয়ার ইচ্ছে ছিল না লিসটারের। অন্তত আসল পাতাগুলো। তাই পয়লা সুযোগটা পেয়েই আমাকে বাথরুমে আটকে পাতাগুলো বের করে ফায়ারপ্লেসে ফেলে পুড়িয়েছেন। তারপর কমপিউটার রুমে গিয়ে একটা মেসেজ লিখলেন এলেনার জন্যে। খনিটার কথা মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি, যদি তাঁর কিছু ঘটে যায় তাহলে এলেনা যাতে গিয়ে খুঁজে বের করতে পারে ওই সম্পদ।'

'শ্রদ্ধা চলে যাচ্ছে আমার লোকটার ওপর থেকে,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন সাইমন।। 'লিসটার ভীষণ লোভী। যা আনার তো এনেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, আর কেন? ডায়রিটা সিয়েটাকে দিয়ে দিলেই হত।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আমি বাথরুমে আটকা পড়ে আছি।

নিশ্চয় ওই সময়টাতেই পা টিপে টিপে দোতলায় উঠে এসেছিল সিয়েটা। আমাকে বাথরুম-থেকে বের করতে এসেছিলেন তখন লিসটার, সিয়েটার জন্যে পারেননি। একটা বালিশ এনে তাঁর মুখ চেপে ধরেছিল সিয়েটা, যাতে চেঁচাতে না পারেন। ভয় দেখানোর জন্যেও হতে পারে। টানাটানিতে গেল ওটা ছিঁড়ে। তখন দ্বিতীয় বালিশটা নিয়ে এল সিয়েটা। বেহুঁশ করে ফেলল লিসটারকে। বোধহয় খুন করে ফেলেছে বলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সিয়েটা। সে চেয়েছিল ভয় দেখিয়ে ডায়রিটার কথা বের করে নেবে। খুনের ইচ্ছে ছিল না। ঘাবড়ে গিয়ে লাশ সরিয়ে ফেলার জন্যেই লিসটারকে সরিয়ে নিয়ে যায়, এমন ভাবে, যাতে সবাই ভাবে নিজে নিজেই চলে গেছেন লিসটার।'

'বাড়ি থেকে বের করল কিভাবে?' জানতে চাইলেন সাইমন।

'ঠেলাগাড়িতে করে। ময়লা টেবিলক্লথ দিয়ে ঢেকে।'

'শেষ পর্যন্ত ময়লার গাড়ি ? হাহ্।'

আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'পার্টি শেষে ডেকোরেটরের জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল সিয়েটার ওপর। ভেবেছিল তখনই সুযোগ করে লিসটারের লাশটা নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলবে কোথাও। কিন্তু লাশ বের করতে গিয়ে দেখে মরেননি লিসটার, বেহুঁশ হয়ে আছেন। অ্যানজিনার অ্যাটাক, এমনিতেই দুর্বল শরীর, তার ওপর ওই ধকলে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন।'

'এতে মস্ত সুযোগ পেয়ে গেল সিয়েটা,' কিশোরের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলল রবিন। 'লিসটারকে বন্দি করল নিয়ে গিয়ে ওই নির্জন বাড়িটায়। যত চেঁচামেচিই করুন, ওখানে কারও কানে যাবে না। আর পোড়ো বাড়িতেও মানুষ থাকতে পারে, এতে সন্দেহের কিছু নেই। ভবঘুরেরা যেখানে সেখানে রাত কাটায়। কাজেই বাড়িটা থেকে সিয়েটাকে বেরোতে যদি কেউ দেখেও থাকে, কেয়ারই করেনি। খুঁজেপেতে ভাল বাড়িই বের করেছিল সিয়েটা। যে ঘরে লিসটারকে আটক করেছিল সে, সেটা নিশ্চয় মেশিনরুম ছিল। কোন বড় ধরনের মেশিন ছিল ওখানে, যার জন্যে ওই আঙটার প্রয়োজন হত। সিয়েটা সেই আঙটায় শেকল লাগিয়ে বাঁধল লিসটারকে।

তাঁকে মারতে চায়নি সিয়েটা। তাই নিয়মিত খাবার আর পানি নিয়ে যেত। ডায়রিটার কথা জিজ্ঞেস করাও উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু লিসটার এমনই ধড়িবাজ, সিয়েটাকে দেখলেই বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার ভান করতেন। নড়া নেই চড়া নেই কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া নেই। ভান যে করছেন সেটা সিয়েটাও বুঝতে পারত। কিন্তু বেশি চাপাচাপি করার সাহস পেত না সে, পাছে মরে যান। খুনের দায় তো চাপবেই ঘাড়ে, খনির ঠিকানাটাও চিরতরে মুছে যাবে।'

'এখন কেমন আছেন লিসটার?' জিজ্ঞেস করলেন সাইমন।

'সুস্থ হচ্ছেন,' মুসা জানাল। 'একটা অলৌকিক ব্যাপারই বলা যায়। ছাতটা ধসে পড়ল, অথচ একটা আঁচড়ও লাগেনি তাঁর গায়ে।'

'হুঁ। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়,' হাসলেন ডিটেকটিভ। 'তবে

ভূমিকম্পটা তত বড় ছিল না, তাহলে আর বাঁচতে হত না তোমাদের কারোই। গত হপ্তায় নিউ ইয়র্কে ছিলাম আমি। এখানে যে ভূমিকম্প হয়েছে সেটাকে গুরুত্বই দেয়নি কোন কাগজ।'

'ওরা যা-ই বলুক,' রবিন বলল। 'আমাদের বারোটা বাজতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। ভাগ্যিস আমাদের বাড়িটা ধসেনি।'

'সেজন্যেই তো বলছি, বড় ছিল না। তাহলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত। কেউ বাঁচতে না তোমরা...'

নাক কুঁচকালো মুসা। অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল 'চুমাশ ইনডিয়ানদের' কোলাহল। ভাগ্যিস ইনডিয়ান হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি সে। ওরকম বিদঘুটে গন্ধ-ওয়ালা খাবার খেয়ে বাঁচার কোন ইচ্ছেই তার নেই। 'কদিন ধরেই হাসপাতালে আছেন লিসটার,' বলল সে। 'বেড়ালের জান। মরবেন না। ভাল হয়ে উঠছেন দ্রুত। তবে হওয়ার পর আরেকটা ধাক্কা খাবেন, এলেনা বলেছে আমাদেরকে। বাবা সুস্থ হয়ে উঠলে চিরদিনের জন্যে মায়ের কাছে চলে যাবে সে, আর থাকতে আসবে না বাবার কাছে। সে বুঝে গেছে, কোন দিনই তার বাবার মেজাজ ঠিক হবে না। ওরকম একটা খেপা লোকের কাছে থাকলে যে কোন সুস্থ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এলেনার কথাঃ টাকাই জীবনে সব নয়। টাকার নেশা মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে।'

'আর পান্নার খনির ব্যাপারে যা ভেবেছিলাম,' রবিন বলল কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই। 'আসলে তা নয়, গোপন নেই আর ওটা। বহু বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। লিসটারই করেছেন। ওটা কোন রহস্য নয়। অযথাই এর পেছনে সময় নষ্ট করলাম।'

'আরও একটা খবর,' মিটিমিটি হাসছেন মনটাগো। 'লিসটারও জানেন না। অনেক দিন আগে শেষ গিয়েছিলেন তো খনিটাতে, তাই। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি কয়েক বছর আগে আরেকটা লোক ওটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। কলাম্বিয়ার সরকার দখল করে নিয়েছে এখন ওটা। লিসটার যদি সন্ধান বলতেনও আর সিয়েটা যদি যেতও, কিছুই পেত না। খনির কাছে ঘেঁষতেই দেয়া হত না তাকে।'

'আহ্‌হা, এটা তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুসা। 'অযথাই কষ্ট করল বেচারা। খামোকা আবার জেলে গেল।'

'অপরাধীদের ওরকম সাজাই হয়,' সাইমন বললেন।

'লিসটারেরও একটা শাস্তি হওয়া উচিত।'

'আর কি হবে? হয়েছেই তো। স্ত্রী তালাক দিয়ে চলে গেছে। মেয়ে থাকে না। নিজে আধ পাগল। কোটি কোটি টাকা থাকলেই কি না থাকলেই কি। এটা একটা জীবন হল। কেউ তাঁকে দেখতে পারে না। সম্মান করে না।'

'আমরাও করি না,' ফস করে বলে ফেলল মুসা। বলেই বুঝল কথাটা বলা ঠিক হয়নি। গাল চুলকাতে শুরু করল সে।

মুসার অস্বস্তি বুঝতে পারলেন সাইমন। 'আসলে সম্মান জিনিসটা জোর করে

কাউকে করা যায় না। ভেতর থেকে আসে। তোমাদের আসে না, তো কি করবে।'

'হাসপাতালে গিয়ে কিশোর যা সব কথা বলে এসেছে না,' রবিন বলল। 'ইজ্জত রাখেনি।'

'কি বলেছে?'

'কিশোর আর আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন লিসটার, আমরা তাঁকে উদ্ধার করেছি বলে। মুখের ওপর বলে দিল কিশোর, তিনি ওরকম জানলে কখনোই কাজটা করত না। বলেছে, আমরা টাকা নিই না কাজের জন্যে। লোকের উপকার করাই আমাদের ব্রত। কিন্তু যারা অন্যায় করে তাদেরকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই।'

'লিসটার কি বললেন?'

'চুপ হয়ে গেলেন।'

'হুঁ! বলবেন আর কি? বলার তো কিছু নেই।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে জানতে চাইলেন ডিটেকটিভ, 'আরনি ভিনসেনজোর খবর কি?'

'একটা ব্যাঙ্কে নতুন চাকরি নিয়েছে,' রবিন জানাল। 'ডি এল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেই বহাল রয়েছে এনথনি, ভাবছে তার শয়তানীর কথাটা ভুলে যাবেন লিসটার। এলেনার মায়ের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুদিন থেকেই, সেটা লিসটারকে জানাতে চায়নি বলেই কিশোরকে দেখে লুকিয়ে পড়েছিল। ভদ্রমহিলাও সে কারণেই ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। কিশোরকে বের করে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। 'মহিলা অবশ্য বলেছেন, তাঁর সঙ্গে...'

'থাক,' হাত তুললেন সাইমন। 'ওসব কথা শুনতে চাই না। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইবার আসল কথাটা বল তো। ফাইলে লেখনি। চিলেকোঠার সেই ভূতের ব্যাপারটা। কি ব্যাখ্যা দেবে?' কিশোরকে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

'আমি বুঝতে পারছি না, স্যার,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এটা সত্যিই একটা বড় রহস্য। বের করব একদিন। মিসেস বেকার একটা গল্প বলেছে। মুসা বিশ্বাস করে, আমি করি না। মহিলা বলে, সেই ছোট্ট মেয়েটা, যে তার ধনী ফুফুর কাছে বড় হয়েছিল, তাকে একবার সাংঘাতিক মেরেছিল ফুফু। সোনার একটা পিন হারিয়েছিল বলে।

'তারপর অনেক ভুগতে হয়েছে মেয়েটাকে। তার পরিবারের সবাই ভাবতে আরম্ভ করে, সে চোরই। আমরা চলে আসার পর চিলেকোঠায় গিয়েছিল মিসেস বেকার, খোঁজাখুঁজি করতে। যে কোন ব্যাপারে, বিশেষ করে ভূতের, তার খুব কৌতূহল। পুরনো একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে লেপের মধ্যে আটকে থাকা এই জিনিসটা বের করে এনেছে,' পকেট থেকে একটা সোনার ব্রোচ বের করে টেবিলে রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'মিসেস বেকারের ধারণা, এই জিনিসটা চুরির অপবাদ দিয়েই মারধর করা হয়েছিল মেয়েটাকে। কিন্তু আসলে সে চুরি করেনি। ট্রাঙ্কে লেপ ভরার সময় নিশ্চয় টান লেগে বা অন্য কোনভাবে জিনিসটা লেপের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে আর খোঁজেওনি ফুফু, পায়ওনি। মহিলা ওই বাড়িতে থাকতেই মারা গেছে। তার অনেক পুরনো জিনিস এখনও রয়ে গেছে বাড়ির চিলেকোঠায়

আর স্টোররুমে। ওই ট্রাঙ্কটাও তারই। বাড়িটা কেনার পর এখন মিস্টার লিসটারের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

'আমার বিশ্বাস, চিলেকোঠার প্রথম অনুপ্রবেশকারী হল সিয়েটা। এলেনার ওপর ভরসা রাখতে পারেনি সে, তাই নিজেই খুঁজতে এসেছিল বিশপের বই। দু'বার আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। একবার বিরোধ বাধে। আরেকবার এসে এলেনার জিসিনপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়জন যে এসেছে সে কে? সেটার জবাব দিয়েছে মিসেস বেকার। খোঁজ নিয়েছিল সে, ব্রোচটা পাওয়ার পর। মোটর দুর্ঘটনায় নাকি মারা গেছে মেয়েটা। এলেনার পার্টি যেদিন হয় সেদিন। মিসেস বেকার জোর গলায় বলছে, নিশ্চয় সেই মেয়েটার অশান্ত আত্মাই এসে ঢুকেছে চিলেকোঠায়, ব্রোচটা খুঁজে বের করে মানুষকে দেখানোর জন্যে যে সে সত্যিই ওটা চুরি করেনি, চোর ছিল না।'

'নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে,' অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ডিটেকটিভ।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সে চোর ছিল না এটা বিশ্বাস করছি। কিন্তু ভূত সেজে চিলেকোঠায় এসেছে একথা আমি বিশ্বাস করব না কিছুতেই। ভূত, প্রেতাত্মা এসব থাকতেই পারে না। ওই শব্দের অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে।'

'আমারও তাই ধারণা। বাতাসের কারসাজি হতে পারে। অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায় বাতাস, বিশ্বাস করা যায় না। ইঁদুরও হতে পারে। ঠিক আছে, আমিও নাহয় একদিন যাব তোমাদের সঙ্গে। রহস্যটার সমাধান করতে। অবশ্যই যদি লিসটার অনুমতি দেন।'

হঠাৎ প্রতিবাদের ঝড় উঠল রান্নাঘরে। থেমে গেল আবার। একটু পরে দরজায় উঁকি দিল কিম। ঘোষণা করল, খাবার তৈরি। উদ্ভট একটা গন্ধ এসে ঢুকছে রান্নাঘর থেকে, সবার নাকেই লাগছে সেটা। সেদ্ধ করা কাঠের গুঁড়োর গন্ধ মনে হল মুসার কাছে।

'অ্যাক্রন কেক খেতে চাইছে না বাচ্চারা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জানাল কিম। 'ওসব খেয়ে চুমাশ ইনডিয়ান সাজার কোন ইচ্ছেই ওদের নেই। কাপড় পরেছে যে এই বেশি।'

'তাই!' ঘাবড়ে গেলেন মিস্টার সাইমন। ওঁদেরকেই না আবার চেখে দেখতে বাধ্য করে কিম। চোখ ফেরালেন আরেক দিকে।

রবিনও ঘাবড়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে আবার চোখ ফেরালেন সাইমন। 'তাহলে ওগুলোর কি গতি হবে? আর বাচ্চাদেরকেই বা কি খাওয়াবে? ওদেরকে তো অভুক্ত রাখা যায় না।'

'ওদের নিয়ে ভাবনা নেই,' হাসল কিম। 'হাইওয়েতে একটা পিজার দোকানে নিয়ে যাব। আমেরিকান অ্যাক্রন না খেতে চাইলে কি হবে, আমেরিকান পিজা খুবই পছন্দ ওদের।'

'ভাল। তাই নিয়ে যাও। আর অ্যাক্রনগুলো ফেলে দাও, কিংবা কোন চুমাশ ইনডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাকে দিয়ে দাও।'

চোখে অনেক আশা নিয়ে মুসার দিকে তাকাল কিম।

এদিক ওদিক তাকাল মুসা। আবার তাকাল কিমের দিকে। না, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বাবুর্চি, কোন সন্দেহ নেই। 'খাইছে!' বিড়বিড় করল সে। কিমকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আমি কি চুমাশ নাকি?'

'না, চুমাশ নও। তবে চুমাশের বাপ।' পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কিম। আচমকা মুসার দু'হাত চেপে ধরল। 'মুসা, প্লীজ, লক্ষ্মী ভাই আমার, একটি বার! শুধু একটা চামচ! তার বেশি বলব না…

'মানে?'

'অ্যাক্রন এই নতুন রান্না করলাম। কেউ না চাখলে তো বুঝতে পারব না কেমন হয়েছে। শুধু এক চামচ…'

মাথা চুলকাল মুসা। রাজি হয়ে গেল, 'বেশ। তবে এক শর্তে।'

'কি শর্ত?' যে কোন শর্তে রাজি কিম।

'প্রচুর পরিমাণে স্যাণ্ডউইচ, মাংসের বড়া, ডিম ভাজি, পনির, কেক, সালাদ, আইসক্রীম…'

'আছে, সব আছে। থালা ভর্তি করে দেব। যত চাও দেব…'

'ঠিক আছে। নিয়ে এস তোমার অ্যাক্রন,' এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন অ্যাক্রনেরই একদিন কি তারই একদিন। দেখে নেবে আজ।

হাসি ফুটল অন্যদের মুখে। নিস্তার পেয়েছে।

নাচতে নাচতে রান্নাঘরের দিকে চলল নিসান জাং কিম।

আরও পনের দিন পর। ডাকে মোটা একটা খাম এসে হাজির হল কিশোরের নামে। ইয়ার্ডের কাজ করছিল সে। এই সময় পিয়ন দিয়ে গেল চিঠিটা। কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধান। বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকেই। পেয়ে গেল ছুতো এবং সুযোগ দুটোই। অফিসের সামনের বারান্দায় এসে বসল। ধীরেসুস্থে খুলল খামটা।

ভেতরে বেশ বড় একটা চিঠি। টাইপ করা। আর একটা কার্ড, দাওয়াতের। অবাক হল সে। কে দাওয়াত করল? আগে তাই কার্ডটাই দেখল। পড়ে আরও অবাক। লিসটার দাওয়াত করেছেন। আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন তিনি। মেয়ের বিয়ের কথা ঘোষণা করবেন, এনগেজমেন্ট করা হবে, হ্যাঁ, নিক ভিশনের সঙ্গেই। আশ্চর্য!

তিন গোয়েন্দাকেও দাওয়াত করা হয়েছে।

চিঠির নিচের সইটা দেখল কিশোর। লিসটারের। ব্যাপার কি? পড়তে আরম্ভ করল সে। তাকেই লেখা হয়েছেঃ

কিশোর,

সেদিন তুমি হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পর অনেক ভেবেছি। আসলেই, খারাপ লোক আমি। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। সেসব কথা ভেবে ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছে এখন। অনেকগুলো বছর পেছনে ফেলে এসেছি, আর অনেক অন্যায়, সবগুলোর

প্রায়শ্চিত্ত তো আর করতে পারব না, তবু যতটা পারি করার চেষ্টা করছি। ঠিকই বলেছ তুমি, শুধু টাকা থাকলেই হয় না, জীবনে ইজ্জত-সম্মানের অনেক দাম। এবং সৎ থাকার।

তোমাকে কয়েকটা কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি। আমার মত একটা মানুষকে সাহায্য করেছ বলে রাগ হচ্ছে তোমার, দেখ এসব জানার পর রাগ কিছুটা কমে কিনা। সিয়েটার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিনি আমি পুলিশের কাছে। বলেছি, আমাকে কিডন্যাপ করেনি সে, নিজের ইচ্ছেতেই আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। পুলিশ তখন জিজ্ঞেস করল, আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল কেন? বললাম, সেটা আমাদের দুই বন্ধুর ব্যাপার। পুলিশ অসন্তুষ্ট হলেও যেহেতু আমি কোন অভিযোগ করিনি, সিয়েটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে। পুরনো বন্ধুত্বটা আবার ঝালাই করার চেষ্টা করছি।

তোমরা নিশ্চয় একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছ, পান্নার খনি থেকে পান্না তুলে এনে বিক্রি করেই আমি আমার ব্যবসার পুঁজি জোগাড় করেছি। ভুল। আসলে, জীবনে যা করেছি আমি, যেখানে এসে উঠেছি, সব আমার নিজের চেষ্টায়। অনেক পরিশ্রম করে টাকা কামিয়ে দুটো ঝরঝরে স্টীমার কিনেছিলাম। সেই দিয়েই শুরু। বিশ্বাস না করলে এসে দেখে যেতে পার, খনি থেকে তুলে আনা পান্নাগুলো আজও আমার কাছেই আছে। একটাও নষ্ট করিনি কিংবা বিক্রি করিনি। সব সিয়েটাকে দিয়ে দেব ঠিক করেছি।

ডায়রির পাতাগুলো আমিই পুড়িয়েছি। ঠিকই আন্দাজ করেছ। আর কেউ যাতে যেতে না পারে, সেজন্যেই পুড়িয়েছিলাম পথের নির্দেশ। এখন ভাবি, ভালই করেছি। কেউ আর সে নির্দেশক পাবে না। পেলেই লোভ হত, আর লোভ থেকেই পাপ। আমি যে অন্যায় করেছি তা আর কেউ করতে পারবে না এখন।

ভাবছি, সিয়েটাকে ব্যবসার অংশীদার করে নেব। সে রাজি হবে কিনা জানি না। যতদূর জানি, আমার চেয়ে তার আত্মসম্মানজ্ঞান বেশিই।

ও হ্যাঁ, আরনি ভিনসেনজোর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তার পুরনো চাকরিটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। রাজি হয়নি। নতুন একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শেষে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে যে ক্ষতি আমি করেছি তার জন্যে মাপ চাইলাম। ওখানে আমার টায়ারের দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। ভিনসেনজোর দোকানপাট আবার সাজিয়েগুছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি আমি। যা লোকসান হয়েছে সব পুষিয়ে দেয়ার কথাও বলেছি।

তোমাদের কাছে আরও একটা জিনিস নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে। আমার কমপিউটারে সমস্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন ফাইল

রেখে দেয়ার ব্যাপারটা। সব মুছে ফেলেছি আমি। ওরকম ব্ল্যাকমেল করে মানুষকে দিয়ে কাজ হয়ত করান যায়, কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা মেলে না। স্পষ্ট করে সব কর্মচারীকে জানিয়ে দিয়েছি, ঠিকমত দায়িত্ব নিয়ে আমার এখানে কাজ করলে, কারোরই কোন অসুবিধে হবে না। কাউকে অন্যায় ভাবে চাপ দিয়ে আর কাজ করাব না আমি। তবে যে ফাঁকি দেবে তারও জায়গা হবে না আমার এখানে।

সব শেষে আসি মেয়ের কথায়। তার বিয়েতে আমার কোন অমত নেই আর। জীবনটা তার, কাকে নিয়ে কাটাবে সেটাও তার পছন্দ, আমার নাক গলান ঠিক হয়নি। নিককে নিয়ে যদি সুখী হতে পারে, আমার আপত্তি কি?

কিশোর, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। স্বীকার করতে লজ্জা কিংবা দ্বিধা নেই, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আরও আগেই যদি তোমার মত ওভাবে কেউ আমার চোখ খুলে দিতে পারত, অনেক ভাল হত। জীবনটা অনেক সুন্দর হয়ে যেত আমার কাছে। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

শেষ কথা, মেয়ের বিয়ের এনগেজমেন্ট হবে, কার্ড পাঠালাম। আসবে, অবশ্যই। তিন গোয়েন্দার দাওয়াত রইল। খুব খুশি হব। না এসে বুড়ো মানুষটাকে আর দুঃখ দিও না, প্লীজ।

ইতি—
ডেভিড লিসটার।

-ঃ শেষ ঃ-

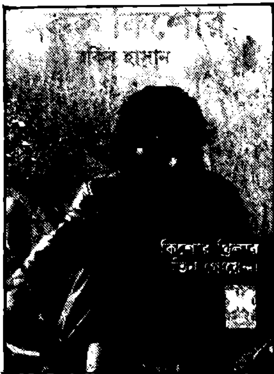

নকল কিশোর

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

'আরে, গেল কোথায়! এখানেই তো ছিল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা আমান।

ঝট করে তার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। মোবাইল হোমে তিন গোয়েন্দার গোপন হেডকোয়ার্টারে রয়েছে ওরা।

'কি গেল কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

কড়া চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'কেন, জান না?'

নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন।

'কি জানি না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখ,' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। 'সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে আমার। এসব রসিকতা ভাল্লাগছে না! খেয়ে ফেলে থাকলে বল।'

'আমরা তোমার খাবার খেতে যাব কোন দুঃখে? আর তোমার মত খাই খাই করি নাকি?'

'সত্যি বলছ খাওনি?'

'না।'

'সরিয়েও রাখনি, মজা করার জন্যে?'

'না,' এবার জবাব দিল রবিন। 'আমরা তো আমাদের কাজেই ব্যস্ত।'

'অবাক কাণ্ড! তাহলে গেল কোথায়?'

'দেখ, কোথায় রেখেছ,' কিশোর বলল। 'একখানে রেখে আরেকখানে খুঁজলে পাবে কি করে? যাকগে, যা বলছিলাম, কিছু একটা করা দরকার আমাদের। রিক্রিয়েশনের জন্যে। ইয়ার্ডে কাজ করতে করতে হাড় কালো হয়ে গেছে আমার। আর ভাল্লাগে না। চল, কাল কোনখান থেকে ঘুরে আসি। কোথায় যাওয়া যায়? ডিজনিল্যাণ্ডে আর না, অনেক হয়েছে। এক কাজ করি, চল, ম্যাজিক মাউন্টেইনে যাই। কখনও যাইনি।'

'আমিও না,' মুসা বলল। 'জায়গাটা কেমন, তা-ও জানি না। রবিন, জান?'

'শুনেছি তো ভাল। ডিজনিল্যাণ্ডের ধারেকাছেও লাগে না, তবে ভাল। অনেক মজার মজার জিনিস আছে, চড়ার ব্যবস্থা। আসলে বাচ্চাদেরই বেশি ভাল লাগবে। এই যেমন ফেরিস হুইল, চাড রাইড, এসব আর কি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'বাচ্চাদেরই। তবে আমারও খারাপ লাগবে না। অন্তত বাগান সাফ আর গ্যারেজ পরিষ্কারের চেয়ে তো ভাল।'

'আর মেরিচাচীর মরচে পড়া লোহার চেয়ার ঘষার চেয়ে,' যোগ করল কিশোর। 'তাহলে কি ঠিক হল? ওখানেই যাচ্ছি আমরা। রোলস রয়েসে চেপে যাব। অনেক দিন ওটাতে চড়ি না। হ্যানসনকে ফোন করে দেব নিয়ে আসতে।'

'ভালই হবে,' হেসে বলল রবিন। 'ওটা থেকে নামতে দেখলে লোকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। ভাবে কোনও কোটিপতির ছেলে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। হাহ্ হাহ্।'

'যাওয়ার ব্যবস্থা তো হল,' অধৈর্য হয়ে বলল মুসা। 'এখন আমার খাওয়ার কি হবে? খিদেয় তো পেট জ্বলে গেল। সত্যিই তোমরা দেখনি?'

'আবার সেই এক কথা,' হাত নাড়ল কিশোর। 'তুমি আর রবিন তো তখন ওয়ার্কশপে কাজ করছিলে। ওখানে রাখনি তো? চল, আমিই দেখছি। ওটা বের না করলে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাদের।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন খুঁজে বের করল ওটা, কিংবা বলা যায় তাকাতেই চোখে পড়ল। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর পড়ে রয়েছে লাঞ্চ প্যাকেট। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল মুসা। একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরে।

'ওই তো,' রবিন বলল। 'নিজেই ফেলে গেছ। আর এদিকে আমাদের মাথা খারাপ করছ।'

ব্যাগটা তুলে নিল মুসা। ভেতরে ছেঁড়া প্যাকেট। 'কে জানি খেয়ে ফেলেছে! কে?' রবিনের দিকে তাকাল সে।

'তুমিই হয়ত খেয়েছ,' কিশোর বলল। 'তারপর ভুলে বসে আছ।'

'আমি? খেলে ভুলে যাব, কথা হল একটা? তাছাড়া পেটের তো ভোলার কথা নয়।'

'তাহলে ইঁদুর,' ছেঁড়া কাগজটা দেখতে দেখতে রবিন বলল। 'ইঁদুরে সবই খায়। তোমার চেয়ে রাক্ষস।'

'ইঁদুর? আমার বিশ্বাস হয় না। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ইঁদুর থাকলে ওটার ঘুম হারাম করে ছাড়তেন মেরিচাচী। সেই সঙ্গে নিজের ঘুমও। না মারা পর্যন্ত। মনে নেই গত বছর...'

'তা আছে,' হেসে বলল কিশোর। 'ওই একটা চোখে পড়েছিল বলে। শেষে ওটাকেই মেরেছে, না অন্যটাকে, সে ব্যাপারেও শিওর নই আমি। যত খুঁতখুঁতেই হোক, স্যালভিজ ইয়ার্ডের মত একটা জায়গা থেকে ইঁদুর নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সাধ্য হবে না। ইঁদুর এমন এক জাত একেবারে শেষ করার ক্ষমতা কারও নেই।'

'এখন তাহলে কি করব?' মাথায় হাত দিয়ে বসার অবস্থা মুসার। 'পেটের মধ্যেই তো ইঁদুর ঢুকে বসে আছে।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'আজ কিছু খাওনি নাকি? এমন করছ। চল, ফ্রিজে কিছু থাকতে পারে। না থাকলে মেরিচাচীকে বললেই রেডি করে দেবে।'

ইয়ার্ডের অফিসের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। গেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাস্তা থেকে গেটে ঢোকার মাঝখানে এক চিলতে জায়গা, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সবুজ মার্সিডিজ। কেউ বেরোচ্ছে না ওটা থেকে।

'এই, ওই গাড়িটা আগে দেখেছ?'

মুসা আর রবিনও তাকাল। মাথা নাড়ল দু'জনেই।

'আস্তে করে ওখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল,' কিশোর বলল। 'দেখলাম।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন। 'ওখানে কোনও গাড়ি থামতে পারে না নাকি? হয়ত ইয়ার্ডে ঢুকবে, কাস্টোমার।'

'হয়ত,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিন্তু তাহলে কেউ নামছে না কেন? আজ সকালেও গেটের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছি গাড়িটাকে। তখন থামেনি। খুব আস্তে আস্তে চলছিল।'

'কিশোর,' বলে উঠল রবিন। 'এখন মনে পড়েছে, আমিও দেখেছি! পেছনের বেড়ার কাছে, রাস্তায়। সাইকেল নিয়ে যখন আসছিলাম। এই ঘণ্টাখানেক আগে।'

'ওরাই হয়ত আমার লাঞ্চ চুরি করেছে!' মুসা বলল।

'তা তো নিশ্চয়,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'ইণ্টারন্যাশনাল ফুড থিভস। তোমার কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চুরি না করলে কি ওদের চলে?'

'তোমার এই খাবারের চিন্তা মাথা থেকে নামাও তো,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'বলাই তো হল তুমি ভুলে না খেয়ে থাকলে ইঁদুরে খেয়েছে। ওই গাড়িটা কি চায় দেখা দরকার।'

রবিন হাসল। 'হয়ত আরেক প্যাকেট লাঞ্চ চুরির সুযোগ খুঁজছে।'

'মনে হয় কিছু চায়,' রবিনের কথা যেন শুনতেই পেল না কিশোর। 'দেখি।'

রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর, বুঝতে পারল অন্য দু'জন। কি করে জানি পেয়ে যায় সে, অনেকবার দেখেছে রবিন আর মুসা। কখনও ভুল করে না। এখনও সেরকমই আচরণ করছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'মুসা, ইয়ার্ডের পেছনে চলে যাও,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। 'লুকিয়ে থেকে গাড়িটার ওপর চোখ রাখ। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি আর রবিন। বেড়ার চারপাশে চক্কর দিয়ে আসব। রবিন, তুমি বাঁয়ে যাও, আমি ডানে যাচ্ছি। এতে সব দিক থেকেই নজর রাখতে পারব। মুসা, চলে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। দেখল, তিন গোয়েন্দার গোপন প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে তার বন্ধুরা। সে-ও রওনা হল। জঞ্জালের স্তূপের আড়ালে আড়ালে চলে এল মেইন গেটের কাছে। বেড়ার আড়ালে থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল, মার্সিডিজটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। ভেতরে দু'জন লোক। চট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল খোলা গেটের দিকে। উপুড় হয়ে পড়ে থেকেই ঘুরে তাকাল আবার।

'এই যে, কিছু হারিয়েছ? সাহায্য করব?'

ঢোক গিলল মুসা। গাট্টাগোট্টা একজন লোক। রোদে পোড়া চামড়া। হালকা স্যুট। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাদামী কোঁকড়া চুল লোকটার। নীল চোখ। মুখে মোলায়েম হাসি। ইয়ার্ডের ভেতরে মুসাকে ওভাবে হামাগুড়ি দিতে দেখে যেন খুব মজা পাচ্ছে।

'আমি···আমি···,' নিজেকে বোকা বোকা লাগছে মুসার। 'ইয়ে···বল হারিয়ে

ফেলেছি। সেটাই…খুঁ-খুঁজছি…'

'এদিকে তো কোনও বল দেখলাম না,' লোকটা বলল।

'তাহলে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে হয়ত,' ভোঁতা গলায় বলে উঠে দাঁড়াল মুসা।

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।' লোকটার হাতে একটা লোক্যাল ম্যাপ। সেটা দেখিয়ে মুসাকে বলল, 'সাহায্য করবে একটু? হারিয়ে গেছি আমরা।'

সবুজ মার্সিডিজের দরজা খুলে গেল। ভেতরে আরেকজন লোককে দেখতে পেল মুসা। সেদিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রোদেপোড়া লোকটা, বোঝাতে চাইল দু'জনেই হারিয়েছে। বলল, 'সেই তখন থেকে ঘুরে মরছি। বার বার একই জায়গায় ফিরে আসছি। পুরনো মিশনারিটা খুঁজছি আমরা।'

লোকটার কথায় বিদেশী টান। ইংরেজিই বলছে তবে ইংরেজ নয় সেটা স্পষ্ট। তাহলে এই ব্যাপার! ভাবল সে। দু'জন পথ হারানো টুরিস্ট। কিশোর পাশার রহস্য খোঁজায় তাহলে শুরুতেই ছাই পড়ল।

'নিশ্চয় করব।' ম্যাপটা নিয়ে দেখিয়ে দিল মুসা, কোস্ট হাইওয়ের কোন জায়গায় রয়েছে স্প্যানিশ মিশনটা। 'গোলমেলে রাস্তা। খুঁজে বের করাটা একটু জটিলই।'

'ঠিকই,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

গাড়িতে গিয়ে উঠল লোকটা। চলতে শুরু করল সবুজ মার্সিডিজ। দৌড়ে এল কিশোর আর রবিন। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'টুরিস্ট,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। লোকটার কাছে কিভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল জানাল। 'ইংরেজিই বলে, তবে অদ্ভুত টান।'

'পথ হারিয়েছে?' হতাশ গলায় বলল কিশোর। 'আর কিছু না?'

'আর কি হবে? হাতে কোনও কেস নেই আমাদের যে পেছনে লাগবে।'

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। চিন্তিত। 'পথ হারাতেই পারে, যেহেতু বিদেশী, কিন্তু…'

'এর মাঝে আবার কিন্তু দেখলে কোথায়? ওরা পথ হারিয়েছে। ব্যস।'

'বাদ দাও,' হাত নাড়ল রবিন। 'চল, ম্যাজিক মাউনটেইনে কখন কিভাবে যাব সেই আলোচনা করিগে।'

'হ্যাঁ, চল।' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'তবে তার আগে আমার খাবারেরও ব্যবস্থা কর। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

দুই

পরদিন সকাল সকাল উঠল রবিন। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পড়ে তাড়াহুড়ো করে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। গপগপ করে নাস্তা গিলছে, এই সময় খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তার বাবা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'জরুরী তদন্ত আছে মনে

হয়?'

'না, বাবা। আজ আমরা ম্যাজিক মাউনটেইনে যাচ্ছি তো, তাই। হ্যানসনকে রোলস রয়েস নিয়ে আসতে বলা হয়ে গেছে। সময়মত হাজির হয়ে যাবে সে। ব্রিটিশ শোফার। খুব সময় জ্ঞান। তার কাছে লজ্জা পেতে চাই না।'

'ও,' শিস দিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'তিনজন সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাল।'

'একেবারেই কি অস্বীকার করতে চাও?'

'আরে না না,' হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আসলেই তোমরা ভদ্র। রোলস রয়েসে চড়ে যাচ্ছ তো, সেজন্যেই সম্ভ্রান্ত আর বিশিষ্ট শব্দ দুটো যোগ করলাম।'

'বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাই। ডিনারের সময় ফিরব, মাকে বোলো।' দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল রবিন।

রোদ উঠছে। সকালের প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে সাইকেল চালাল সে। ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই দেখল অফিসের সামনে বারান্দায় একটা টুলে বসে রয়েছে মুসা। তাকিয়ে রয়েছে কালো বিশাল রোলস রয়েসটার দিকে। গাড়ি বটে একখান। মনে মনে আরেকবার তারিফ না করে পারল না রবিন।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা, ফিটফাট শোফারের পোশাক পরা একজন লোক। হ্যানসন। রবিনকে দেখে হাসল। 'গুড মর্নিং, রবিন।'

'গুড মর্নিং,' জবাব দিল রবিন।

'নতুন কোনও কেস?'

'নাহ্। কেন, কিশোর বলেনি?'

'কথা হয়নি।'

'ও। ম্যাজিক মাউনটেইনে যাচ্ছি আমরা।'

'বেড়াতে? চমৎকার জায়গা।'

বারান্দা থেকে নেমে এল মুসা। রবিনকে বলল, 'চল, ওঠ।'

গাড়িতে উঠল দু'জনে।

'কি ব্যাপার, কিশোর আসছে না?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কোথায় ও?'

'হেডকোয়ার্টারে। কি জানি করছে। চলে আসবে এখনি।'

কিছুক্ষণ বসে থেকে অস্থির হয়ে উঠল রবিন। 'চল তো দেখি।' নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মুসাও নামল। রবিনের পেছন পেছন এসে ঢুকল দুই সুড়ঙ্গে।

ট্রেলারে ঢুকে দেখল, ডেস্কের ওপাশে বসে রয়েছে কিশোর। অনেকগুলো রঙিন ব্রশিয়ার ছড়ানো টেবিলে।

'হ্যানসন বসে আছে, কিশোর,' রবিন বলল।

'এই হয়ে গেছে। আর একটু,' মুখ না তুলেই জবাব দিল গোয়েন্দাপ্রধান। আরও কয়েক মিনিট পরে সন্তুষ্ট হয়ে হেলান দিল চেয়ারে, 'হ্যাঁ, হয়েছে। চলবে।'

'কি চলবে?' মুসা জানতে চাইল।

'আমাদের এক্সকারশনের প্ল্যান করলাম,' কিশোর জানাল। 'ম্যাজিক

মাউনটেইনের একটা ম্যাপ জোগাড় করেছি। সবচেয়ে কম সময়ে কত বেশি মেশিনে চড়তে পারব হিসেব করলাম। কোনও মেশিনে বেশি মজা পেলে দু'বার করেও যাতে চড়তে পারি সেই সময়ও রেখেছি। আবার কোনটা যদি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, কিংবা বাতাসের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দেরি করিয়ে দেয়···দিতেই পারে, তাই না? কতটা সময় নষ্ট হবে তাতে সেটাও ধরেছি···'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মাথায় সত্যি ছিট আছে। চল, ওঠ তো।'

রবিন বলল, 'এতসব ভেবে কি লাভ? সময় যা লাগার লাগবেই।'

'কি লাভ?' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'হিসেব ছাড়া কিছুই চলে না···'

'আরে বাবা,' দু'হাত তুলল মুসা, 'ওখানে কাজ করতে যাচ্ছি না আমরা। যাচ্ছি নিছক মজা করতে। আনন্দ। তার আবার হিসেব কি?'

'বেশ,' মুখ গোমড়া করে ফেলল কিশোর। 'আমার প্ল্যান যদি তোমার পছন্দ না হয়, বাদ দিতে পার।'

টেবিলের কাগজগুলোর দিকে কয়েক সেকেণ্ড নীরবে তাকিয়ে রইল সে। এত কষ্ট করে অঙ্কগুলো করেছে। কাগজগুলো এক জায়গায় করে দলামোচড়া করে একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে ফেলে দিল ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। রবিন আর মুসার মনে হল একটা জ্বালাতন থেকে মুক্তি মিলল, হাসি ফুটল মুখে। উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

গাড়িতে উঠে নির্দেশ দিল কিশোর, 'ম্যাজিক মাউন-টেইনে যান।'

'ইয়েস, স্যার,' হেসে বলল হ্যানসন। ছেলেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তবু সৌজন্য ভুলতে রাজি নয় খাঁটি ইংরেজ শোফার।

জায়গাটা রকি বীচের পুবে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। শহর থেকে বেরিয়ে এসে কাউন্টি হাইওয়ে ধরে চলল বিশাল গাড়িটা। শুকনো, ধুলোময়, পাহাড়ের প্রথম ঢালটার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল হ্যানসন, 'সত্যি বেড়াতে? না কোনও গোপন কেস?'

'নাহ্, কেসটেস না,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বেড়াতেই এসেছি। কেন?'

'কারণ, অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদেরকে।'

'অনুসরণ!' প্রায় একই সঙ্গে বলল তিন কিশোর। মাথাগুলো ঘুরে যাচ্ছে পেছন দিকে।

'কোথায়, হ্যানসন?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমি তো কোনও গাড়ি দেখছি না।'

'মোড়ের ওপাশে রয়েছে। স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পর পরই গাড়িটা চোখে পড়েছে আমার। তারপর থেকে লেগেই রয়েছে পিছে। একটা সবুজ মার্সিডিজ।'

'সবুজ মার্সিডিজ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'আপনি শিওর?'

'গাড়ি চালানো আমার পেশা, কিশোর,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল হ্যানসন। 'ওই যে, বেরিয়েছে! আসছে আবার।'

পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ভুল নেই। পিছু

নিয়েছে সবুজ গাড়িটা।

'সেই গাড়িটাই!' মুসা বলল।

'তারমানে,' কিশোরের কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'টুরিস্ট নয় লোকগুলো। কাল মিথ্যে কথা বলেছে। আমার ধারণাই ঠিক।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি চায় ওরা?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু বুঝতে হবে মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা।'

'হ্যানসন,' কিশোর বলল। 'ওদেরকে খসাতে পারবেন?'

'চেষ্টা করতে পারি,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যানসন।

একসিলারেটরে চাপ বাড়াতেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বিশাল গাড়িটা। প্রায় নিঃশব্দে। ইঞ্জিনের আওয়াজ এখনও তেমন বাড়েনি। পর্বতের ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা এখন। সরু টু-লেন পথটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। এক পাশে গভীর খাত। স্টিয়ারিং চেপে ধরেছে হ্যানসন। দক্ষ হাতে মোড় ঘুরছে। একটু এদিক ওদিক হলেই গিয়ে খাতে পড়তে পারে গাড়ি।

গতি বেড়ে গেছে সবুজ মার্সিডিজের। রোলস রয়েসটাকে ধরার জন্যে তেড়ে আসছে ওটা। মোড় ঘোরার সময় গতি কমাচ্ছে না একটা গাড়িও, ফলে কর্কশ শব্দ করছে টায়ার। মাঝে মাঝেই বিপজ্জনক ভাবে রাস্তার কিনারে চলে যাচ্ছে একপাশের চাকা। যত শক্তিশালী ইঞ্জিনই হোক, স্বাভাবিক ভাবেই বড় গাড়ির চলন ভারি হয় ছোটগুলোর চেয়ে। অতটা ক্ষিপ্র হতে পারে না। তাই কাছিয়ে আসতে থাকল মার্সিডিজটা।

'ধরে ফেলেছে!' চিৎকার করে বলল মুসা।

শান্ত রয়েছে হ্যানসন। 'এর চেয়ে জোরে চালানো উচিত না।' সামনের পথের ওপর দৃষ্টি স্থির। 'তবে...' থেমে গেল সে। সামনে একটা বাঁক। সেটা ঘুরতে ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মার্সিডিজটা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল হ্যানসন। স্কিড করে এগিয়ে গেল গাড়ি। ডানে আর কয়েক ইঞ্চি সরলেই চাকা চলে যেত পথের বাইরে। বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে সে। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে আবার একসিলারেটরে চাপ দিল। বাঁয়ের একটা সরু কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এল গাড়ি। ওকের বন আর চ্যাপারালের ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথটা।

গর্জন করতে করতে চলে গেল মার্সিডিজটা।

'দিয়েছেন খসিয়ে!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন।

'আপাতত,' হ্যানসন বলল। 'তবে শীঘ্রি ওরা বুঝে যাবে ফাঁকিটা। ফিরে আসবে আমাদেরকে ধরার জন্যে। জলদি পালাতে হবে আমাদের।'

একসিলারেটর চেপে ধরল সে। তীব্র গতিতে ছুটল গাড়ি, ধুলো ওড়াতে ওড়াতে। খানিক পরই গতি কমিয়ে ফেলল হ্যানসন। ব্রেক কষে থামিয়ে দিল গাড়ি। 'সরি। লাভ হল না।' এতক্ষণে হতাশা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

কি হয়েছে দেখল ছেলেরা। সামনে পাহাড়ের দেয়াল। দু'ধারে পাহাড়। পথ রুদ্ধ। একটা বক্স ক্যানিয়নে ঢুকেছে গাড়ি।

'হাইওয়েতে ফিরে চলুন!' নির্দেশ দিল কিশোর। 'জলদি! হয়ত এখনও বুঝতে পারেনি ওরা যে আমরা ফাঁকি দিয়েছি।'

গাড়ি ঘোরাল হ্যানসন। ফিরে চলল মেইন রোডের দিকে।

তীক্ষ্ণ একটা মোড় ঘুরতেই সামনে পড়ল মার্সিডিজ। আরেকটু হলেই ওটার গায়ে গুঁতো মেরে বসত রোলস রয়েস। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়েই স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করল হ্যানসন, পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল মার্সিডিজের দুই আরোহী। দু'পাশ থেকে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে এল। হাতে পিস্তল।

'বেরোও! জলদি!' গর্জে উঠল একজন।

সাবধানে রোলস রয়েস থেকে নেমে এল হ্যানসন আর তিন গোয়েন্দা।

'দেখুন,' হ্যানসন বলল। 'বুঝলাম না কেন আপনারা...'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল লোকটা।

খপ করে বিস্মিত কিশোরের কব্জি চেপে ধরল আরেকজন। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে একটা মোটা থলে নামিয়ে দিল মাথার ওপর। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে মার্সিডিজে তোলা হল। পিস্তলের মুখে কিছুই করতে পারল না হ্যানসন, মুসা আর রবিন। নীরব অসহায় দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'খবরদার আমাদের পিছু নেবে না!' শাসিয়ে বলল একজন, 'যদি বন্ধুর জীবন বাঁচাতে চাও। তোমরা গোলমাল করলে ওর বিপদ হবে।'

চলতে শুরু করল মার্সিডিজ। হারিয়ে গেল হাইওয়ের দিকে।

তিন

চরকির মত পাক খেয়ে রোলস রয়েসের দিকে ঘুরল মুসা। 'আসুন, পিছু নেব!'

'না, মুসা!' বলল রবিন আর হ্যানসন।

ওদের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'কিন্তু ওকে বাঁচাতে হবে তো!'

'তা তো হবেই,' মুসার কাঁধে হাত রাখল হ্যানসন। 'কিন্তু ওদের পিছু নেয়া চলবে না। কিডন্যাপাররা বিপজ্জনক লোক।'

'ওদের পিছু নিলে কিশোরের ক্ষতি করতে পারে,' রবিন বলল। 'তবে ওরা কোন দিকে গেল সেটা আমাদের দেখা দরকার, যাতে পুলিশকে বলতে পারি। ওরা জানে না আমাদের গাড়িতে ফোন আছে। পুলিশকে সতর্ক করে দিতে পারব ভাবেনি। মুসা, জলদি চল। পাহাড়ের ওপরে গিয়ে দেখি। হ্যানসন, আপনি থানায় ফোন করুন। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে পান কিনা দেখুন।'

প্রায় ডাইভ দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকল হ্যানসন। রবিন আর মুসা উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল অল্পক্ষণেই। চূড়ায় যখন উঠল দরদর করে ঘামতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হাইওয়ের দিকে তাকাল।

'ওই যে!' রবিন হাত তুলল।

'দক্ষিণে যাচ্ছে!' মুসাও দেখতে পেয়েছে। 'রকি বীচের দিকেই তো। এত আস্তে চলছে কেন?'

'কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে না হয়ত।'

'পুলিশ তাড়াতাড়ি করলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। এস।'

ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে গিয়ে পা পিছলাল রবিন। গড়িয়ে নামল কিছুদূর। আবার উঠল। মুসা একবারও না পড়ে দৌড়ে নেমে চলেছে। রোলস রয়েসের কাছে পৌঁছে শুনল পুলিশকে মার্সিডিজের লাইসেন্স নম্বর আর লোক দুটোর চেহারার বর্ণনা জানাচ্ছে হ্যানসন।

'চীফকে বলুন,' মুসা বলল। 'দক্ষিণে রকি বীচের দিকে যাচ্ছে ওরা। তাড়াতাড়ি করলে সামনে দিয়ে এসে পথ আগলাতে পারবে।'

মুসার কথাগুলোও পুলিশকে জানাল হ্যানসন। ওপাশের কথা শুনল। তারপর বলল, 'চীফ। আমরা আছি। আসুন।'

ফোন রেখে দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাল সে। 'কিশোরকে নিয়ে গিয়ে কি করতে চায়? ওরা কে সত্যিই চেন না?'

'কালকের আগে দেখিইনি কখনও,' জবাব দিল রবিন।

'কিছু জানি না আমরা!' প্রায় ককিয়ে উঠল মুসা।

নিরাশ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

ধীরে চলছে মার্সিডিজ। ধীরে ধীরে নিচে নামছে পথ। কাউন্টি হাইওয়ে ধরে চলেছে, অনুমান করল কিশোর। তার মানে রকি বীচের দিকে চলেছে। তাকে নিয়ে কি করতে চায় লোকগুলো? ওরা কারা? কোনদেশী লোক?

পেছনের সীটে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। বান মাছের মত শরীর মোচড়াল সে। পিস্তলের নলের খোঁচা লাগল পাঁজরে। একজন তার কাছেই বসে রয়েছে।

'চুপ করে থাক,' আদেশ দিল লোকটা।

কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। প্রতিবাদ করতে চাইল। কথা বেরোল না মুখ দিয়ে, শুধু গোঁ গোঁ শব্দ।

'চুপ করতে বললাম না!' ধমকে উঠল লোকটা। 'লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে, বড় বংশের ছেলের মত।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল লোকটা। কুৎসিত হাসি প্রতিধ্বনি তুলল বদ্ধ জায়গায়। অন্য লোকটা নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে।

কিন্তু আবার কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। তাকে নিয়ে কি করবে লোকগুলো জিজ্ঞেস করতে চাইল। কিডন্যাপ লোকে একটা কারণেই সাধারণত করে। জিম্মি রেখে টাকা আদায়ের জন্যে। রাশেদ পাশার কাছে কি টাকা চাইবে! গোঙানি আর কুলকুচা করার মত এক ধরনের মিশ্র শব্দ বেরোল তার গলা থেকে। ছটফট করছে ডাঙায় তোলা মাছের মত।

'চুপ থাকতে বললাম না! বাবাকে নির্বংশ করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?'

স্থির হয়ে গেল কিশোর। বাবা? কিন্তু তার তো বাবা নেই। সে অনেক ছোট

থাকতেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সেটাই বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে।

পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা খেল সে। ধমক দিল লোকটা, 'দেখ ছেলে, আর হুঁশিয়ার করব না।'

তার পরেও থামল না কিশোর। বোঝানোর চেষ্টা করলই।

পিস্তলের খোঁচা না দিয়ে বরং এবার হেসে উঠল লোকটা। 'এক্কেবারে বাবার মতই হয়েছে। একরোখা। তাই না, জন? হবেই। রক্তের দোষ।'

'থামাও ওকে ডেভ,' সামনের সীট থেকে বলল অন্য লোকটা। 'ওরকম করতে থাকলে তো দম আটকেই মরে যাবে।'

'পেটালে পারি এখন। কথা তো শুনছে না।'

'হুঁ, মুশকিল। কোনও ক্ষতিও করা চলবে না।' একটা মুহূর্ত নীরব রইল জন। 'সুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। নইলে লাভ হবে না আমাদের।'

আবার হাসল ডেভ। 'স্যার মনটেরো যখন খবর শুনবে পিটারকে কিডন্যাপ করেছি আমরা, মুখখানা কেমন হবে দেখতে ইচ্ছে করছে এখনই। আমাদের কথা না শুনে পারবে না তখন।'

সামনে ঝুঁকে ছিল, সীটে হেলান দিল কিশোর। স্যার মনটেরো? পিটার? বুঝে গেছে আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছে। লোকগুলো তাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছে। এমন কেউ যার বাবা একজন নামী দামী ব্যক্তি, হোমড়া চোমড়া কেউ। টাকার জন্যে কিডন্যাপ করেনি। অন্য কারণ। হয়ত ব্ল্যাকমেল করবে। স্যার মনটেরো যে-ই হোন, তাঁকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করবে। কিন্তু ভুল করে বসেছে ওরা। ভুল লোককে তুলে এনেছে। সেটাই ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

পিস্তল দিয়ে খোঁচা মেরে তাকে আর চুপ করাতে চাইল না লোকটা। পাহাড়ী রাস্তার নিচে নেমে এসেছে গাড়ি। সমতল পথ ধরে জোরে ছুটছে এখন। তীক্ষ্ণ মোড় নিল আচমকা। আর্তনাদ করে উঠল চাকা। প্রায় ছিটকে গিয়ে সীটের কিনারে ধাক্কা খেল কিশোর। এই সময় শোনা গেল সাইরেন। পুলিশ! বাড়ছে সাইরেনের শব্দ। ক্ষণিকের জন্যে দম বন্ধ করে ফেলল সে। তাহলে পুলিশ আসছে, তাকে বাঁচাতে…কমে যেতে শুরু করল আবার সাইরেনের ওঁয়াও ওঁয়াও। মিলিয়ে গেল দূরে।

'ধরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই!' বলল কিশোরের পাশে বসা লোকটা, ডেভ।

'আমাদের পেছনে লেগেছে?' সামনের লোকটার প্রশ্ন।

'তাই তো। দেখলে না পর্বতের দিকে চলে গেল ওরা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে?'

কি করে জেনেছে, কিশোর বুঝতে পারছে। রোলস রয়েসে টেলিফোন আছে। নিশ্চয় ফোন করেছে তার বন্ধুরা। কিন্তু লাভ হল না। পার পেয়ে গেল কিডন্যাপাররা। ধরতে পারেনি পুলিশ। লোকগুলোকে এখন বোঝানো দরকার যে

ওরা ভুল করেছে।

কিন্তু আরেকটা কথা মনে পড়তেই ঘামতে শুরু করল সে। ভয়ে। ভুল লোককে ধরে এনেছে ওরা, এবং সেটা এখনও জানে না। পিটার নামে একটা ছেলেকে দরকার ওদের, কিশোর পাশাকে নয়। পিটারকে মারবে না ওরা, তাহলে তার বাবার বিরুদ্ধে অস্ত্রটা হারাবে। কিন্তু ভুলটা যখন বুঝতে পারবে ওরা তখন কি করবে?

কাঁচা রাস্তা ধরে গর্জন করতে করতে ছুটে এল দুটো গাড়ি। একটা পুলিশের। অন্যটা শেরিফের। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এসে ব্রেক কষে থামল দুটোই। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নেমে দৌড়ে এলেন কাউন্টির শেরিফ আর পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার।

'ওদের দেখেছেন?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ধরতে পেরেছেন ওদের?' জানতে চাইল মুসা।

মাথা নাড়লেন চীফ। 'হাইওয়ের প্রথম ক্রসরোডটা ব্লক করে দিয়েছি আমরা। তারপর সোজা চলে এসেছি এখানে। গাড়িটা তো দেখলাম না। রোডব্লকের কাছেও নেই।'

'তাহলে নিশ্চয় আমরা ব্লক করার আগেই বেরিয়ে গেছে,' শেরিফ অনুমান করলেন। 'হাইওয়ের পাশের কোনও রাস্তায় নেমে যেতে পারে। বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়। আরও লোক লাগাতে হবে আমাদের। দিকে দিকে খুঁজতে বেরিয়ে যাক।'

'এটা কাউন্টি এলাকা,' ছেলেদেরকে বললেন চীফ। 'এখানে শেরিফের দায়িত্ব। তবে এরকম কেসে আমরা মিলেমিশেই কাজ করি। লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপার্ট-মেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছি।'

'এখন,' শেরিফ বললেন। 'এখানে সূত্র খুঁজতে হবে আমাদের।'

'কিছু পাবেন বলে মনে হয় না, স্যার,' রবিন বলল। 'এখানে বেশিক্ষণ থাকেনি কিডন্যাপাররা। সূত্র ফেলে যাওয়ার কথা নয়।'

ঠিকই বলেছে সে। কাঁচা রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখলেন শেরিফ আর চীফ মিলে। কিছুই পেলেন না।

'অল রাইট।' অবশেষে চীফ বললেন, 'এখানে থেকে আর লাভ নেই। থানায় চলে যাই। এফ বি আইকেই খবর পাঠাতে হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' ততটা আশা করতে পারছে না রবিন। 'এভাবে খুঁজে লাভ হবে না। একটা গাড়ি খুব ছোট্ট জিনিস, তাই না?'

'হোক ছোট। পুরো কাউন্টি ঘিরে ফেলব আমরা। সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দেব। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার কোনও পথই খোলা রাখব না।'

রোলস রয়েসে গিয়ে উঠল রবিন আর মুসা। একেবারে চুপ। হ্যানসন যখন পুলিশের গাড়িটাকে অনুসরণ করল তখনও কিছু বলল না ওরা। নীরবে শুধু তাকাল একবার পরস্পরের দিকে। চোখে অস্বস্তি। একই কথা ভাবছে দু'জনে।

রোডব্লক যে করা হবে কিডন্যাপাররাও নিশ্চয় জানে সেটা। কি করে বেরোতে হবে প্ল্যানট্যান করেই রেখেছে। বেরিয়ে যাবে। সাথে করে নিয়ে যাবে কিশোরকে।

চার

থেমে গেল মার্সিডিজ।

থলের ভেতরে মুখ লুকানো। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্যে নাকের ডগার সমান ছোট একটা ফুটো কেবল। কিছুই দেখতে পারছে না কিশোর। অনুমানে বোঝার চেষ্টা করেছে কোন পথে কোন দিকে এগিয়েছে গাড়ি। কয়টা মোড় নিয়েছে মনে রেখেছে। কান পেতে রয়েছে পরিচিত শব্দের আশায়। এমন শব্দ, যেটা থেকে বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে। কিন্তু কোনও শব্দই নেই। শুধু শূন্য নীরবতা। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। না মানুষের, না যানবাহনের, না সাগরের।

'বের কর ওকে,' সামনের সীট থেকে বলল ড্রাইভার।

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ শুনল কিশোর। শক্ত হাত চেপে ধরল তাকে। ঠেলে বের করল গাড়ি থেকে। মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। জুতোর নিচে ঝরা পাতা, ঘাস, আর কঠিন মাটি।

'ব্যাগটা খুলে নাও। দেখে দেখে নিজেই হাঁটুক।'

'একটানে কিশোরের মাথার ওপর থেকে থলেটা খুলে নেয়া হল। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে আসা আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল যেন তার। আলো সইয়ে নেয়ার জন্যে চোখ মিটমিট করল সে। মুখ থেকে খুলে নেয়া হল কাপড়।

'এখন অনেকটা আরাম লাগছে, না?' বলল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা যার নাম ডেভ। 'খুলে দিলাম বলেই যে চিৎকার করবে তা হবে না। একদম চুপ থাকবে। নইলে...,' কিশোরের চোখের সামনে এনে পিস্তলটা নাড়ল সে।

মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। কিছু বলল না। যখন থেকেই বুঝতে পেরেছে তার আসল পরিচয় জানালে মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে তখন থেকেই চুপ হয়ে গেছে সে। কথা বলতেও ভয় লাগছে এখন। লোকগুলো তার ইংরেজি শুনে যদি বুঝে যায় যাকে ধরেছে সে পিটার নয়! কিশোরের কথায় লোকগুলোর মত টান নেই। পিটার ওদের দেশের ছেলে হয়ে থাকলে একই রকম টান থাকার কথা। খুব সাবধান হতে হবে এখন তাকে। ছোট্ট একটা ভুলও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ডেভ। তারপর ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'ব্যাগ তো খুললাম।'

আরও সহজ ভাবে শ্বাস নিতে পারল কিশোর। লোকগুলো তাকে চিনতে পারেনি এখনও। কাজেই আপাতত নিরাপদ। দ্রুত চারপাশে তাকাল সে। পর্বতের গোড়ায় ওকের বন আর চ্যাপারালের ঘন ঝোপের মাঝখানে আরেকটা কাঁচা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপরিচিত জায়গা। রকি বীচের একশ মাইলের মধ্যে

এরকম জায়গা অনেক আছে।

কিশোরকে হাঁটার নির্দেশ দিল জন, অর্থাৎ ড্রাইভার। ডেভের চেয়ে লম্বা, পাতলা শরীর। কালো চুল। ছোট ছোট চোখ কোটরে বসা। চোখের কোণের চামড়ায় ভাঁজ। ডেভের মত একই রকম রোদে পোড়া। একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দিচ্ছে, এমন কোনও দেশ থেকে এসেছে লোকগুলো, যেখানে ভীষণ গরম, রোদ খুব কড়া।

পথের পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। পঞ্চাশ গজ মত এগিয়ে ডানে ঘুরল। পর্বতের দিকে মুখ করে এগোল। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঘন, প্রায় দুর্ভেদ্য ঝোপ।

'জন, তুমি আগে যাও,' ডেভ বলল। 'ব্যাগগুলো নিয়ে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে রেখে টেনে ঝোপ ফাঁক করল। বেরিয়ে পড়ল একটা সরু পায়েচলা পথ। তার ভেতরে দুটো ব্যাগ ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল। গিলে ফেলল যেন তাকে ঝোপ।

'এবার তুমি যাও,' কিশোরকে আদেশ দিল ডেভ।

এক মুহূর্ত ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। টেনে ফাঁক করল ঝোপের ডাল। ঢুকে পড়ল ভেতরে। হাত থেকে হঠাৎ ছুটে গেল চ্যাপারালের শক্ত ডাল। কাঁটাঝোপের আঘাত থেকে মুখ বাঁচাতে এক ঝটকায় হাত তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে, ঢেকে ফেলল। লাফিয়ে পিছাতে গিয়ে গাছের গোড়ায় পা বেধে উল্টে পড়ে গেল। তাকে টেনে তুলল ডেভ। ঠেলে আবার ঢুকিয়ে দিল ঝোপের ভেতর।

ধমক দিয়ে বলল, 'এরকম চমকে দিলে কিন্তু ট্রিগারে চাপ লেগে যাবে আমার।'

ঢোক গিলল কিশোর। সরু পথ ধরে যতটা সম্ভব জোরে হাঁটতে লাগল। তার পেছনেই লেগে রয়েছে ডেভ, হাতে পিস্তল। কিছুদূর এগোতেই আবার ঘন ঝোপ পড়ল সামনে। পথটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে সামনের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে। ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে।

তাকে অনুসরণ করল কিশোর। না দেখে ফেলতে গিয়ে পা আবার বেঁধে গেল একটা শেকড়ে। পড়ে গেল উপুড় হয়ে। হাঁপাচ্ছে। উঠে পড়ল আবার পেছনের লোকটা তার গায়ে হাত দেয়ার আগেই।

লোকগুলোর কিছু হচ্ছে না। ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে এমন সাবলীল ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, দেখলে মনে হয় জায়গাটা ওদের পরিচিত। আগেও এসেছে এখানে। ওদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে যেন হিমশিম খাচ্ছে কিশোর। পথটাই দেখতে পাচ্ছে না। আরও দু'বার আছাড় খেল। তারপর এসে ঢুকল পর্বতের গভীরে সরু একটা বক্র ক্যানিয়নে।

দু'ধারে পাহাড়ের উঁচু দেয়াল। এক দেয়ালের গা ঘেঁষে রয়েছে ছোট একটা পাথরের কেবিন। কেবিনের দরজা খুলল ওদের একজন। আরেকজন ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল কিশোরকে। আবার লাগিয়ে দেয়া হল দরজা।

নির্জন কেবিনে ঢুকে শুনতে পেল কিশোর, দরজায় তালা লাগানোর শব্দ।

*

থানায় এসেছে মুসা, রবিন, রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। দেয়াল ঘেঁষা একটা বেঞ্চে বসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে।

'আমাদের ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো যদি সঙ্গে থাকত!' আফসোস করল মুসা।

'থাকবে কি করে?' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'ওগুলো তো মেরামতই হয়নি। তবে যোগাযোগের একটা না একটা উপায় বের করেই ফেলবে কিশোর।'

কড়া চোখে শেরিফ আর চীফের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'সারাদিনই এখানে বসে থাকব নাকি? কিডন্যাপাররা তো আর খেলা করছে না যে হাসতে হাসতে এসে ধরা দেবে।'

মাথা নাড়লেন চীফ। 'ভাববেন না। সব রকম চেষ্টাই করা হচ্ছে। পুরো শহর আর কাউন্টি এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। পালাতে পারবে না কিডন্যাপাররা। এসব কিডন্যাপিঙের কেসে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয় আমাদের। একটা ভুলচুক হলেই মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজেই তাড়াহুড়া করে রিস্ক তো আর নিতে পারি না।'

'যা যা করার সবই করা হচ্ছে,' শেরিফ বললেন। 'ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, অরিগন, অ্যারিজোনার সমস্ত পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এফ বি আইকে খবর দেয়া হয়েছে। মেকসিকান অথরিটিকে জানান হয়েছে। টেলিটাইপ করে মার্সিডিজের লাইসেন্স নম্বর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রতিটি পেট্রল কারকে। পুলিশের ডিপার্টমেন্ট অভ দা মোটর ভেহিকলকেও জানানো হচ্ছে।'

'ল্যাবরেটরি এক্সপার্টদের একটা দল ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে,' চীফ জানালেন। 'যে জায়গাটায় কিডন্যাপ করা হয়েছে সেখানটায় আবার ভালমত খুঁজবে ওরা। সূত্রটূত্র কিছু না পেলে তো এগোতে পারছি না আমরা।'

'আপনি নিজে গিয়ে কিছু করছেন না কেন?' কিছুতেই বুঝতে চান না মেরিচাচী।

'এখন গিয়ে তো আর লাভ নেই,' জবাবটা দিলেন শেরিফ। 'অযথা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর চেয়ে একটা সূত্র নিয়ে যদি বেরোতে পারি, তাহলে কাজ হতে পারে।'

কিছুতেই বোঝান গেল না মেরিচাচীকে। চীফ আর শেরিফ বেরিয়ে গেলেন। সেদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। নিস্ফল হয়ে ফিরে এল ল্যাবরেটরি টীম। শুনে আরও খেপে গেলেন তিনি। তাঁর ধারণা, পুলিশ কোনও কাজের না। নইলে এতগুলো লোক মিলে এত চেষ্টা করেও এখনও কোনও খোঁজ বের করতে পারছে না কেন কিশোরের?

'ছেলেটাকে যে কোথায় নিয়ে গেল!' ফুঁসে উঠলেন মেরিচাচী। 'এই,' মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন। 'আবার কিছুর তদন্ত করছ না তো তোমরা? কোনও কেসটেস নয় তো? অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়েছিলে?'

'না, আন্টি,' জবাব দিল রবিন। 'সত্যি বলছি, ম্যাজিক মাউনটেইন দেখতে বেরিয়েছিলাম আমরা।'

রাশেদ পাশা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কিডন্যাপ করা হল কিছুই বুঝতে পারছ না?'

'ইস্, যদি পারতাম!' আবার আফসোস করল মুসা।

'ব্যাটাদের যদি খালি ধরতে পারতাম…,' দাঁত কিড়মিড় করলেন মেরিচাচী।

চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। এত দুঃখেও হাসি পেল ওদের। মেরিচাচীর সামনে যদি এখন পড়ে কিডন্যাপাররা তাহলে তাদের জন্যেই কষ্ট হবে ওদের।

'একটা উপায় বের করতে পারলেও হত,' রবিন বলল। 'খুঁজতে যেতে পারতাম। কিশোর কি কোনই পথ করে রেখে যায়নি?'

'পারলে তো করবে,' মুসা বলল। 'লোকগুলো সাংঘাতিক চালাক। সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না।'

কাছে এসে দাঁড়ালেন চীফ। 'কতটা চালাক শীঘ্রি সেটা বের করব। হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়েছিল শেরিফের একজন লোক। র‍্যাটলস্নেক রোডের পাশে মার্সিডিজটা দেখতে পেয়েছে সে। শহর থেকে তিন মাইলের বেশি হবে না।'

'চলুন! চলুন!' পেছন থেকে প্রায় চিৎকার করে বললেন শেরিফ, 'এইবার পেয়েছি ব্যাটাদের!'

কেবিনে একা বসে আছে কিশোর। বাইরে লোকগুলো কি বলে শোনার চেষ্টা করছে। ভাবছে, সে যে পিটার নয় এটা বুঝতে কতক্ষণ সময় লাগবে লোকগুলোর?

ওদের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে সে, তবে কথা ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছে লোকগুলো। আরও একজন লোকের ব্যাপারে কথা বলছে যে তখন ওখানে নেই। বুঝতে অসুবিধে হল না, সেই লোকটার আসার অপেক্ষাতেই রয়েছে ওরা। কেউ একজন আসবে। কিছু একটা ঘটবে।

কিন্তু কে আসবে? আর এই পার্বত্য নির্জন এলাকায় ঘটবেটাই বা কি?

আরও ভাল করে শোনার জন্যে কান খাড়া করল সে। লাভ হল না। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। যে আসবে সে যদি আসল পিটারকে চেনে? কেবিন থেকে বেরোনো দরকার। পালাতে হবে কিডন্যাপারদের কবল থেকে। নইলে কি যে ঘটবে বলা মুশকিল। মুখ বন্ধ করানোর জন্যে মেরেও ফেলা হতে পারে ওকে।

ছোট কেবিনটায় চোখ বোলাল সে। একটি মাত্র শূন্য ঘর। আসবাব নেই বললেই চলে। একমাত্র দরজাটা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আটকান। জানালাও একটাই। আড়াআড়ি তক্তা লাগিয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিপজ্জনক জিনিস রাখা হত বোধহয় এখানে। পাহাড় ভাঙার জন্যে ডিনামাইট হতে পারে। কিংবা তেল তোলার যন্ত্রপাতি।

কিন্তু এখন আর কিছুই নেই কেবিনে। পালানোর পথও দেখতে পাচ্ছে না সে।

পাথরের দেয়ালের ধার ঘেঁষে একবার চক্কর দিল। দুর্বল জায়গা খুঁজল। নেই। প্রায় এক ফুট পুরু দেয়াল। ফাটল-টাটল দেখা গেল না। এই দেয়াল ভেঙে বেরোন সম্ভব না। আর ভাঙার কিছু নেইও কেবিনে। যদি থাকতও, তাতে লাভ হত না। ভাঙতে গেলে বিকট আওয়াজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে এসে উঁকি দেবে লোকগুলো। মোট কথা, দেয়ালের গায়ে বেরোনোর কোনও পথ নেই। অবশেষে মেঝের দিকে নজর দিল সে।

ইঞ্চিখানেক পুরু চওড়া বড় বড় তক্তা দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। গায়ে গায়ে ঠেসে বসান। ফাঁকও নেই তেমন। তবে জোরে চাপ দিলে বাঁকা হয়ে যায়। মাটিতে বসান হয়নি তক্তাগুলো। আড়াআড়ি কড়িকাঠের মত তক্তা নিচে পেতে তার ওপর সাজান হয়েছে। নিচে ফাঁক তেমন নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে পুরো মেঝেটা ঘুরে দেখল কিশোর। পেছনে দেয়ালের কাছে একটা তক্তা আলগা। এক প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরে তক্তাটা তুলে তার ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। টেনে সরিয়ে আনল ওটা।

নিচে ফাঁক রয়েছে। নীরবে পাশের তক্তাটার ওপরও কাজ করে চলল সে। সরিয়ে ফেলতে পারল অনেক কায়দা কসরৎ করে। নেমে গেল ফাঁকটায়। মেঝে আর মাটির মধ্যখানে যেটুকু ফাঁক রয়েছে, তাতে শুয়ে পড়া যায়। তা-ই করল সে। একধারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি। বুকে হেঁটে ঢাল ধরে এগোল সে। মেঝের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ফাঁক এত কমে গেছে বুকে হেঁটেও আর এগোন যায় না। চারপাশের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। বাতাস চলাচলের জন্যে খুব ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছে। সেসব দিয়ে মানুষ বেরোনো অসম্ভব। বেরোনোর পথ পেল না।

বাধ্য হয়ে যে পথে নেমেছিল সে পথে আবার ওপরে উঠে এল সে।

পালানোর কোনই পথ নেই।

র‍্যাটলস্নেক রোডে মার্সিডিজটার পেছনে এসে থামল পুলিশের গাড়ি। গাড়ির ভেতরটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখা হল।

'কিছুই নেই,' মুখ কালো করে বললেন ইয়ান ফ্লেচার। 'এখান থেকে কোন দিকে গেছে বোঝার উপায় নেই।'

'কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ গায়েব হয়ে যেতে পারে না,' মেরিচাচী বললেন।

গাড়িটার আশপাশে খুঁজে দেখলেন রাশেদ পাশা, মুসা আর রবিন। রাস্তার পাশের ঘাসে ঢাকা জমিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে ওটা।

'কিশোরের কোনও চিহ্নই তো দেখছি না,' রবিন বলল।

'একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত নেই,' বললেন রাশেদ পাশা।

'বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন,' চীফ বললেন। আশপাশের ঘন ঝোপ আর একধারে মাথা তুলে দাঁড়ানো পর্বতের দিকে নজর। 'যা অঞ্চল! যেখানে খুশি নিয়ে

গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে কিশোরকে।'

'তা পারে,' মুসা বলল। 'তবে বেশি দূরে গেছে বলে মনে হয় না আমার।'

পাঁচ

'কি করে বুঝলে?' ভুরু নাচালেন শেরিফ।

'সূত্রটুত্র পেয়েছ নাকি?' চীফ জানতে চাইলেন।

মার্সিডিজের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁচা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। বসে পড়ে মাটিতে আলগা ধুলোয় হাত বোলাল।

'দেখুন, স্যার!' সামনের মাটির দিকে দেখাল সে। 'পুরো রাস্তাটায় ওখানটাতেই যা এক চিলতে নরম মাটি দেখছি। মার্সিডিজের চাকার দাগ আছে। আর কোনও গাড়ি নেই। তার মানে অন্য গাড়ি আসেনি এখানে ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। এ পথে হেঁটে যাওয়ারও কোনও লক্ষণ দেখছি না। এর একটাই অর্থ, কাছাকাছিই আছে ওরা।'

মুসা যেখানটা দেখিয়েছে সে জায়গাটা চীফও পরীক্ষা করলেন। 'খটখটে শুকনো মাটি। প্রচুর ধুলো আছে। অথচ পায়ের ছাপ নেই।'

'তার মানে,' রবিন বলে উঠল। 'মুসা ঠিকই বলেছে। কাছাকাছিই আছে ওরা।'

'আছে,' আবার বলল মুসা। 'রাস্তাই পেরোয়নি। আমার ধারণা, সোজা নেমে গেছে ঝোপের কাছে। ওই চ্যাপারেলের ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পর্বতের দিকে।' পা বাড়াতে গেল সে।

'দাঁড়াও!' বাধা দিলেন চীফ। পথের একপাশ দেখিয়ে বললেন, 'এখানে ঘাস আছে, পায়ের ছাপ পড়বে না। এদিক দিয়েও গিয়ে থাকতে পারে।'

শেরিফও একমত হলেন তাঁর সঙ্গে। দু'জন সহকারীকে বললেন, 'অ্যাই, এই ঘাস ধরে তোমরা দু'জন দু'দিকে চলে যাও। পায়ের ছাপ দেখলেই ডাকবে। আমরা ঝোপগুলোয় খুঁজব। দেখি ঢোকার কোনও পথ আছে কিনা।'

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা দেখবেন,' রবিন বলল। 'কিংবা অস্বাভাবিক কিছু। জড় করা পাথর হতে পারে। ভাঙা ডাল হতে পারে। ওরকম চিহ্ন রেখে যেতে পারে কিশোর।'

রাস্তার যে পাশে পর্বত সেদিকটায় খুঁজতে চলল পুলিশ আর শেরিফের দুই ডেপুটি। দুই দল দুই দিকে গেল। খানিক পরেই ফিরে এল ওরা। জানাল ঘাস বেশিদূর নেই। তাতে পায়ের ছাপও নেই। একজন খুঁজে পেল পাথরের ছোট একটা স্তূপ। আন্দাজ করল, ওটা কিশোরের রেখে যাওয়া নির্দেশক হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলেন শেরিফ। অনেক পুরনো মাটি বেরোল পাথরের ফাঁক থেকে। অনেক দিন ধরে একরকম ভাবে পড়ে আছে। নতুন নয়। তার মানে এটা কিশোর রেখে যায়নি। একজন পুলিশ খুঁজে বের করল একটা ঝোপ। ওটার ডাল ভাঙা। ঘন ঝোপে খোঁজাখুঁজি করা হল। আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। রাস্তা চোখে

পড়ল না।

'চীফ?' ডেকে বলল আরেকজন পুলিশ। 'দেখুন তো!'

ছোট শাদা একটা জিনিস আটকে রয়েছে ঝোপের কাঁটায়। একটুকরো শাদা শক্ত কাগজ। দৌড়ে গেল রবিন আর মুসা।

'দেখে তো...,' শুরু করল রবিন।

শেষ করল মুসা, 'আমাদের কার্ডের মত মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে খুলে আনল কার্ডটা। হ্যাঁ, তিন গোয়েন্দার কার্ডই। কোনও ফাঁকে কিডন্যাপারদের চোখ এড়িয়ে ফেলে গেছে কিশোর।

'দেখি, ঝোপটা ফাঁক কর,' নির্দেশ দিলেন শেরিফ।

ডেপুটিরা আর পুলিশ মিলে টেনে ফাঁক করল ঝোপের ডাল। সরু পায়ে চলা পথটা আবিষ্কার করতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'রাস্তাই। সন্দেহ নেই,' তাকিয়ে রয়েছে চীফ। 'দেখ, হেঁটে গেছে কেউ। পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে।'

সরু পথটা ধরে চলল সবাই।

'ওই তো!' রবিন দেখাল। একটা ঝোপের পাতা ছেঁড়া, ডাল দোমড়ান, যেন কেউ পড়ে গিয়েছিল ওখানে। কাছেই একটা পাথরে খুদে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।

'কিশোরই এঁকেছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'চক ছিল পকেটে।'

'জলদি!' তাগাদা দিলেন রাশেদ পাশা। 'আছে কাছাকাছিই, পর্বতে...'

থেমে গেলেন তিনি। কান পেতে শব্দ শুনছেন। তারপর সকলেই শুনতে পেল শব্দটা। শক্তিশালী মোটরের আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে ঠিক যেন ওদের মাথার ওপর।

আকাশের দিকে হাত তুললেন মেরিচাচী। 'হেলিকপ্টার!'

কপালের ওপর হাত রেখে দেখতে লাগলেন শেরিফ। পুলিশের কিনা বোঝার চেষ্টা করছেন। একশ গজ ওপর দিয়ে উড়ে গেল পর্বতের দিকে।

'না,' ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বললেন চীফ। 'পুলিশের নয়! কিনডন্যাপারদের! ওটাতে করেই পালাবে!'

গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল কপ্টারটা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

'আপনি না বললেন কিছুতেই বোরোতে পারবে না!' শেরিফের ওপর ভীষণ রেগে গেলেন মেরিচাচী।

'থামবে না কেউ, হাঁটো!' মেরিচাচীর কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন শেরিফ। 'সামনেই কোথাও আছে। পালানোর আগেই ধরতে হবে।'

'যদি সময় মত পৌঁছতে পারি!' আর ভরসা করতে পারছে না মুসা।

ধুলোর ঘূর্ণি তুলে বক্স ক্যানিয়নে নামল হেলিকপ্টার। পরিষ্কার প্লেক্সিগ্লাস বাবলের ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল পাইলট। পরনে ফ্লাইং স্যুট, মাথায় হেলমেট, চোখে

গগলস, মাথা নিচু করে দৌড়ে এল দুই কিডন্যাপারের কাছে।

'ঠিক সময়েই এসেছ,' ডেভ বলল।

'ওকে নিয়ে এসেছি!' হেসে বলল অন্য লোকটা। জন।

জবাবে হাসল না পাইলট। 'মার্সিডিজটাকে ছেঁকে ধরেছে পুলিশ, দেখে এলাম। ঝোপের ভেতর দিয়ে এদিকে আসছে কয়েকজন।'

'ঝোপের ভেতর দিয়ে?' ভুরু কোঁচকাল ডেভ। 'এত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করল কিভাবে?'

'ওই ছেলেটা,' জন বলল। 'সব ওর শয়তানী। ইচ্ছে করেই পড়েছে কয়েকবার। চিহ্ন রেখে এসেছে।'

হেসে উঠল ডেভ। রাখুক। লাভ হবে না। ওরা আসার আগেই উড়ে যাব আমরা।'

'অত হাসির কি হল!' ধমকে উঠল পাইলট। 'যাও, নিয়ে এস ছেলেটাকে।'

'আনছি।'

'ও কোথায়?'

'ওই কেবিনে।'

'হুঁ। জলদি কর।'

ক্যানিয়নের পাথরের মত শক্ত মাটির ওপর দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে এগোল তিনজনে। তালা খুলল জন। ডেকে বলল, 'বেরিয়ে এস।'

'ডেভ!' চিৎকার করে উঠল জন। 'ও নেই!'

ডেভও উঁকি দিল ভেতরে। শূন্য কেবিন।

'ঘাস খেয়েছ নাকি বসে বসে!' কর্কশ কণ্ঠে বলল পাইলট, 'পালাল কিভাবে?'

'অসম্ভব! বেরোনোর কোনও পথ নেই!'

'তাহলে গেল কোথায়?' জনের প্রশ্ন।

'যেভাবেই হোক বেরিয়েছে!' চেঁচিয়ে বলল পাইলট। 'থাকলে তো থাকতই!'

'হয়েছে, অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ডেভ। 'পালিয়ে যাবে কোথায়? কেবিন থেকে বেরোলেও ক্যানিয়ন থেকে বোরোতে পারবে না। পথ নেই। একটাই পথ, সেটা দিয়ে গেলে আমাদের সামনে দিয়ে যেতে হত। যায়নি। তারমানে আছে। জন, খোঁজ।'

নির্জন ক্যানিয়নে ছড়িয়ে পড়ল তিন কিডন্যাপার।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সরু ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছল উদ্ধারকারী দলটা। হেলিকপ্টারটাকে দেখার বিশ মিনিট পর।

'ওই তো!' হাত তুলল রবিন।

ধীরে ধীরে ঘুরছে হেলিকপ্টারের রোটর। ওদের চোখের সামনেই লাফিয়ে গিয়ে বাবলে উঠে পড়ল পাইলট। শক্তি বাড়তে শুরু করল রোটরের।

'জলদি!' বলেই দৌড় দিল মুসা।

তার পেছনে ছুটল অন্যেরা। কপ্টারটাকে ধরার জন্যে। কেবিনের পেছন

থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। ওরাও দৌড় দিল কপ্টারের দিকে।

'এই থাম, থাম! পুলিশ!' চিৎকার করে উঠে ওদের দিকে দৌড় দিলেন শেরিফ।

ততক্ষণে কপ্টারের কাছে পৌঁছে গেছে দু'জনে। উঠে পড়ল। উদ্ধারকারীদের অসহায় দৃষ্টির সামনেই আকাশে উঠে পড়ল কপ্টার। ধুলোর ঝড় উঠেছে। বিশাল এক ফড়িঙের মত শূন্যে ঝুলে রইল একটা মুহূর্ত, তারপর আগে বাড়ল। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপাশে, দক্ষিণে।

বোকা হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে উদ্ধারকারীরা।

'গেল...চলে গেল!' বিড়বিড় করলেন রাশেদ পাশা।

'ওদেরকে যেতে দিলেন আপনারা!' রাগে দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হল মেরিচাচীর। 'আমার...আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল!'

সহকারীদের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন শেরিফ, গাড়ির কাছে ফিরে যেতে। টেলিফোনে নির্দেশ দেবেন পুলিশের হেলিকপ্টারকে, যাতে পিছু নিতে পারে।

'কিশোরকে কিন্তু দেখলাম না হেলিকপ্টারে,' রবিন বলল।

'হয়ত কেবিনেই রয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'আমাদেরকে দেখেই পালিয়েছে ব্যাটারা। ওকে নেয়ার আর সময় পায়নি।'

কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন চীফ। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললেন ভেজানো দরজা। পেছনে ঢুকল অন্যেরা। শূন্য ঘর।

'খাইছে! নেই তো!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'আগেই হয়ত কপ্টারে তোলা হয়েছিল,' রবিন বলল। 'দেরি করে ফেলেছি আমরা।'

'না, নথি,' যেন গায়েবী আওয়াজ হল। 'বরং সময়মতই এসেছ।'

কেবিনের পেছন দিকের দুটো তক্তা উঠে গেল। বেরিয়ে এল কিশোর পাশা। মুখে হাসি।

'কিশোওর!' প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'হ্যাঁ, কিশোর,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি?'

ছয়

'...বেরোনোর কোনও পথ পেলাম না,' পত্রিকার লোকদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলল কিশোর। 'তাই আর কি করব? ভাবলাম, লুকিয়েই থাকি। তারপর যা হয় হবে। কাজে লাগল ফন্দিটা। ধোঁকা খেল ব্যাটারা। আমিও বেঁচে গেলাম।'

'বুদ্ধিমান ছেলে,' বলল একজন রিপোর্টার।

'কিশোর পাশা বুদ্ধিমানই,' হেসে বললেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। 'নইলে কি আর পুলিশকে সাহায্য করতে পারত?'

রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলছে, একই সাথে পুলিশের ফাইলও ঘাঁটছে

কিশোর। রকি বীচ পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হওয়া অপরাধীদের সমস্ত ছবি রয়েছে ফাইলে। কিডন্যাপারদের চেহারার লোক আছে নাকি ওখানে দেখছে সে।

'কি চায় কিচ্ছু বলেনি?' প্রশ্ন করল একজন রিপোর্টার।

'অবান্তর প্রশ্ন,' বাধা দিয়ে বললেন চীফ। 'সেটা পুলিশের ব্যাপার। আপনাদেরকে বলার জন্যে নয়।' একটু থেমে বললেন, 'তবে একটা কথা বলতে পারি, মিস্টার রাশেদ পাশা তেমন বড়লোক নন যে তাঁর ভাতিজাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে মস্ত লাভ হবে কিডন্যাপারদের। অন্তত টাকাপয়সার দিক দিয়ে।'

মনে মনে চীফের ওপর ভীষণ রেগে গেল রিপোর্টাররা। কিন্তু কিছু করার নেই। কেউ যদি কিছু বলতে না চায় তাকে চাপাচাপি করার অধিকার নেই ওদের। কিশোরের বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

'ঠিক কিডন্যাপারদের মত কিন্তু লাগেনি ওদেরকে,' রবিন মন্তব্য করল।

'নতুন কিছু জেনেছেন, স্যার?' চীফকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ধরা যাবে?'

'বুঝতে পারছি না। অতটা সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু রিপোর্টারদেরকে তো বললেন সাধারণ কিডন্যাপিং।'

'কিডন্যাপাররা ধরা না পড়া পর্যন্ত মুখ বুজে থাকাই ভাল। এতে কম সাবধান থাকে ওরা। ধরা সহজ হয়।'

'তা ঠিক,' কিশোরও একমত হল। 'যত কম জানে ততই ধরতে সুবিধে। কিডন্যাপাররা ভাববে আমরা কিছুই জানি না। অসাবধান হবে। সেই সুযোগটা তখন কাজে লাগাতে হবে আমাদের।'

'ব্যাপারটা কি এখন খুলে বল তো, কিশোর,' চীফ অনুরোধ করলেন।

'আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছে ওরা। কোনও দেশের ভি আই পি গোছের কারও ছেলে মনে করেছে। পলিটিক্যাল কারণ হতে পারে। প্রতিশোধ হতে পারে। একজন জিম্মি খুঁজছে ওরা।'

'হুঁ।' নীরবে ভাবলেন কিছুক্ষণ চীফ। তারপর মুখ তুললেন। 'ভালোয় ভালোয় যে বেঁচে এসেছ এইই বেশি। ঠিক আছে, এখন যা করার পুলিশই করবে। তোমাকে কয়েক দিন সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। ইতিমধ্যে লোকগুলোকে ধরে ফেলতে পারব আমরা, আশা করি। তখন আর তোমার ভয় নেই, নিরাপদ। তোমার চাচা-চাচী তো চলে গেছেন। যাবে কিভাবে? পুলিশের গাড়িতে করে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করব?'

'মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর।

বাইরে বেরিয়েই দেখা গেল রোলস রয়েসটাকে। চারটে গাড়ির পেছনে। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যানসন। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আপনি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে যেতে বলা হয়নি,' জবাব দিল হ্যানসন। 'তার মানে ডিউটিতেই রয়েছি আমি। তোমরা যেখানে থাকবে সেখানেই থাকতে হবে আমাকে। তাই আছি। কোথায় যেতে হবে এখন?'

'বাড়িতে। এক মিনিট দাঁড়ান।' বলে দৌড়ে থানার সামনে ফিরে এল কিশোর। একটা গাড়ি ঘোরানো হয়েছে ওদেরকে নেয়ার জন্যেই। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বলল, আর কষ্ট করতে হবে না। ওদের গাড়ি এসে গেছে।

রোলস রয়েসে উঠল তিন গোয়েন্দা। ড্রাইভিং সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করল হ্যানসন, 'কোথায় যাব?'

'র‍্যাটলস্নেক রোড,' শান্তকণ্ঠে নির্দেশ দিল কিশোর।

'কোথায়?' চমকে গেছে মুসা।

'সেই বক্স ক্যানিয়নটায় যাব আবার। হ্যানসন, চালান।'

প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। চুপ করে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

র‍্যাটলস্নেক রোডে যখন পৌঁছল ওরা তখনও কড়া রোদ। গাড়িতে তালা লাগিয়ে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হ্যানসনও চলল ঝোপের ভেতরে লুকান পথ ধরে। পঁচিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ক্যানিয়নে, যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল কিশোরকে।

'আমি ভেতরে খুঁজব,' বলল সে। 'তোমরা কেবিনটার বাইরে খোঁজ। দেখ কোনও সূত্র পাও কিনা।'

'আমি কেবিনের ভেতরে অনেকক্ষণ ছিলাম,' বলল সে। 'কিছু থাকলেও এখন আর চোখে পড়বে না আমার। মুসা, তুমি আর হ্যানসন ভেতরে খোঁজ। বাইরের চারপাশটায়ও ঘুরে দেখবে। আমি আর রবিন যাচ্ছি হেলিকপ্টারটা যেখানে নেমেছিল সেখানে।'

'কিন্তু খুঁজবটা কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমারও সেই কথা,' মুসা বলল।

'যে কোনও সূত্র,' জবাব দিল কিশোর। 'লোকগুলো কে, কোত্থেকে এসেছে, কি চায়, এখনই বা কোথায় গেল, এসব। এমন কিছু মিলতেও পারে যা থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

ধীরে ধীরে পর্বতের ওপাশে হারিয়ে গেল সূর্য। লম্বা ছায়া পড়ল গিরিখাতের ভেতরে। কেবিনের ভেতরে বাইরে সমস্ত জায়গায় খুঁজল মুসা আর হ্যানসন। কিছু পেল না। রবিন আর কিশোরও কিছু পেল না হেলিকপ্টার নামার জায়গায়। মনে পড়ল কিশোরের, কেবিন থেকে দূরে তাকে খুঁজতে গিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ছড়িয়ে পড়ে আবার শুরু হল খোঁজা। প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছে এই সময় হঠাৎ ঝুঁকল কিশোর। একটা জিনিস তুলে নিল মাটি থেকে। অন্যেরা দৌড়ে এল তার কাছে।

'কী?' জানতে চাইল রবিন।

'বুঝতে পারছি না,' আস্তে জবাব দিল কিশোর। 'দেখ।'

গোধূলির ম্লান আলোতেও চকচক করে উঠল জিনিসটা। হাতির দাঁত কুঁদে তৈরি হয়েছে আরেকটা খুদে হাতির দাঁত। সোনার জালিতে বসিয়ে ছোট একটা আঙটা লাগানো হয়েছে।

'কানের দুল?' মুসা বলল।

'অন্য গহনাও হতে পারে। কিংবা সৌভাগ্যের প্রতীক,' রবিন বলল। 'ওই যে অনেকে বিশ্বাস করে, ওরকম কিছু আরকি।'

'যা-ই হোক,' কিশোর বলল। 'নিখুঁত নয় জিনিসটা। হাতে বানানো। বিদেশী হস্তশিল্প হতে পারে। পর্বতের গভীরে গিরিখাতে এই জিনিস এল কি করে ভাবছি।'

'কিডন্যাপাররা ফেলে গেল?' মুসার প্রশ্ন।

'যেতেই পারে।'

কিশোরের কাছ থেকে জিনিসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল হ্যানসন। 'লোকগুলোর কথার টানটা কোন দেশের বোধহয় বুঝতে পারছি। আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকাকালে ইংরেজদেরও কথার টান অনেকটা ওদেশের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। খাঁটি ব্রিটিশদের মত আর কথা বলতে পারত না ঔপনিবেশিকরা। কোনও দেশে বেশিদিন থাকতে থাকতে ওরকম হয়েই যায়। এই জিনিসটা মনে হচ্ছে আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের গহনা।'

উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'কোন দেশের সেটাই এখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'কিশোর,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'আমি ভেবেছিলাম এ কেসটা আমাদের জন্যে বাদ।'

'লোক ভাল না ওরা,' সাবধান করল রবিন।

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। 'সেজন্যেই তো বাদ দিতে পারছি না। আমাদের বয়েসী একটা ছেলে মহাবিপদের মধ্যে রয়েছে। রকি বীচেই কোথাও আছে সে। আমাদের কাজ তাকে সাহায্য করা।'

'কেন, দুনিয়ার সব মানুষকে সাহায্যের দায়িত্ব কি শুধু আমাদেরই?' গজগজ করল মুসা।

'না। তবে অন্তত এই একটি কেসে পিছিয়ে আসতে পারছি না আমরা। আঘাতটা আমার ওপরও এসেছিল। মারাও পড়তে পারতাম। ওই ছেলেটারও একই অবস্থা হতে পারে। ওকে সাহায্য করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। ভুল করেই হোক আর যেভাবেই হোক, আমাকে কিডন্যাপ করা না হলে হয়ত এতে জড়াতাম না।' বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলে হ্যানসনের দিকে ফিরল কিশোর। 'বাড়ি যেতে হবে। আপনারও ডিউটির সময় শেষ হয়ে এল।'

'চল।' মাথা ঝাঁকাল হ্যানসন।

ঝোপের ভেতরের সরু পথ ধরে একসারিতে হাঁটছে ওরা। দ্রুত কমে আসছে গোধূলীর আলো। র‍্যাটলস্নেক রোডের দিকে চলতে চলতে মুসা বলল, 'কিশোর, ছেলেটাকে বের করব কিভাবে?'

'উপায় নিশ্চয় আছে। সেজন্যে তার সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নেয়া প্রয়োজন আমাদের। আজ রাতে গবেষণা চালাব আমি। কাল সকালে হেডকোয়ার্টারে দেখা কর তোমরা। তখন বিস্তারিত আলোচনা করব।'

সাত

'আরে আস্তে খাও না,' মিসেস আমান বললেন। 'ফুরিয়ে তো আর যাচ্ছে না। গলায় আটকাবে তো।'

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছে মুসা। 'তাড়াহুড়া আছে, মা।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন মিস্টার আমান। 'কিশোরের কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা নয় তো? সাবধান। খুব বিপজ্জনক কিন্তু।'

'জানি।'

মিসেস আমান বললেন, 'কেমন অদ্ভুত ব্যাপার বল তো? ভুল করে একজনের জায়গায় আরেকজনকে নিয়ে যাওয়া।'

'কিশোর তো তবু চুপ করেছিল। আমি হলে···,' বাক্যটা শেষ না করে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল মুসা।

দ্রুত নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এল সে। সাইকেল নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে রওনা হল। সুন্দর সকাল। ফুরফুরে বাতাস। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার গোপন প্রবেশ পথ লাল কুকুর চার দিয়ে এসে ভেতরে ঢুকল মুসা। বাইরের ওয়ার্কশপে কাজ করতে দেখল কিশোরকে। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর তিনটে খুদে যন্ত্র খুলে ছড়িয়ে বসেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'জরুরী সংকেতের প্রয়োজন হতে পারে,' মুসাকে দেখে বলল কিশোর। 'এস, হাত লাগাও। রবিন আসতে আসতে সেরে ফেলি।'

'পিটারের ব্যাপারে খোঁজখবর করার কথা ছিল,' ওয়ার্কবেঞ্চের অন্য প্রান্তে বসল মুসা। 'তার কি হল? নিয়েছ?'

'নিয়েছি,' হাসল কিশোর। 'অনেক কিছু জেনেছি কাল রাতে। পিটার মনটেরোকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

'বল!' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না মুসা।

'রবিন আসুক। এক কথা দু'বার বলতে ভাল লাগে না।'

জোর করে কিশোরের মুখ খোলান যাবে না। হতাশার একটা ভঙ্গি করে যন্ত্র মেরামতে লাগল মুসা। পার্টসগুলো সব পরিষ্কার করে আবার জুড়ে দেয়ার জন্যে রেডি করেছে, এই সময় হাজির হল রবিন। সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকল সে। 'সরি,' জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে আসাতে হাঁপাচ্ছে। 'মা দেরি করিয়ে দিল। কাজ না সেরে বেরোতে পারলাম না। তা কি খবর, কিশোর? আমাদের কেসের ব্যাপারে আলোচনার কথা ছিল। চীফ ফ্লেচারের কাছ থেকে আর কোনও খবর পেয়েছ?'

'পেয়েছি। সকালেই ফোন করেছিলাম। হেলিকপ্টারটাকে পেয়েছে পুলিশ। ভেনচুরার কাছে একটা মাঠে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।'

'আমাদেরকে বোকা বানিয়েছিল? উড়ে গেল দক্ষিণে, অথচ পাওয়া গেল উত্তরে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিকই করেছে। আমি হলেও ওরকমই কিছু করতাম। কে আর সেধে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়তে চায়। চীফ বলেছেন লোকগুলোকে ধরার মত কোনও সূত্রই ছিল না কপ্টারে। ভাড়া নেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল জরুরী ডাক সরবরাহ করবে। এয়ারফিল্ড থেকে নিয়ে গিয়েছিল ওটা পাইলট। মাথায় হেলমেট আর চোখে গগলস ছিল তার। ফলে চেহারা কেউ দেখতে পায়নি। আর কাগজপত্র যে সব ভুয়া তাতে তো কোনও সন্দেহই থাকার কথা নয়।'

'বাহ্, চমৎকার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল মুসা। 'অনেক উপকার হবে আমাদের!'

'কিডন্যাপারদের খবর কি?' রবিন জানতে চাইল।

'এখনও সনাক্ত করা যায়নি,' কিশোর জানাল। 'হেলিকপ্টার আর মার্সিডিজে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনের এফ বি আই অফিসে ওই ছাপ রেকর্ড করা নেই। আর মার্সিডিজটাও ভাড়া করা।'

'বলতে চাও আমাদের হাতে কোনও সূত্রই নেই,' ভোঁতা গলায় বলল মুসা।

'না, ঠিক তা নয়,' হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বলেছি না কাল রাতে অনেক গবেষণা করেছি। আমার মনে হয়...'

কথা শেষ হল না তার। পেছনে শোনা গেল জোরাল কণ্ঠস্বর। মেরিচাচী। 'সবাই তাহলে এখানে। ভালই হল। কিশোর, দুই দিন আগে কথা দিয়েছিলি ছোট স্টোররুমটা পরিষ্কার করে দিবি।'

'সরি, চাচী।'

'ঠিক আছে। আজকে করে দে। মাল রাখতে হবে ওখানে। বাইরে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে জিনিসগুলো। তিনজনে করতে আর কতক্ষণ লাগবে...'

'আমি একাই পারব,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এগুলো লাগিয়ে ফেল। আমি আসছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। অনেক বার কথাটা ভেবেছে আগেও, আজ আরেক বার ভাবল, পৃথিবীতে এই কাজ জিনিসটা না থাকলে অনেক ভাল হত। আর যদি খিদেটা না থাকত। অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পেত মানুষ।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের চলে যাওয়া দেখতে লাগল রবিন আর মুসা। কিশোর কি জেনেছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। ছোট যন্ত্রগুলো জোড়া লাগানোয় মন দিল।

শেষ হয়ে গেল লাগানো।

অযথা বসে না থেকে ওয়ার্কশপটা গোছানোয় লেগে গেল দু'জনে। সেই কাজও শেষ। অনেকক্ষণ বসে থেকে উসখুস করে হেডকোয়ার্টারে ঢোকার জন্যে যেই দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগোল, শোনা গেল একটা কণ্ঠ, 'দাঁড়াও!'

কাজ করতে করতে ঘেমে একাকার হয়ে এসেছে কিশোর। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল সে।

'কাল রাতের কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল তো এবার!' অস্থিরতা আর চেপে রাখতে পারল না মুসা।

'কি জেনেছ?' রবিনের প্রশ্ন।

'কিশোর!' আবার ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। অফিসের কাছ থেকে ডেকেছেন।

'খাইছে! আবার!' ককিয়ে উঠল মুসা।

'চল লুকিয়ে পড়ি!' পরামর্শ দিল রবিন। 'জবাব দিও না।'

'লাভ হবে না তাতে। ভাল করেই জানে আমরা এখানে আছি। বেরিয়ে যেতে দেখেনি,' কিশোর বলল।

'তা ঠিক,' সাংঘাতিক হতাশ হয়েছে মুসা। মেরিচাচীর কাছ থেকে লুকিয়ে রক্ষা নেই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। না, এফ বি আই। না না, ক্যানাডিয়ান মাউনটিজ। উঁহু, তিনটা একসঙ্গেই। এত কড়া নজর ঈগলেরও নেই। চল, বেরোই।'

বেরিয়ে এল তিনজনে। জঞ্জালের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ হাত তুলল রবিন, 'কিশোর, দু'জন লোক!'

কিডন্যাপারগুলো না তো! আঁতকে উঠল মুসা।

'না। দেখছ না, একজন কালো চামড়া।'

'কালো?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'ঠিকই আছে। এরকমই হওয়ার কথা। এস।'

'হওয়ার কথা?' কিছুই বুঝতে পারল না মুসা। 'কি বলতে চাও?'

কিন্তু জবাব দেয়ার অবকাশ নেই যেন কিশোরের। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। তাকে ধরার জন্যে দ্রুত এগোল দুই সহকারী। কিন্তু অফিসের কাছাকাছি যাওয়ার আগে ধরতে পারল না।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'এই ভদ্রলোকরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। ভাড়াটাড়া করার ব্যাপার। মনে তো হচ্ছে আগামী পুরো হপ্তাটাই কাজ আটকে থাকবে আমার। কিছুই হবে না।'

'না, ম্যা'ম,' মেরিচাচীর আশঙ্কা দূর করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। লম্বা, সোনালি চুল, মুখটা ওই দুই কিডন্যাপারের মতই রোদেপোড়া। 'আমাদের হয়ে ছোট্ট একটা তদন্ত করে দিতে হবে ওদের।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ইংরেজি বলছে ইংরেজদের মত, কিন্তু সেই অদ্ভুত টান।

'ছোট হলেই ভাল,' মেরিচাচী বললেন। 'আগামী হপ্তা থেকে ইস্কুল শুরু হবে ওদের। এর মধ্যেই আমার কাজগুলো সব করিয়ে রাখা দরকার।'

বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। অফিসে চলে গেলেন। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর। তারপর লোকগুলোকে ইশারা করল সঙ্গে আসার জন্যে। ওয়ার্কশপে নিয়ে এল ওদেরকে।

'কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনাদের পরিচয়?'

'আমি হাবার্ট কিং,' সোনালি চুল লোকটা বলল। কালো লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম হ্যারি ম্যাকঅ্যাডাম। কিডন্যাপিঙের ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছি আমরা।'

'ভাল গোয়েন্দা দরকার আমাদের,' হ্যারি বলল। 'তোমাদের ব্যাপারে খোঁজ

নিয়েছি। খুবই ভাল নাকি তোমরা। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ। সেজন্যেই এলাম। সাহায্য করতে রাজি থাকলে বল, সব কথা খুলে বলছি। কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে। কি চায় ওরা।'

'খুশি হয়েই করব, মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম,' কিশোর জবাব দিল। 'তবে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকে, জানি, আপনাদেরকে আর বলতে হবে না। ওরা কি চায় তা-ও জানি।'

'জান?' মুসা অবাক।

'জানি, সেকেণ্ড। আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল কারণ আমি দেখতে অনেকটা পিটার মনটেরোর মত। পিটার হল স্যার উইনিফ্রেড মনটেরোর ছেলে। আফ্রিকার একটা ছোট্ট ব্রিটিশ কলোনি নানদার প্রধানমন্ত্রী তিনি। ইংরেজ। বিয়ে করেছেন এক ভারতীয় মহিলাকে। আগামী বছরের মধ্যেই ওটাকে স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর সরকারে থাকবে বেশির ভাগই কালো চামড়ার মানুষ। আর শ্বেতাঙ্গ যারা থাকবে, তারা বাইরের কেউ নয়, নানদায় যারা জন্মগ্রহণ করেছে শুধু তারাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ আছে। দলটার নাম ব্ল্যাক নানদান এলিয়ান্স। গোপনে কাজ করছে এর সদস্যরা, দেশ থেকে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের তাড়াতে চাইছে। আরও একটা দল আছে, শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী। ন্যাশনাল পার্টির লোক ওরা। ওরা চায়, কোনও কালো লোক থাকবে না সরকারে। সব শাদা। সেনাবাহিনীও গঠিত হবে সব শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে, যাতে কালোদের দাবিয়ে রাখতে পারে।'

'কিশোর, তুমি এত কথা জানলে কি করে?' রবিন অবাক।

'আর এর সঙ্গে কিডন্যাপিঙেরই বা কি সম্পর্ক?' মুসা জানতে চাইল।

'অনেক সম্পর্ক,' কিশোর বলল। 'কিডন্যাপাররা ন্যাশনাল পার্টির উগ্রবাদী শ্বেতাঙ্গদের লোক। পিটারকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে তার বাবাকে বাধ্য করতে চায়, যাতে স্যার মনটেরো তাঁর প্ল্যান বাতিল করে তাদের কথায় রাজি হন। মিস্টার কিং আর মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম নিশ্চয় স্যার মনটেরোর সমতাবাদী দলের লোক। পিটারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।'

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল যেন ওয়ার্কশপটা।

'বড় বেশি জান তুমি,' হ্যারি বলল। 'অনেক বেশি জেনে ফেলেছ। এতটা ভাল না।'

তার কালো থাবায় ধরা ভয়ংকর দর্শন এক পিস্তল।

আট

কালো মুখে জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে যেন হ্যারির চোখ। সোজা কিশোরের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। 'এসব জানার একটাই উপায়। কিডন্যাপারদের সঙ্গে যোগসাজস আছে তোমার। তুমি স্পাই।'

'হুট করে কিছু কোরো না, হ্যারি,' কিং বলল। তার দৃষ্টিও ভয়ংকর হয়ে

উঠেছে। 'হ্যাঁ, ইয়াং ম্যান, বল তো কি করে এসব জানলে তুমি?'

'জানা কি এমন কঠিন কাজ নাকি?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল কিশোর। 'আমি স্পাইও নই বোকাও নই। একটা সহজ কথা ভাবছেন না কেন? আমি কিডন্যাপারদের লোক হলে আমাকে ওভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হত নাকি? আর আমিও কি ঢাকঢোল পেটাতাম?'

তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। 'বলে যাও।'

'কাজটা সহজ হল কি করে বল,' আদেশের সুরে বলল কিং।

'বেশ।' বড় করে দম নিল কিশোর। 'ধরে তো নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। ওদের আলাপ আলোচনা শুনলাম। কথায় অদ্ভুত টান। আমাকে পিটার বলে ভুল করল। ভাবল স্যার উইনিফ্রেড মনটেরোর ছেলে। যাই হোক, পালিয়ে আসতে পারলাম অবশেষে। তারপর আবার গেলাম কেবিনটার কাছে। এটা পেয়েছি,' হাতির দাঁতে তৈরি জিনিসটা বের করে দেখাল সে। 'আমাদের শোফার হ্যানসনের বিশ্বাস, এটা আফ্রিকার কোনও ব্রিটিশ কলোনি থেকে এসেছে।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল কিং। তুলে ধরল হ্যারির জন্য। দেখে মাথা নাড়ল হ্যারি।

'চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে আমাদের রকি বীচে,' বলে গেল কিশোর। 'রেফারেন্স বই আর ম্যাগাজিন ঘেঁটে বের করতে খুব একটা কষ্ট হল না স্যার মনটেরোর নাম। জানতে পারলাম নানদার ব্রিটিশ কলোনির প্রাইম মিনিস্টার তিনি। স্বাধীনতার জন্যে গোলমাল চলছে এখন দেশটায়। পার্টিগুলোর নাম জানলাম। তারপর আর বুঝতে কষ্ট হল না কেন পিটারকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল লোকগুলো। আপনাদের কথায়ও একই রকম টান। এবং দু'জন দু'রঙের চামড়া হলেও কাজ করছেন একসাথে। অর্থাৎ স্যার মনটেরোর হয়ে। কাজেই বোঝাটা কি এতই কঠিন?'

'তাই তো,' মুসা বলল। 'একেবারেই সহজ।'

হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল কিং। 'চলবে?'

'হ্যাঁ,' বলে আবার হোলস্টারে পিস্তল রেখে দিল হ্যারি। 'সত্যিই বলছে মনে হয়।'

'এবং খুব ভাল গোয়েন্দা। আশা করি আমাদেরকে নিরাশ করবে না ও। কি বল, কিশোর?'

'না, করব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ভেরি গুড,' কিং বলল। 'মাত্র গতকাল রকি বীচে এসেছি আমরা। বিকেলের কাগজে পড়েছি তোমার কিডন্যাপিঙের খবর। তোমার ছবি দেখেছি। তিন গোয়েন্দা নামে যে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছ তোমরা, এবং সেটার সাংঘাতিক সুনাম, তা-ও জানলাম। ভাবলাম তোমাদেরকে দিয়েই হবে। চলে এলাম।'

'তাহলে কি আমাদের ভাড়া করছেন?' মুসার প্রশ্ন।

হ্যারির দিকে তাকিয়ে যেন আলোচনার উদ্দেশ্যেই বলল কিং, 'তোমার কি মনে হয়, হ্যারি? ওরা পারবে? এমন গোয়েন্দাই আমাদের দরকার, তাই না?'

'মনে হয় পারবে,' হ্যারির মুখেও হাসি।

রবিন আর মুসার মুখেও হাসি। কিন্তু কিশোর গম্ভীর। জিজ্ঞেস করল, 'পিটারের সঙ্গে চেহারার কতটা মিল আছে আমার, স্যার?'

'আমাকে শুধু কিং বললেই চলবে। মিল? একেবারে যমজ বলা চলে। আশ্চর্য! বিশ্বাসই হতে চায় না। দু'বছর ধরে আমেরিকায় আছে পিটার। এতদিনে নিশ্চয় চেহারা কিছুটা হলেও বদলেছে। ফলে লোকগুলো আর চিনতে পারেনি। তোমাকেই পিটার বলে ভুল করে বসেছে। ওর কথায়ও নানদার টান। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না…'

'আমার কথা শুনেও কেন বুঝতে পারল না ওরা, এই তো?' হাসল কিশোর। 'মুখে কাপড় গোঁজা ছিল আমার। প্রথমে বলার চেষ্টা করেছি। তারপর যে-ই ওদের উদ্দেশ্য বুঝে গেলাম, চুপ হয়ে গেলাম একেবারে। একটা কথাও আর বললাম না।'

'ভাল করেছ,' হ্যারি বলল। 'মারাত্মক বিপদে পড়ে যেতে তাহলে। ওদের নাম আর চেহারার বর্ণনা যা পেয়েছি তাতে পরিচিত লাগছে না। তবে উগ্রবাদী দলের লোক সন্দেহ নেই। ওই দলের লোকরা ভয়ংকর।'

'দেশে থাকলে নিরাপদ নয়,' কিং বলল। 'সেজন্যেই ছেলেকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্যার মনটেরো। লস অ্যাঞ্জেলেসে থেকে ইস্কুলে পড়ে। খুঁজে খুঁজে এখানেও এসে হাজির হয়েছে উগ্রবাদীরা। হপ্তাখানেক আগে প্রায় ধরেও ফেলেছিল পিটারকে। অনেক কষ্টে পালিয়েছে সে। তারপর তার আর খোঁজ নেই। স্যার মনটেরোর তো প্রায় পাগল হবার জোগাড়। লস অ্যাঞ্জেলেসের নানদার ট্রেড মিশনের মাধ্যমে পিটার খবর পাঠানোর পর গিয়ে তিনি শান্ত হয়েছেন।'

'কি খবর পাঠিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ট্রেড মিশনটা কি?' মুসা জানতে চাইল।

'ট্রেড মিশন হল একটা অফিসিয়াল গ্রুপ,' হ্যারি বলল। 'যাদের কাজ হল দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।'

'আর মেসেজ যেটা পাঠিয়েছে,' কিং বলল। 'সংক্ষিপ্ত। বেশ অদ্ভুত। আমরা তো এর মাথামুণ্ড কিছুই বের করতে পারিনি। তাতে রকি বীচের কথা বলা হয়েছে। পিটারের নিশ্চয় ভয় শত্রুদের হাতে পড়ে যেতে পারে তার মেসেজ। সহজ করে লিখলে ওরাও বুঝে ফেলবে।'

'ওই মেসেজের মানে করে দিতে বলছেন আমাদেরকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'দেখি তো!' দেখতে চাইল রবিন।

'হোটেলে রয়ে গেছে। ওখানেই নিরাপদ।' হ্যারি বলল, 'যেতে চাইলে এখনি নিয়ে যেতে পারি।'

দু'জনকে অনুসরণ করে ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লম্বা, কালো একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চড়ল সবাই। হঠাৎ মুসা বলে উঠল, 'কিশোর, দেখ!' রাস্তার অন্যপাশে একটা জায়গা দেখাল সে।

'কী?'

'ওই ঝোপের ভেতর কাকে দেখলাম,' মুসা বলল।

'চল তো দেখি,' কিং বলল।

সাবধানে ঝোপটার দিকে এগোল সবাই। রাস্তার কিনার থেকে শুরু করে পরের ব্লক পর্যন্ত এগিয়ে গেছে ঝোপ। পাতলা। ভেতর দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। কাউকে দেখা গেল না সেখানে। তবে ছিল যে তার প্রমাণ মিলল। একটা পোড়া সিগারেটের গোড়া পড়ে রয়েছে।

'বললাম না দেখেছি!' প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।

'জিরাতে কেউ বসে থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'সিগারেট টেনেছে।'

'হয়ত,' কিং বলল।

'তা না হলে,' নিজেকেই যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে কিশোর। 'স্যালভিজ ইয়ার্ডের ওপর নজর রাখতে আসবে কে? কিডন্যাপাররা এখনও এই এলাকায় থেকে থাকলে নিশ্চয় খবরের কাগজ দেখেছে। ভুল লোককে ধরেছিল বুঝতে পেরেছে।'

আবার ক্যাডিলাকে ফিরে এল ওরা। গাড়ি চালাল হ্যারি।

ছেলেদের দিকে ফিরে কিং বলল, 'পিটারকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। ঝোপের ভেতর যে ছিল, সে হয়ত নজর রাখেনি, কিন্তু আমার ভয় লাগছে কিডন্যাপাররা এখনও এই শহরেই আছে। সহজে হাল ছাড়বে না ওরা।'

'এগুলো আসলে এক ধরনের জেদ,' কিশোর বলল। 'নিজেরা যা ভাবে সেটাই ঠিক, অন্যদেরটা কিছু না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আর এই উগ্রপন্থী পলিটিশিয়ানগুলো তো আরও বেশি। আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না ওরা, স্যার মনটেরো ছেলেকে যতই ভালবাসুন, সবার আগে তাঁর কাছে হল দেশ। পিটারকে ধরে নিয়ে গিয়ে হুমকি দিলেই তিনি শুনতেন না, তাঁর কাজ করেই যেতেন। এমনকি পিটারকে মেরে ফেলারও হুমকি যদি দিত ওরা তিনি শুনতেন না।'

চুপচাপ শুনল তিন গোয়েন্দা, কিছু বলল না। মোড় নিয়ে সৈকতের ধারে মিরামার হোটেলের ড্রাইভওয়েতে এসে ঢুকল গাড়ি। ছেলেদেরকে নিয়ে কামরায় চলল কিং, আর হ্যারি গেল হোটেলের সেফ থেকে মেসেজটা বের করে আনতে।

মেসেজ আনা হলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কিং। টেবিল ঘিরে বসল সবাই। জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'অ্যাটাকড ইন এল. এ.। স্কেয়ারড। রকি বীচ। জাঙ্গা'স প্লেস।'

নিরাশ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।

মুসা বলল, 'কিছুই তো বলেনি!'

'এর মধ্যে সংকেতও তো কিছু দেখছি না,' বলল রবিন।

'না।' সংক্ষিপ্ত মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'শুধু শেষ দুটো শব্দ বাদে। জাঙ্গা'স প্লেস। এটার কি মানে?'

'সেটা বোঝানোর জন্যই তো তোমাদেরকে ডেকে আনলাম,' কিং বলল। 'রকি বীচের প্রতিটি গাইডবুক দেখেছি আমরা। কিন্তু জ্যাঙ্গার কথা কোথাও কিছু

লেখা নেই। ভাবলাম, এখানকার কেউ হয়ত বলতে পারবে।'

'আমি জীবনেও শুনিনি ওই নাম,' রবিন বলল।

'আমিও না,' বলল মুসা।

কিশোর শুধু নীরবে মাথা নাড়ল।

'হবে না, কিং,' হ্যারি বলল। তার কাঁধ ঝুলে পড়েছে। 'এই ছেলেগুলোও আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।'

নয়

'পারবই না,' কিশোর বলল। 'তা বলতে পারেন না।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল কিং। 'তুমি··· কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে তার ওপর হামলা আসায় ভয় পেয়ে গিয়েছে পিটার,' কিশোর বলল। 'পালিয়েছে। চলে এসেছে এখানে। রকি বীচকে লুকানোর জায়গা বেছে নিল কেন সে?'

'ইস্কুল ছুটি হলে এখানেই আসে,' হ্যারি জানাল। 'গতবার স্যার মনটেরো এসেছিলেন কয়েকটা দিন ছেলের সঙ্গে কাটাতে। তখনও দু'জনে একহপ্তা রকি বীচে থেকে গেছে।'

'তার মানে রকি বীচ তার চেনা,' চেনা শব্দটার ওপর জোর দিল কিশোর।

'চেনা হতেই পারে,' মুসা বলল। 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? গুরুত্ব কিসের?'

'আছে, মুসা, আছে। হতে পারে এখানে বিশেষ একটা জায়গা বেছেছে যেখানে লুকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেটাই ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে স্যার মনটেরোকে। জ্যাঙ্গা'স প্লেস বলে ওই জায়গাকেই বুঝিয়েছে।'

'কিন্তু,' হ্যারি বলল। 'স্যার মনটেরো বুঝতে পারেননি।'

'না পারলেও,' কিশোর বলল। 'এটাই সেই জায়গা যেখানে সে লুকিয়েছে। ওরকম কোনও জায়গার নাম নেই রকি বীচে। তার মানে ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চেয়েছে। সরাসরি বললে সবাই বুঝে ফেলত, সে জন্যে বলেনি।'

'হ্যাঁ,' মুসা মাথা ঝাঁকাল। 'উগ্রবাদীরাও দেখে যাতে বুঝতে না পারে।'

কিঙের দিকে তাকাল কিশোর। 'শব্দটা আফ্রিকান নয় তো? ওরকম কোনও শব্দ আছে আফ্রিকান ভাষায়?'

'তা আছে,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল কিং। 'একজনের নাম। নানদা উপজাতির মহান নেতা ছিলেন তিনি।'

হ্যারি বলল, '১৮৮০ সালের দিকে ইউরোপিয়ানরা যখন বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে তখন জ্যাঙ্গার সঙ্গে ভীষণ লড়াই বাধে ওদের। তিনিই নানদার শেষ নেতা, যাঁর সঙ্গে বিদেশীদের যুদ্ধ হয়। এরপর ওভাবে আর কারও সঙ্গে হয়নি। তাঁর নামের মানে অবশ্য কয়েক রকম হয়, কোন জায়গায় কি অনুবাদ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে। এই যেমন কোথাও বলতে গেলে হয় বজ্রময় মেঘ, আবার

কোথাও বৃষ্টির শব্দ।'

'এই?' হতাশ মনে হল গোয়েন্দাপ্রধানকে। 'জ্যাঙ্গার কোনও বিশেষ জায়গা ছিল? কোনও বিশেষ ঘটনা, কিংবা কোনও বিশেষ বন্ধু, যার সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায়?'

'কি বলতে চাও বুঝলাম না,' কিং বলল। 'জ্যাঙ্গা হল নানদার একটা কিংবদন্তী। অসংখ্য গল্পগাথা আছে তাঁর সম্পর্কে। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পরিচয়। বিশেষ কিছু খুঁজে বের করতে হলে কয়েক মাস লেগে যাবে।'

'অত সময় নেই আমাদের হাতে,' হ্যারি বলল। 'মাস তো দূরের কথা কয়েকটা দিনও নেই।'

'নাহ্, কোনও পথ দেখছি না,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রবিন।

'পথ তো একটা নিশ্চয় আছে,' এত সহজে হাল ছাড়ে না গোয়েন্দাপ্রধান। 'পিটার তখন মরিয়া। সুতরাং ভালমত চেনে ওরকম একটা সংগঠনের সাহায্য নিয়েছিল। ভাবতেই যেটা প্রথমে তার মনে এসেছে। কিং, জ্যাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম জরুরী জায়গা, ঘটনা, যুদ্ধের কথা বলতে পারেন? এমন কিছু, নানদার বেশির ভাগ লোকই যেটা জানে।'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল কিং। কোনটা বলবে সেটাই ভাবছে বোধহয়। অবশেষে বলল, 'ইমবালায় ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে জিতেছিলেন একবার। শেষবার পরাজিত হয়েছিলেন জিঙ্গুয়ালায়। লর্ড ফার্নউড নামে একজন জেনারেলকে পরাজিত করেছিলেন তিনি, আবার তাঁকে পরাজিত করেছিল আরেকজন জেনারেল, জেনারেল অডলি।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবুক বের করে সব লিখে নিতে লাগল রবিন।

'জ্যাঙ্গার রাজধানী ছিল উলাগায়,' হ্যারি বলল। 'পরাজিত হওয়ার পর তাঁকে গিয়ে ফোর্ট জর্জের জেলখানায় বন্দি করল ইংরেজরা।'

হ্যারির কথা কেড়ে নিয়ে যেন বলল কিং, 'সেখান থেকে পালালেন জ্যাঙ্গা। আবার লড়াই শুরু করলেন। হেডকোয়ার্টার করলেন কারগা ভ্যালির দুর্গম এক জায়গায়।'

'তারপর,' উপসংহার টানল হ্যারি। 'স্মিথস ফোর্ড নামে একগাঁয়ের কাছে লড়াইয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করলেন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত নাম এখন জোগাড় করতে হবে আমাদের। তার পর...

জোরে থাবা পড়ল দরজায়। ঝট করে একসঙ্গে সব ক'টা মাথা ঘুরে গেল সেদিকে। চেঁচিয়ে ডাকল একটা নারীকণ্ঠ, 'মিস্টার কিং! মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম! আছেন ওখানে?'

দরজার কাছে এগিয়ে গেল কিং। বলতে বলতে গেল, 'ও মিস ডলি জেসাপ। ট্রেড মিশন থেকে এসেছে। স্যার মনটেরোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করছে সে।'

'হয়ত পিটারের খোঁজ পেয়েছেন স্যার মনটেরো,' আন্দাজ করল হ্যারি।

দরজা খুলল কিং। লম্বা, কালো চুলওয়ালা এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে নেভি সোয়েটার। পরনে ধূসর স্ল্যাকস। তাড়াহুড়ো করে এসে ঘরে ঢুকল।

'ওকে পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল ডলি। 'ফোন করতে মানা করলেন। খবর দিই কি করে। স্যার মনটেরোর কাছ থেকে গোপন মেসেজ এসেছে...' হঠাৎ ছেলেদের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

'আমি বুঝিনি আপনারা একা নন,' কিংকে বলল সে।

'পিটারের সম্পর্কে কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'তার খবর পাওয়া গেছে?' হ্যারির প্রশ্ন।

'না, ওসব নয়। অফিসিয়াল মেসেজ।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিং। ছেলেদের দিকে ফিরে বলল, 'অল রাইট, বয়েজ, তোমরা তোমাদের তদন্ত চালিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিটারকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। কোনও খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে জানাবে আমাদেরকে।'

বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে ওদেরকে, বুঝতে পারল ছেলেরা। বেরিয়ে এল হোটেলের কামরা থেকে। নিচে নেমে বাস স্টপের দিকে রওনা হলো।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কোথেকে শুরু করব, কিশোর?'

'জ্যাঙ্গা। টেলিফোন বুক, ডিরেকটরি, ম্যাপ, রেফারেন্স বুক, মোটকথা যত জায়গায় ওই নামের সম্পর্ক থাকতে পারে মনে হবে সবখানে খুঁজব। ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে বেরোব আমরা। ম্যাপ খুঁজতে মুসা চলে যাও সিটি হলে। রবিন লাইব্রেরিতে। সিটি ডিরেকটরি আর টেলিফোন বুক খুঁজবে। আমি যাব হিসটরিক্যাল সোসাইটিতে।'

'খিদে পেয়েছে,' লজ্জিত হাসি হাসল মুসা। 'বাড়ি থেকে আগে লাঞ্চটা সেরে আসি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'নাহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। একটা স্ন্যাকসে ঢুকে কিছু খেয়ে নাও। তারপর চলে যাও কাজে। বিকেলের পরে হেডকোয়ার্টারে দেখা হবে।'

বাস এল। তাতে চড়ল ওরা। নোট বুক বের করে যেসব জায়গায় গিয়ে লড়াই করেছেন জ্যাঙ্গা, সেগুলোর তিনটে লিস্ট করে একেকজনের হাতে একেকটা দিল রবিন। তারপর বিশেষ বিশেষ জায়গায় নেমে আলাদা হয়ে গেল তিনজনে।

সাড়ে তিনটেয় হিসটরিক্যাল সোসাইটি থেকে বেরিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে চলল কিশোর। তেমন কিছুই পায়নি সে। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখল রবিন কিংবা মুসা ফেরেনি। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না। ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো নিয়ে বসল সে। নতুন ব্যাটারি ভরল। ফাইন টিউনিং করল। তখনও ফিরল না দুই সহকারী। শেষে ট্রেলারে ঢুকে জ্যাঙ্গার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল কিশোর।

জবাব একটা নিশ্চয় আছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জ্যাঙ্গা যেসব জায়গায় গিয়েছেন

ওগুলোর নামের মধ্যেই রয়েছে সূত্র। আর সেটা বের করতে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি পিটারকে।

রবিন আর মুসা যখন এল, তখন পাঁচটা প্রায় বাজে। ওদের গম্ভীর মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল কিশোর।

'কিচ্ছু না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বসে পড়ল রবিন।

'নামগুলো সব আফ্রিকান, কিশোর,' মুসা বলল হতাশ কণ্ঠে। 'রকি বীচে ওরকম নামের কিছু নেই।'

'আসলে সব জায়গায় চেষ্টা করিনি আমরা,' নিরাশ মনে হলো না গোয়েন্দাপ্রধানকে। 'খাওয়ার পর লাইব্রেরিতে গিয়ে জ্যাঙ্গা খুঁজব। আরও কোনও ইমপরট্যান্ট জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন যেটার কথা আমাদেরকে বলতে ভুলে গেছে কিং আর হ্যারি।'

'বাড়িতে কাজ আছে আমার,' রবিন বলল। 'মাকে কথা দিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আমারও আছে,' মুসা জানাল।

'আমার নেই,' কিশোর বলল। 'আমি একাই যেতে পারব। বই ঘাঁটাটা এমন কোনও কঠিন কাজ না।'

'কিশোর,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'মনে হয়··· মনে হয় ভুল পথে খুঁজছি আমরা।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'কি জানি!' গাল চুলকাল কিশোর। তার বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে মনে হয় দুই সহকারী। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, পিটার যা বলার বলে দিয়েছে। ওই মেসেজে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় আছে সে।'

দশ

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে শুধু খাবার খুঁটতে লাগল কিশোর। অন্যমনস্ক। রুচি নেই যেন।

'কি রে?' ব্যাপারটা নজর এড়াল না মেরিচাচীর। 'অসুখ নাকি?'

'নাহ্!' প্লেটের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। আগের রাতে ঘুম ভাল হয়নি। সকালেও তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। তার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হয়েছে, বোধহয় মুসার কথাই ঠিক। লাইব্রেরিতে নানদার ওপর একটা বই পেয়ে নিয়ে এসেছে। হেডকোয়ার্টারে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছে। পিটারকে খুঁজে বের করতে কাজে লাগে এমন কিছুই চোখে পড়েনি।

'আরে কি হলো? খাচ্ছিস না কেন? ডিম নে,' মেরিচাচী তাগাদা দিলেন। 'নাকি পেটে···'

'ঠিক আছে, দাও একটা,' প্লেট বাড়িয়ে দিল কিশোর। কিশোরের এই উদাসীনতা রাশেদ পাশারও নজরে পড়েছে। আড়চোখে তাকালেন তিনি, কিছু

বললেন না।

ভাবছে কিশোর। পিটার তার সূত্র ঠিকমতই দিয়েছে। বোঝার জন্যেই। কিন্তু কিশোর বুঝতে পারছে না। কিছু একটা মিস করছে। নাস্তা শেষ হলো। নতুন কিছুই বের করতে পারল না ততক্ষণেও সে।

এই সময় বাজল টেলিফোন। মুখও তুলল না সে। সমস্যা তার ভাল লাগে। সেগুলোর সমাধান করতে···

'কিশোর,' ডেকে বললেন মেরিচাচী। 'রবিন।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। 'বলো।'

'কিশোর, পেয়ে তো গেলে! আমাদেরকে ফোন করলে না কেন?'

'কি বললে?' চোখ মিটমিট করছে কিশোর। 'কি পেয়ে গেলাম?'

'কেন, জবাব। পিটার কোথায় লুকিয়েছে?'

'মজা করছ তো। করো।' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'সকালে এমনিতেই মেজাজ ভাল নেই আমার। হ্যারি আর কিঙের কাছে গিয়ে আলোচনা করব ভাবছি। হয়ত···'

'তার মানে পাওনি?' রবিন অবাক।

'পাইনি? কি পাইনি?'

'লাইব্রেরি থেকে যে বইটা নিয়েছ তাতে?'

'কি বলছ তুমি? নতুন কিছু তো দেখলাম না। আগাগোড়া পড়েছি।'

'তাহলে মিস করেছ। চলে এস। আমরা হেডকোয়ার্টারে বসে আছি।'

'রবিন, কী···?'

কিন্তু লাইন কেটে দিয়েছে রবিন। গেলাসের দুধটুকু না খেলে উঠতে দেবেন না মেরিচাচী। মাঝে মাঝে এটা অত্যাচার মনে হয় কিশোরের। এখন আবার একটা নতুন অত্যাচার যোগ হয়েছে, কিডন্যাপিঙের পরে, বাইরে বেরোতে গেলেই খালি সতর্ক করেন। দুই ঢোকে দুধটুকু শেষ করে ছুটে বেরোল রান্নাঘর থেকে। হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল।

'গোয়েন্দাকে সব সময় চোখকান সজাগ রাখতে হয়,' গম্ভীর হওয়ার ভান করতে গিয়ে হেসে ফেলল মুসা।

'টিটকারি রাখ তো এখন···'

বাধা দিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছ কিছু পাওনি?'

'থাকলে তো পাব,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'রবিন, বলেই দাও ওকে,' মুসা বলল।

'বেশ,' শুরু করল রবিন। 'আমরা ঢুকে দেখি তুমি নেই। টেবিলে বইটা দেখতে পেল মুসা। টেনে নিলাম। চীফ জ্যাঙ্গার ওপর লেখা চ্যাপ্টারটাতেই পেলাম ওটা।'

'কি পেলে? অত ভণিতা করছ কেন? জলদি বলো!'

বইটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল রবিন। পড়তে আরম্ভ করল, 'নানদা সর্দার জ্যাঙ্গার আশা বেড়ে গেল যখন ইমবালা, অর্থাৎ দা হিল অভ দা রেড লায়নে

ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন অন্তত তিনটে বছরের জন্যে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছেন ইউরোপিয়ানদের।' এটুকু পড়েই থেমে গেল সে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মুসাও হাসল।

হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বুঝতে পারছে না। 'তো? কি পেলে? ইমবালার কথা তো আমরা...'

'কিশোর,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। 'এখনও বুঝতে পারলে না? তোমার হয়েছে কি? দা হিল অভ দা রেড লায়ন! ইমবালার ইংরেজি মানে, লাল সিংহের পাহাড়। মনে পড়ছে না? এখানেও আছে রেড লায়ন। দা রেড লায়ন র‍্যাঞ্চ। বিখ্যাত পুরনো হোটেলটা, যেখানে হলিউডের বড় বড় অভিনেতারা ছুটি কাটাতে আসে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে হো হো করে হেসে উঠল। রবিনের পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'রবিন, কাজই করেছ একটা! ঠিক বলেছ। দা রেড লায়ন র‍্যাঞ্চ। ছেলেকে নিয়ে নিশ্চয় ওখানে থেকেছেন স্যার মনটেরো। ইস্, আমি একটা গাধা! লিখেই দিয়েছে ইমবালার মানে, অথচ আমার চোখেই পড়ল না!'

'ভুল আমরা সবাই করে থাকি,' ভারিক্কি চালে বলল মুসা।

হেসে ফেলল কিশোর। 'প্রতিশোধ নিচ্ছ, না? নাও। কিছু মনে করছি না আমি। কাজ হয়েছে এতেই খুশি।'

রবিনও হাসল।

'হ্যারি আর কিংকে ফোন করা দরকার,' কিশোর বলল।

কিন্তু কেউ ফোন ধরল না ওপাশ থেকে।

'নাস্তা করতে গেছে হয়ত,' রিসিভার রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'চল, গিয়ে ধরি। একসঙ্গেই নাহয় তখন র‍্যাঞ্চে যাওয়া যাবে।'

'তাহলে সাইকেল নেয়ার দরকার নেই,' রবিন বলল। 'সাইকেলগুলো আবার কোথায় রাখব? বাসে চলে যাই। তারপর ওদের সঙ্গে গাড়িতে।'

'গুড আইডিয়া,' মুসাও একমত।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দ্রুত বেরিয়ে পড়ল হেডকোয়ার্টার থেকে। বিশ মিনিট পরে একটা বাস ওদেরকে নামিয়ে দিল মিরামার হোটেলের সামনে। কিঙের ঘরে ফোন করল ক্লার্ক। আছে। ছেলেদেরকে পাঠিয়ে দিতে বলল কিং।

ঘরে ঢুকে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কিছু শুনেছেন আর?'

'না,' জবাব দিল কিং। 'নানদায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে আসছে। পিটারকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন স্যার মনটেরো, আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন।'

'আমরা বোধহয় এবার সাহায্য করতে পারব আপনাদের।' বই পড়ে যা আবিষ্কার করেছে সেটা খুলে বলল কিশোর।

'দা হিল অভ দা রেড লায়ন! নিশ্চয়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি। 'মনে হয়

ঠিকই আন্দাজ করেছ তোমরা।'

'বলেছিলাম না,' তার দিকে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দার প্রশংসা করে বলল কিং। 'ছেলেগুলো চালাক। জলদি চল। গাড়ি বের করতে হবে।'

পার্কিং লটে এসে বিশাল ক্যাডিলাক গাড়িটায় চড়ে বসল সবাই। ড্রাইভ করতে বসল কিং। তাকে পথ বাতলে দিতে লাগল রবিন। শহরের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে চলে এল ওরা। রেড লায়ন র‍্যাঞ্চের দোতলা বাড়িটা রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে। ওটার দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েক গুচ্ছ হলদে রঙ করা কাঠের বাড়ি আর কিছু শাদা রঙের কটেজ। পুরো অঞ্চলটাই ঘিরে দেয়া হয়েছে অলিণ্ডার আর হিবিসকাসের উঁচু বেড়া দিয়ে। গাড়ি পার্ক করে রেখে প্রধান বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।

রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে বসে আছে ধোপদুরস্ত কালো স্যুট পরা ক্লার্ক। মুখ তুলে তাকিয়ে মোলায়েম হাসি হাসল। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল হাসিটা। চিৎকার করে উঠল, 'মিস্টার টিনটন!'

ডেস্কের পেছনের দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন খাট, হালকাপাতলা লোক। গায়ে চেককাটা জ্যাকেট, পরনে ঢোলা পাজামা। কিশোরের দিকে তাকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। 'আবার এসেছ তাহলে! এবার বিল আদায় করেই ছাড়ব!'

'তারমানে পিটার মনটেরো এসেছিল!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল কিশোর, সময় মত সামলে নিল।

'আপনি ম্যানেজার?' খাটো লোকটাকে জিজ্ঞেস করল কিং।

'হ্যাঁ, আমি ম্যানেজার,' কর্কশ জবাব দিল লোকটা। কিশোরের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'ইয়াং ম্যান, এখুনি বিল মিটিয়ে না দিলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব আমি।'

'তার দরকার হবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল হ্যারি। 'টাকাটা আমরা দিয়ে দেব। একে পিটার ভাবছেন তো? ও পিটার নয়।'

'নয়?' সন্দেহ দেখা দিল ম্যানেজারের চোখে। 'তাহলে...'

'দেখতে পিটারের মতই,' বুঝিয়ে দিল কিং। 'তবে পিটার নয়। চেহারা অনেকটা এক রকম।'

'কেন, খবরের কাগজে আমার ছবি দেখেননি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে তো এই ভুল করার কথা নয়...'

মাথা নাড়ল ম্যানেজার। 'সাংঘাতিক ব্যস্ত আমরা। বিশেষ করে এই হপ্তায়। কয়েকজন মেহমান এসেছে। তাদেরকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছি। পেপার দেখব কখন।' কিশোরের দিকে তাকিয়েই রয়েছে সে। তার কুঁচকানো কমদামী পোশাক দেখছে। 'পিটারকে অবশ্য এত বাজে পোশাকে এত অগোছালো অবস্থায় দেখিনি। কিন্তু তুমি যদি পিটারই না হও, তাহলে ওরা তোমার বিল দিতে চাইছে কেন?'

'আমি আর মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম,' হ্যারিকে দেখাল কিং। 'স্যার মনটেরোর প্রতিনিধি। এই যে আমাদের আইডেনটিটি। লস অ্যাঞ্জেলেসে নানদার ট্রেড মিশন

আছে, ইচ্ছে হলে আমাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেন ওখানে। এখন বলুন, পিটারের কাছে কত পান। দিয়ে দিচ্ছি।'

একটা বিল বের করে দিল ক্লার্ক। টাকা মিটিয়ে দিল হ্যারি। ইতিমধ্যে দু'জনের আইডেনটিটি চেক করল ম্যানেজার। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কেমন যেন দ্বিধায় ফেলে দেয়।'

'বুঝতে পারছি কেন এমন লাগছে আপনার,' কিং বলল। 'আরেকটু খোলাসা করে বললেই আর দ্বিধা থাকত না। কিন্তু সেটা করতে পারছি না। অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে আমাদের। পিটার এখানে না থাকলে কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। ও এখানে আসার পর থেকে কি কি ঘটেছে দয়া করে বলবেন কি?'

দ্বিধা করতে লাগল ম্যানেজার। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, বলছি। হপ্তাখানেক আগে এসেছিল সে। এর আগেও এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। কাজেই চিনতে পেরেছিলাম। এসে বলল কয়েক দিনের মধ্যেই তার বাবা আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। বিশ্বাস করলাম। জায়গা দিলাম তাকে। দু'দিন পরে দু'জন লোক এসে বলল স্যার মনটেরোর কাছ থেকে এসেছে। পিটারের রুম নম্বর চাইল ওরা। কেউ এসে বললেই বোর্ডারদের নামধাম বলে দিই না আমরা। ওদের পরিচয় জানতে চাইলাম। তারপর পিটারকে ফোন করলাম। লোকগুলোকে ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলল সে।'

'লোকগুলো দেখতে কেমন ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ততটা ভাল মনে নেই,' ম্যানেজার বলল। 'চারদিন আগে এসেছিল ওরা। একজন বেশ গাঁট্টাগোট্টা, কোঁকড়া বাদামী চুল। আরেকজন লম্বা, পাতলা, কালো চুল। ওদের নাম মনে করতে পারছি না।'

কিশোরের দিকে তাকাল হ্যারি আর কিং। মাথা ঝাঁকাল সে। চেহারার বর্ণনায় লোকগুলোকে দুই কিডন্যাপারের মতই লাগল ওদের।

'ওরা চলে যাওয়ার পর কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'অদ্ভুত কাণ্ডই করেছে, তখন অবশ্য সে রকম মনে হয়নি। লোকগুলো ওপরে যাওয়ার একটু পরেই দেখলাম মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। মিনিট পাঁচেক পরেই লোকগুলো তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে বেরিয়ে গেল।'

'পিটারকে আর দেখেননি?' হ্যারি জানতে চাইল।

'না। আর আসেনি। বিলের টাকাও দিয়ে যায়নি।'

'আবার হারালাম,' তিক্তকণ্ঠে বলল হ্যারি।

'আমরা ভেবেছিলাম পাবই,' নিরাশ হয়েছে রবিনও।

চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। 'ওর ঘরটা দেখতে পারি?'

কী বক্সের দিকে তাকাল ম্যানেজার। 'খালিই আছে।' হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে আনল। 'উনত্রিশ নম্বর ঘর। দোতলায়। সামনের দিকে। ডানের এলিভেটর দিয়ে উঠতে পার। কিংবা এলিভেটরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে।'

এলিভেটরের দিকে এগোতে এগোতে মাথা নাড়ল কিং, যেন বিশেষ ভরসা করতে পারছে না। 'কিশোর, ওর ঘর দেখে কি হবে? ওখানে তো নেই। একটা

আশাই করতে পারি এখন শুধু, আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'লোকগুলোকে সন্দেহ করেছিল, বোঝাই যায়,' জবাব দিল কিশোর। এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে। বোতাম টিপে দিয়ে বলল, 'তা না হলে ওভাবে হোটেল থেকে পালাত না। নিশ্চয় লোকগুলোকে চিনতে পেরেছিল, শত্রু হিসেবে। দেখেই আবার পালিয়েছে। লোকগুলো হয়ত তখনও তার ঘরেই ঢোকেনি।'

'তাতে আমাদের কি লাভ?' হ্যারির প্রশ্ন।

'সে আশা করছিল, তার মেসেজ পেয়ে স্যার মনটেরো ছুটে আসবেন হোটেলে। পালানোর আগে নিশ্চয় আবার ভেবেছিল সে কোথায় যাচ্ছে তার একটা নির্দেশ রেখে যাওয়া দরকার। কোনও একটা মেসেজ। কিংবা কোনও সূত্র।'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রওনা হলো পিটারের ঘরের দিকে। সকলের মনেই আশা, ছোট্ট একটা মেসেজ অন্তত রেখে যাবে পিটার।

এগারো

ঘরে পা দিয়েই গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'কিশোর, সব সাফ করে ফেলা হয়েছে।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তাকাল বিশাল ঘরটায়। জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সেটা দিয়ে হোটেলের সামনের দিকের ড্রাইভওয়ে আর ট্যাক্সি পার্ক করার জায়গা দেখা যায়। তারপরেও বহুদূরে দৃষ্টি চলে যায়, একেবারে নীল প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।

'কিছু রেখে গেলেও আর পাওয়া যাবে না সেটা,' রবিন বলল।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিং। 'কিশোর, লাভ হবে না। নোটফোট কিছু রেখে গেলে নিশ্চয় ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিয়েছে ঝাড়ুদার।'

'হয়ত,' স্বীকার করল কিশোর। 'তার পরেও কথা আছে। ঝাড়ুদাররা ঠিকমত ঝাড়ু দেয় না অনেক সময়। তাছাড়া আমার মনে হয় না এত সাধারণ কিছু রেখে গেছে পিটার যেটা সহজেই ফেলে দেয়া যায়। সহজে চোখে পড়ে এমন কিছু রেখে গেছে বলেও মনে হয় না। কারণ সে জানে কিডন্যাপাররা খুঁজতে পারে। তাহলে ওরা দেখে ফেলবে। না, অত সহজ কিছু রেখে যায়নি সে। সাংকেতিক কিছু রেখে গেছে। এমন কিছু যা স্যার মনটেরোর বন্ধুরা চিনতে পারবে, শত্রুরা নয়। কাগজের ওপরও লিখে রেখে যেতে পারে, কিংবা অন্য কিছুতে।'

'তুমি বলতে চাইছ,' রবিন বলল। 'খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে এমন কিছু করেছে, যা ঘর থেকে সরানো যাবে না। কিডন্যাপারদের নজরে পড়বে না। অথচ তার বন্ধুদের চোখে ঠিকই পড়বে।'

'হ্যাঁ, সে রকমই কিছু।'

'এসো, তাহলে বের করে ফেলি,' কিং বলল।

বাথরুমে খুঁজতে চলে গেল মুসা। অন্যেরা রইল শোবার ঘরেই। ওপরে নিচে, জিনিসপত্র যা আছে সব সরিয়ে, ছবির পেছনে, পর্দার আড়ালে, কার্পেটের নিচে, সব জায়গায় দেখা হতে লাগল। রেডিয়েটরের নিচে আর ছাতের আলোর শেড

দেখা হলো। গদির কাভার সরিয়ে দেখল কিশোর, পিটার কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা। কিছুই পাওয়া গেল না। এমন কিছু দেখা গেল না যেটাকে মেসেজ কিংবা সূত্র মনে হয়।

'বেশি সহজ জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি আমরা,' কিশোর বলল অবেশেষে। 'প্রথম মেসেজটাতে ডাবল কোড ব্যবহার করেছিল পিটার। জ্যাঙ্গা'স প্লেস বলে বুঝিয়েছে ইমবালা। এবং ইমবালা বলে লাল সিংহের পাহাড় বোঝাতে চেয়েছে সে। এখানেও সে রকম কিছু করে রেখে যেতে পারে।'

'এবং সেটার সমাধান করতে পারবে,' যোগ করল রবিন। 'ও ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান আছে শুধু যাদের, তারাই।'

'রাইট। তার মানে পিটারকে খুঁজে বের করতে হলে কিছু বিশেষ ব্যাপারে জ্ঞান থাকতেই হবে। সেটার ওপরই নির্ভর করছে সব। কিং, পিটারের কি কোনও বিশেষ স্বভাব ছিল? কোনও কিছুতে আগ্রহ? উদ্ভট কোনও আচরণ?'

'নানদার ইতিহাসের ওপর তার অসম্ভব আগ্রহ ছিল,' হ্যারি জানাল।

'কাঠের ওপর খোদাই করা আফ্রিকান শিল্পও সংগ্রহ করত সে,' কিং বলল। 'ছোট ছোট স্কেচ করতে পছন্দ করত। বিশেষ করে দেয়ালে। স্যার মনটেরো একবার রাগ করে বলেছিলেন তাঁর অফিসের দেয়ালে পর্যন্ত আঁকাআঁকি করেছে পিটার।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'দেয়ালে স্কেচ আঁকলে সহজে সেটা মোছা যাবে না, নতুন করে রঙ না করলে। আর কোনও হোটেলের ঘরেই অত তাড়াতাড়ি রঙ করা হয় না। এটাই খুঁজতে হবে আমাদের। এই, খোঁজো খোঁজো সবাই।'

কিন্তু এবারেও কিছু পাওয়া গেল না। দেয়ালে কোনও স্কেচ নেই। এমনকি আসবাবপত্রেও নেই কিছু, কোনও চিহ্নও নয়। কিছুই আঁকেনি।

'কিশোর, কিছুই নেই এখানে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'আমার বিশ্বাস, কিডন্যাপারদের দেখার পর এখানে কিছু করার সময়ই পায়নি পিটার।'

চরকির মত পাক খেয়ে মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। 'ঠিক, ঠিক বলেছ, মুসা! এটাই জবাব!'

'মানে?' মুসা অবাক। 'কি এমন বললাম?'

'পিটার খুব চালাক ছেলে,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'অথচ ম্যানেজারকে বলল লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিতে, বাইরের লোক সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও। সে তখন পালিয়ে রয়েছে। লোকগুলো শত্রু না বন্ধু জানে না। কিন্তু তবু ম্যানেজারকে বলল পাঠাতে। আমরা হলে বলতাম কি?'

'না,' জবাব দিল রবিন। 'ম্যানেজারকে বলতাম ওদেরকে আটকাতে। যাতে লুকিয়ে ওদের চেহারা একবার দেখতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নিশ্চয়। পিটারও দেখেছিল। জানালা দিয়ে। তবে সেটা কাকতালীয় ভাবেই। সে তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল হয়ত। যাই হোক, লোকগুলোকে আটকাতে বলেনি ম্যানেজারকে। প্রয়োজন মনে করেনি। ওদেরকে বুঝতে দিতে চায়নি যে একটা প্ল্যান সে ইতিমধ্যেই করে বসে আছে।'

'প্ল্যান?' ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'কি প্ল্যান?'

'সব চেয়ে সহজ প্ল্যান, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়া। এমন কোথাও যেখান থেকে লোকগুলোর ওপর চোখ রাখতে পারে। লোকগুলো শত্রু এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পালাতে পারে ওখান থেকে। এসো।'

কিশোরকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

'বেরোনোর পথের কাছেই কোথাও হবে,' নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে কিশোর। 'যেখান থেকে লোকগুলোর ওপর নজর রেখেছে সে। এমন কোথাও...' হলওয়েতে নজর বোলাচ্ছে সে। 'ওই আলমারিটার মত কোনও জায়গা।'

লম্বা, সরু একটা দেয়াল আলমারি। সিঁড়ি থেকে কয়েক ফুট দূরে। পর্দা আর বিছানার চাদরটাদরগুলো বোধহয় রাখা হয় ওখানে। ভেতরে ঢুকে দরজা সামান্য ফাঁক করে রাখলেই এলিভেটর আর সিঁড়ির ওপরের অংশ চোখে পড়বে। যে কেউ এসে পিটারের ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাকে দেখা যাবেই ওখান থেকে।

'পেন্সিলে আঁকা স্কেচ খোঁজ,' নির্দেশ দিল কিশোর।

একবার তাকিয়েই দেখে ফেলল মুসা। আলমারির দরজার ভেতর দিকে। 'এই যে! খাইছে! দারুণ এঁকেছে তো! একটা গাড়ি। ভেতরে ড্রাইভারও আছে। পাশে ব্যাজের মত কি যেন আঁকা। ওপরেও আছে।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'গাড়ি? গাড়ি এঁকে কি বোঝাতে চেয়েছে?'

'সাধারণ গাড়ি নয়, কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'দেখ, ড্রাইভারের মাথায় ক্যাপ আছে। আর হাতে একটা বাতির মত। তার মানে ট্যাক্সি!'

কিং বলল, 'একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড তো রয়েছেই হোটেলের সামনে।'

'সে বোঝাতে চেয়েছে,' হ্যারি আন্দাজ করল। 'সব লোকের ওপরই নজর রেখেছিল সে। আর ট্যাক্সিতে করে পালানোর প্ল্যান করেছে।'

বাইরের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে একটা মাত্র ট্যাক্সি দেখা গেল। ম্যাগাজিন পড়ছে ড্রাইভার। ওকে জিজ্ঞেস করা হলো। না, চারদিন আগে কোনও কিশোরকে নিয়ে যায়নি সে এখান থেকে। তার আগেও নেয়নি, পরেও না।

'ক'টা ট্যাক্সি আছে এখানে?' হ্যারি জানতে চাইল।

'অনেক, মিস্টার। তবে সবই আমাদের কোম্পানির। একটাই কোম্পানি।'

'তোমাদের মেইন গ্যারেজটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিং।

বলে দিল ড্রাইভার। তার কথা মত ট্যাক্সি কোম্পানির সেন্ট্রাল গ্যারেজে চলে এল হ্যারি। বন্দরের কাছাকাছি। বিরাট এক কাঠের আড়তের পাশ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। গ্যারেজের পেছন দিকে রয়েছে অফিস। সেখানে এসে দিনের বেলা ডিউটি যে ম্যানেজারের তাকে পেল গোয়েন্দারা। কি চায়, বলল তাকে। একটা তালিকা দেখতে শুরু করল ম্যানেজার।

'রেড লায়ন? চারদিন আগে? হ্যাঁ, সেদিন পাঁচজন ড্রাইভার ডিউটি দিয়েছে ওখানে। দু'জন এখন এখানেই আছে। রড আর হেগ। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

তার ট্যাক্সির ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছে হেগ। চারদিন আগে কোনও

কিশোরকে কোথাও নিয়ে যায়নি সে।

রডকেও পাওয়া গেল। অলস ভঙ্গিতে বসে কফি খাচ্ছে। সে জানাল, 'হ্যাঁ, একটা ছেলেকে রেড লায়ন থেকে নিয়ে গিয়েছি।' সরাসরি তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমাকেই তো। জিজ্ঞেস করছ কেন আবার? দু'দিন পরই তোমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, ঠিক না? পত্রিকায় বেরিয়েছে, দেখেছি। ব্যাপারটা কি বল তো…!'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকেই। তবে আপনি যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সে আমি নই। ভাল করে তাকান তো আমার দিকে। দেখুন আলাদা করে চিনতে পারেন কি না।'

ভাল করেই তাকাল লোকটা। 'ওই ছেলেটার মতই লাগছে। শুধু পোশাকের ব্যাপারটা আলাদা। সে অনেক বেশি ফিটফাট ছিল তোমার চেয়ে। তাহলে তুমি বলতে চাইছ তুমি সেই ছেলে নও?'

কিশোর জবাব দেবার আগেই হ্যারি জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন মনে আছে?'

'নিশ্চয় আছে,' মাথা ঝাঁকাল রড। 'মনে আছে তার কারণ আজব আচরণ করছিল ছেলেটা। মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটাচ্ছে। হোটেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। আমাকে বলল শহরের আরেক ধারে নিয়ে যেতে। নিয়ে চললাম। বার বার পেছনে তাকাতে লাগল সে। যেন ভূতে তাড়া করেছে। একবার মনে হলো, হোটেল থেকে কিছু চুরি করেনি তো? কিন্তু চোর মনে হলো না। তবে পালিয়েছে যে তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না আমার। শেষে গাড়িটা…'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিং।

'বলছি বলছি। কেবলই পেছনে তাকাচ্ছিল। সারা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল আমাকে। হঠাৎ থামতে বলল। কতগুলো গুদাম আর কারখানার মাঝখানে। আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে নেমে গেল। দৌড় দিল গলি দিয়ে। টাকা বেশিই দিয়ে ফেলেছিল আমাকে, ভাঙতি নেয়ার জন্যেও থামেনি। তারপর এল গাড়িটা, যেটার কথা বলছিলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। মনে হলো ছেলেটারই পিছু নিয়েছে।'

'কি গাড়ি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সবুজ মার্সিডিজ। ভাল গাড়ি। ওরকম একটা গাড়ি পেলে আর কিছু চাইতাম না…'

'যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেটাকে, আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন সেখানে? ভাল পয়সা দেব,' হ্যারি বলল।

'পারব না কেন। নিশ্চয় পারব।'

জায়গাটা গ্যারেজ থেকে বেশি দূরে না। শহরের একধারে কতগুলো গুদাম আর কারখানা বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্জন এলাকা। গুদামগুলোতে লোক আছে বলে মনে হয় না। আর কারখানাও ছোট ছোট, টুকিটাকি জিনিস তৈরি হয়। বেশির ভাগই খালি অঞ্চল, বাড়িঘর কিছু নেই। দুটো বাড়ির মাঝের একটা গলি

দেখাল ড্রাইভার, 'ওদিক দিয়েই গেছে।'

লোকটার ভাড়া মিটিয়ে দিল কিং। অনেক বেশিই দিল। মোড়ের কাছে ক্যাডিলাকটা রাখল হ্যারি।

'এখানে আসতে গেল কেন?' মুসার প্রশ্ন। নির্জন এলাকাটায় চোখ বোলাচ্ছে।

'কিডন্যাপারদের খসাতে চেয়েছে হয়ত,' রবিনের অনুমান। 'নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল ওরা তাকে অনুসরণ করছে।'

'তা হতে পারে,' কিশোর বলল। 'লুকানোর আরেকটা জায়গা খুঁজছিল হয়ত। প্রচুর ঘোরপ্যাঁচ রয়েছে এমন কোথাও। চল, গলিটা দেখি। দেখা যাক আর সূত্র আছে কিনা।'

সরু গলি। দু'ধারে ইঁটের দেয়াল। তিনটে দরজা দেখা গেল। সবগুলোতে বড় বড় তালা ঝোলানো। মরচে পড়া। বেশ কিছুদিন যে খোলা হয়নি বোঝা যায়। গলির শেষ মাথায় চলে এল গোয়েন্দারা, বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না।

'এবার?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি করব?'

সামনে আরেকটা গলি। যেটাতে রয়েছে ওরা ওটারই মত দেখতে। দু'পাশে গুদামঘর, ছোট ছোট কারখানা, আর প্রচুর শূন্য জায়গা, যেখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে জঞ্জাল। ওই গলির একমাথা দিয়ে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে আড়াআড়ি, ইংরেজি 'টি' অক্ষর তৈরি করে।

'তিন দিকে যেতে পারে সে,' হ্যারি বলল। 'যে কোনও তিনদিক। কোন পথে যে গেছে ঈশ্বরই জানে!'

বারো

'যেদিকেই যাক,' কিশোর বলল। 'কোনও একটা দিকে তো গেছে। একবারে সব দিকেই যেতে পারে না।'

'কি বলতে চাও?' রবিনের প্রশ্ন।

'কিডন্যাপাররা তার পিছু লেগেছিল। সে সেটা জানত। বেশি দূর যাওয়ার উপায় ছিল না তার। সময়ই ছিল না। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে পড়তে হয়েছে।'

'তা ঠিক,' একমত হলো কিং। 'এখন আমাদের কাছেই কোথাও রয়েছে কিনা কে জানে!'

'ওগুলোর যে কোনও একটাতে লুকাতে পারে।' কয়েকটা গুদামঘর দেখাল কিশোর। 'কিন্তু এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। তাছাড়া খাবার দরকার। এখানে তা নেই। তার মানে এখানে লুকালেও কিছুক্ষণের জন্যে, সাময়িক। তারপর একটা মোটেল কিংবা রুমিং হাউস খুঁজে নিয়েছে। রাস্তায় থাকাও তার জন্যে নিরাপদ নয়।'

'তাহলে,' হ্যারি প্রস্তাব দিল। 'ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করা দরকার আমাদের। ভাগ হয়ে তিনদিকে চলে যাই।'

মুসা আর হ্যারি গেল ডানে। কিশোর আর কিং বাঁয়ে। রবিন সামনের দিকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার টি-এর মাথার কাছে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিল।

সবার আগে ফিরে এল রবিন। সোজা এগিয়ে গিয়েছিল গলি ধরে। একটা মাঠের কিনারে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা।

ধারেকাছে কোনও মোটেল কিংবা রুমিং হাউস চোখে পড়েনি। লাঞ্চটাইম হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে তার। অস্থির হয়ে অন্যদের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল সে।

তারপর এল কিশোর আর কিং।

'কাছেই বড় রাস্তা, মোটর চলাচল করে,' কিং জানাল। 'ওখান থেকে পাঁচ ব্লক দূরে একটা মোটেল আছে। সেখানে খোঁজ নিয়েছি। এক হপ্তার মধ্যে কোনও কিশোরকে ঘর ভাড়া দেয়নি ওরা। কিশোরকে চিনতে পেরেছে। খবরের কাগজে তার ছবি দেখেছিল।'

'বেশির ভাগই খালি জায়গা ওদিকে,' কিশোর জানাল। 'মাঠ আর পতিত জমি।'

অবশেষে ফিরে এল মুসা আর হ্যারি। ওরা অনেক দূর গিয়েছিল।

'একটা মোটেল আর দুটো রুমিং হাউস পেয়েছি,' মুসা বলল। 'কোনটাতেই কোনও কিশোর একা বাস করছে না।'

'পিটার যখন পালাচ্ছিল, তার পায়ে পায়ে লেগেছিল কিডন্যাপাররা,' কিং বলল ধীরে ধীরে। 'সূত্র রেখে যাওয়ার সামান্যই সুযোগ পেয়েছে সে। আর আমরা তার মেসেজ পাব এমন আশাও নিশ্চয় করেনি। নাহ্, কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

'আপাতত সে রকমই লাগছে,' ব্যর্থ হয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কিশোর।

'আমি আর হ্যারি হোটেলে ফিরে যাই,' কিং বলল। 'দেখি লস অ্যাঞ্জেলেসে কোনও খবর পাঠিয়েছে কিনা পিটার। আমরা যে তাকে খুঁজছি, এটা বুঝতে পারছে সে। নিশানা হারিয়ে ফেলেছি এটা পারছে কিনা জানি না। তাকে সেটা কোনভাবে বোঝান দরকার। যাতে আরেকটা মেসেজ পাঠায়।'

'যদি সম্ভব হয় আরকি,' তেমন আশা করতে পারছে না হ্যারি।

'আমরা হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর। 'নতুন কোনও বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করব। স্যালভিজ ইয়ার্ড এখান থেকে বেশি দূরে না। কিং, আপনি কি আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবেন?'

'আরিব্বাবা, এত্ত দেরি হয়ে গেছে!' ঘড়ি দেখে প্রায় আঁতকে উঠল যেন মুসা। 'তাই তো বলি, পেটের ভেতর ছুঁচো দৌড়াদৌড়ি করে কেন?'

তিন গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দিল কিং আর হ্যারি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হেডকোয়ার্টারে কিশোরের সঙ্গে দেখা করবে বলে চলে গেল মুসা ও রবিন।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে পারল না। বাড়িতে কাজ পড়ে গিয়েছিল। আসতে আসতে দুই ঘণ্টা লেগে গেল দু'জনেরই। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখে ডেস্কের ওপর

রাজ্যের ম্যাপ ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে গোয়েন্দাপ্রধান। স্ট্রীট ম্যাপ। অসংখ্য কাগজ ছড়ানো টেবিলে। স্কেচ করেছে, নানা রকম হিসেব করেছে ওগুলোতে কিশোর।

'কিছু বুঝলে?' ঢুকেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না।'

'কিং ফোন করেছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পিটার?'

'আমিই ফোন করেছিলাম হোটেলে,' জবাব দিল কিশোর। 'না, কোনও খবর পাঠায়নি পিটার।'

'কিশোর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল। 'বোধহয় ওকে ধরে ফেলেছে কিডন্যাপাররা। খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে ভুল বুঝতে পেরেছিল। তারপর খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছে আসল ছেলেটাকে।'

'সেকথাও ভেবেছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। 'ধরতে তো পারেই। তবে আমার তা মনে হয় না। তাহলে স্যার মনটেরোকে মেসেজ পাঠাত। আরেকটা ব্যাপার, আমাদের ওপর নজর রাখত না। তখন ঝোপে বসে রেখেছিল, মনে নেই?'

ঢোক গিলল মুসা। 'তার মানে এখনও বসে আছে কোনখানে?'

'আমার তা-ই মনে হয়। হ্যারি আর কিঙের ওপরও নজর রাখছে ওরা। সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। তবে পিটারকে যতক্ষণ খুঁজে বের করতে না পারছি ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিছু করবে না আমাদেরকে।'

'আরেকটা কথা ভাবছ না কেন?' রবিন বলল, 'কিশোরের কিডন্যাপিঙের খবর পিটারও তো পড়ে থাকতে পারে। এটাই তার সুযোগ, বেরিয়ে এসে পুলিশকে গিয়ে জানানো। জানাচ্ছে না কেন? পুলিশ তাকে সাহায্য করবে তখন। নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবে।'

'তাই তো!' মুসা বলল।

'তাহলে ধরে নিতে হবে পেপার দেখেনি পিটার,' কিশোর বলল। 'এমন কোথাও লুকিয়েছে যেখানে কাগজ নেই। বেরিয়ে আসতেও সাহস করছে না। সেই জায়গাটা যে কোথায় সেটা বুঝতে পারলেই হত!'

'এত ভাবনা চিন্তা করেও কিছু বের করতে পারলে না?'

'ভাবছি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। সাংকেতিক ভাষায়, যাতে শুধু পিটার বুঝতে পারে। হ্যারি আর কিঙের সঙ্গে কোথাও দেখা করতে বলব তাকে। কিন্তু সেই একই সমস্যা রয়ে যাবে এতেও। খবরের কাগজ দেখার সুবিধেই যদি না পায় সে?'

'না, হবে না,' রবিন বলল।

'তাহলে ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে দেখতে পারি। রকি বীচের এত ছেলেমেয়ের মাঝে কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে কথায় অদ্ভুত টানওয়ালা একটা ছেলেকে।'

'তাতেও বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না,' রবিন বলল। 'লুকিয়েই যদি

থাকে, বেরোতে না পারে, কথা বলবে কিভাবে ছেলেদের সঙ্গে?'

'তাছাড়া,' মুসা যোগ করল। 'তাকে তুমি মনে করে ভুল করতে পারে রকি বীচের ছেলেরা।'

'এটাই হলো সমস্যা,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'যাকগে, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর ভূত-থেকে-ভূতে ছাড়া উপায় নেই। এখন আরেকটু ভেবে দেখা যাক। পিটার নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যারা তাকে খুঁজছে তারা তার চারদিন আগে রেখে আসা নিশানা হারিয়ে ফেলেছে। শেষ চিহ্নটা রেখে এসেছে রেড লায়ন র‍্যাঞ্চে। সুতরাং...'

'আবার সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'করবে। লুকিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে। সে জন্যে নজর রাখতে বলেছি হ্যারি আর কিংকে। হয়ত এতক্ষণে ওখানে চলে গেছে ওরা। আর, আরেকটা কথা।'

'কী?' জানতে চাইল রবিন।

'মনের ভেতর একটা কথা কেবলই খচখচ করছে। আমাকে আবিষ্কার করল কিভাবে কিডন্যাপাররা? পিটার বলে ভুলই বা করল কেন?'

'সহজ,' সমাধান করে দিলে মুসা। 'তোমাকে ইয়ার্ডে দেখেছে ওরা।'

'এখানে আসল পিটার না এসে থাকলে?'

'হয়ত রাস্তায় কিংবা বাজারে দেখেছে তোমাকে,' রবিন বলল। 'তারপর পিছু নিয়ে চলে এসেছে।'

'হ্যাঁ,' রবিনের সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। 'এটা তো হতেই পারে। ব্যাপারটাকে কাকতালীয় ভেবেছে ওরা। তোমাকে হঠাৎ দেখে ফেলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করেছে।'

'যুক্তি আছে তোমাদের কথায়,' ঠিক মেনে নিতে পারছে না কিশোর। 'তবু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে জরুরী কিছু মিস করছি আমরা। নিশ্চয় ওই লোকগুলো এমন কিছু পেয়েছে, যা থেকে এখানে এসে খুঁজে বের করেছে আমাকে। রাস্তায় কিংবা বাজারে অ্যাক্সিডেন্টলি দেখে ফেলেনি।'

'সেটা কি, কিশোর?'

'জানি না।'

নীরব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ভাবছে। অনেক ভেবেও কিছু বের করতে পারল না। শেষে বাড়ি ফিরে গেল রবিন আর মুসা। দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ভাবতে ভাবতে এসে লিভিং রুমে ঢুকল কিশোর। টিভি দেখছেন রাশেদ পাশা। সে-ও বসে পড়ল। একটা কাজ দিলেন তাকে রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডের অ্যাকাউন্ট বুকে কি একটা গোলমাল হয়েছে, হিসেবের, সেটা মিলিয়ে দিতে হবে। ডিনারের সময় হল। টেবিল সাজিয়ে ডাকতে এলেন মেরিচাচী।

বিরক্তিকর, নিরাশায় ভরা একটা দিন কেটেছে। কিন্তু খেতে বসে কিশোর দেখল, সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে। বেশ খেতে পারছে। এক প্লেট শেষ করে আবার বাড়িয়ে দিয়ে হাসল, 'তোমার গরুর কাবাবটা খুব ভাল হয়েছে, চাচী।'

অবাক হলেন মেরিচাচী। 'তোর কি হয়েছে আজ, বল তো কিশোর? এভাবে

তো খেতে চাস না কখনও! আজ আমার ফ্রিজটাই খালি করে দিয়েছিস!'

কিশোরও অবাক। 'আমি খেয়েছি! ছিলামই তো না সারাদিন, খেলাম কখন?'

'ওই যতক্ষণই ছিলি। খেয়েছিস ভাল করেছিস। আমিও তো চাই তুই খা...'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন মেরিচাচী। গোল গোল হয়ে গেছে তার চোখ। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

'এই কিশোর, কি হলো?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন রাশেদ পাশা। 'শরীর খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না...না...চাচা, আমি ভাল আছি...এত ভাল অনেকদিন থাকিনি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আসছি!'

'আরে খেয়ে যা না!' ঠেকাতে গেলেন মেরিচাচী।

রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে কিশোর। 'মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না।'

দ্রুত এসে লিভিং রুমে ঢুকল সে। রবিনকে ফোন করল। 'নথি? জলদি মুসাকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে এস। মাকে বলে আসবে সারারাত বাড়ি ফিরবে না। আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

রবিনকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। ফিরে এল রান্নাঘরে, খাবার টেবিলে। এত উত্তেজিত হয়ে গেছে, খিদেই নষ্ট হয়ে গেছে। মেরিচাচীর বিখ্যাত অ্যাপল পাইয়ের টুকরো দুটোর বেশি খেতে পারল না আর। তারপর চাচীর ভয়ে কোনমতে জোর করে এক গেলাস দুধ গিলে নিয়ে উঠে পড়ল। বেরিয়ে চলে এল ঘর থেকে। দ্রুত এগোল ট্রেলারের দিকে।

পনেরো মিনিট পর দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল রবিন আর মুসা। দেখল, ডেস্কে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোর পাশা। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

'কি ব্যাপার?' রীতিমত হাঁপাচ্ছে রবিন। জোরে জোরে প্যাডাল করে সাইকেল চালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

'সারা রাত থাকতে হবে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কারণ,' নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পিটার মনটেরো কোথায় লুকিয়ে আছে, জানি আমি।'

তেরো

'কোথায়?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'কি করে জানলে?' মুসাও না চেঁচিয়ে পারল না।

'সারাক্ষণ আমাদের নাকের নিচেই রয়েছে,' জবাব দিল কিশোর। 'অন্ধ হয়ে ছিলাম আমরা! বলেছি না একটা কিছু মিস করেছি। রাস্তায় দেখে আমাকে ফলো করে এখানে এসে হাজির হয়েছে কিডন্যাপাররা, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কারণ, তাহলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত পালানোর চেষ্টা করছি না আমি।

লুকানোরও চেষ্টা করছি না। তোমাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশছি, রকি বীচের আর দশটা ছেলের মত। আমাকে কথা বলতেও শুনে থাকতে পারে। কথায় যে টান নেই এটা বুঝতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে না। ভুল ওরা করত না।'

'কিন্তু কিশোর,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'ভুল ওরা ঠিকই করেছে।'

'করেছে। এবং সেটাই হলো জবাব। কারণ ওরা আমাকে এমন জায়গায় দেখেছে যেখানে পিটারকে আশা করেছিল। ওখানেই খুঁজছিল তাকে।'

'খুঁজছিল?' হাঁ হয়ে গেছে রবিন।

'হ্যাঁ, নথি। ট্যাক্সি থেকে নেমে বেশি দূর যেতে পারেনি পিটার। লুকিয়ে পড়তে হয়েছে। এমন জায়গায়, যেখানে গত ক'দিন ধরে খাবার চুরি যাচ্ছে।' চকচক করছে কিশোরের চোখ। 'পিটার আমাদের নাকের নিচে এই ইয়ার্ডেই লুকিয়ে আছে!'

'ই...ই...ইয়ার্ডে!' তোতলাতে শুরু করেছে মুসা।

'যেখান থেকে সে গায়েব হয়েছে সেখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ইয়ার্ড,' বোকা হয়ে গেছে যেন রবিন। 'মুসা, সেদিন তোমার খাবার ইঁদুরে খায়নি। পিটার খেয়েছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালাতে গিয়ে এই ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছিল সেদিন পিটার। এখানে এত বেশি জঞ্জাল, লুকানোর জায়গার অভাব নেই। কাজেই এখানেই থাকবে ঠিক করেছিল সে। খাবার চুরি করাও এখানে সহজ। প্রায় সারাটা দিনই রান্নাঘর খালি পড়ে থাকে। কিডন্যাপাররা তাকে ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেছে, কিংবা দেখেনি, যা-ই হোক, ওরা আশপাশে ঘুরঘুর করেছে। আমাকে দেখেই মনে করেছে আমি পিটার। আর কিছু বোঝার অপেক্ষা করেনি। পয়লা সুযোগটা পেয়েই ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'সারাক্ষণ এই ইয়ার্ডেই রয়েছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও মুসা।

'তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এখন আমাদের কাজ ওকে খুঁজে বের করা।'

'খুঁজব আর কি? বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে নাম ধরে ডাকি, বেরিয়ে চলে আসবে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, তাতে কাজ হবে না। আমাদেরকে চেনে না সে। হয়ত দূর থেকেই দেখেছে শুধু। লুকিয়েছে ভালমতই। হ্যারি আর কিংকেও নিশ্চয় দেখেনি, তাহলে বেরিয়ে আসত। আমরা চেঁচাতে শুরু করলে আবার ভয় পেয়ে গিয়ে পালাতে পারে। তার চেয়ে খুঁজেই বের করি।'

'এই জঞ্জালের মাঝে সেটাও সহজ না। কিশোর, অপেক্ষা তো করতে পারি আমরা। বেরোতে তাকে হবেই, এক সময় না একসময়। সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।'

'না, তা পারবে না। থাকবেও না। কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেই বেরিয়ে চলে যাবে, সম্ভবত রেড লায়নে। ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। তবে তার আগে পর্যন্ত লুকিয়েই থাকবে। সেটা কত দিন ঠিক বলা যায় না।'

'তাহলে কি করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'একটা বুদ্ধি করেছি। আমার বিশ্বাস, শুধু রাতের বেলাতেই বেরোয় পিটার। যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে। সব কিছু শান্ত থাকে।'

'সে জন্যেই সারারাত থাকতে বলেছ,' বুঝতে পারল মুসা।

'হ্যাঁ।'

'একটা ফাঁদ পাততে পারি না?' রবিন বলল, 'পেতে অপেক্ষা করে বসে থাকব।'

'বুদ্ধিটা সেটাই। খাবারের দরকার হলেই কেবল বেরোয় পিটার। চালাক ছেলে। যতটা দরকার তার চেয়ে কম নেয়, যাতে ব্যাপারটা কারও নজরে না পড়ে। মেরিচাচীর কড়া নজর তার পরেও এড়াতে পারেনি। তবে চাচী ভেবেছে পরিবারেরই কেউ খেয়েছে। ফাঁদ পাততে অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'খাবারের ফাঁদ,' মুসা বলল।

'ইয়ার্ড নীরব হলেই বেরিয়ে আসবে সে,' বলল কিশোর। 'বাইরে বেরিয়ে প্রচুর কথা বলব আমরা।'

'কোন বিষয়ে?'

'যেন বাইরে চলে যাচ্ছি আমরা। কাল রওনা হব। তিনটে প্যাকেট লাঞ্চ তৈরি করে রাখতে হবে সে জন্যে। ওগুলো রান্নাঘরে না রেখে রাখব পাশের বারান্দায়। যাতে সকালে সহজেই নিতে পারি। কথাগুলো তার কানে যাবেই এমন না-ও হতে পারে। তবে যেতেও পারে। সে জন্যেই বলব।'

'বুঝলাম। তিনটে প্যাকেটে অনেক সময় পার করতে পারবে সে। কাজেই লোভী হয়ে উঠবেই। আকর্ষণটা এড়াতে পারবে না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভাববে, আমরা কিছু বুঝতে পারব না। ইঁদুরকে দোষ দেব, কিংবা কোনও ভবঘুরেকে। রাত দশটায় ইয়ার্ড থেকে সরে যাব আমরা। খাবারের তিনটে প্যাকেট রেখে চলে যাব শোবার ঘরে। দু'জন ঘরেই থাকব। আরেকজন পা টিপে টিপে নেমে চলে আসব নিচে। রান্নাঘরে বসে নজর রাখব বারান্দার দিকে, যেখানে টেবিলে খাবারগুলো রাখব। দুই ঘণ্টা পর পর পালা করে পাহারা দেব আমরা।

'ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো সঙ্গে রাখতে হবে। পিটারকে দেখলেই সঙ্কেত দেব অন্য দু'জনকে। যদি ঘুমিয়েও পড়ি, জোরাল সঙ্কেত জাগিয়ে দেবে আমাদেরকে।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দৌড় দেব দু'জনেই। দু'দিক থেকে গিয়ে পিটারের পালানোর পথ বন্ধ করে দেব। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে তাকে। যাওয়ার একটাই পথ থাকবে তার তখন। সামনের দিক। গেট থাকবে তালা দেয়া। যাবে কোথায়? ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

'তার পর আর কি?' উপসংহার টানল মুসা। 'তাকে আমাদের পরিচয় দেব। শান্ত থাকতে বলব। হ্যারি আর কিংকে ফোন করব।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে বেশি হৈ চৈ করা চলবে না আমাদের। চাচা

চাচী যেন জেগে না যায়। চল এখন। সিগন্যালগুলো বের করে নিয়ে কাজে লেগে যাই।'

ওয়ার্কশপে এসে কাজে লাগল তিন গোয়েন্দা। আসলে কাজের ভান করতে লাগল। অনেক কথা বলল ওরা, জোরে জোরে। শব্দ করল। মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা তখনও ঘুমাননি। কাজেই অসুবিধে হল না তাঁদেরকে নিয়ে। ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে লাঞ্চ প্যাকেট তৈরি করতে বসল তিনজনে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখল বারান্দার টেবিলে, এমন জায়গায়, যাতে রান্নাঘর থেকে সহজেই চোখে পড়ে। দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ইয়ার্ডের বাইরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিল। তারপর রওনা হল কিশোরের শোবার ঘরের দিকে।

প্রথম পাহারা দিতে নামল রবিন। লুকিয়ে রইল এসে অন্ধকার রান্নাঘরে। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা ওপর তলায় শোবার ঘরে চলে গেছেন। সঙ্কেত দেয়ার যন্ত্রগুলো শার্টের পকেটে ভরে নিয়েছে কিশোর আর মুসা। রবিনেরটা তার হাতে।

মাঝরাতে রবিনের জায়গায় এসে বসল কিশোর।

বারান্দায় টেবিলেই পড়ে আছে প্যাকেটগুলো। কোনও নড়াচড়া নেই কোথাও। কোনও শব্দ নেই। শুধু বাইরের রাস্তায় মাঝেসাঝে হুস হুস করে চলে যাচ্ছে দু'একটা গাড়ি।

রাত দুটোয় মুসার পাহারা দেয়ার পালা পড়ল। রান্নাঘরে ঢুকেই হাই তুলল কয়েকবার। মেরিচাচীর ফ্রিজটায় হামলা চালাবে কিনা ভাবল একবার। বাতিল করে দিল ভাবনাটা। তাতে পাহারার অসুবিধে হতে পারে। ভোর চারটেয় আবার এসে তার জায়গা দখল করল রবিন।

'কিশোর মনে হয় ভুল করেছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে পিটার। এই রাস্তায় এটাই একমাত্র বাড়ি নয়। আরও আছে। ওগুলোতে লুকানোর জায়গা আছে, খাবারের ব্যবস্থা আছে।'

ভোর সাড়ে পাঁচটা। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। তবে ইয়ার্ডের জঞ্জালে অন্ধকার আগের মতই শেকড় গেড়ে রয়েছে যেন, নড়তে চাইছে না। ঠিক এই সময় বাড়ির পেছনের বারান্দার কাছে কি যেন নড়তে দেখল রবিন।

তন্দ্রা এসেছিল। ঝট্ করে সোজা হলো সে। চোখ মিটমিট করে দৃষ্টি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করল। ভাল করে তাকাল বারান্দার দিকে। আবছা একটা ছায়ামূর্তি এসে উঠেছে বারান্দায়। ইমারজেন্সি সিগন্যাল চালু করে দিল রবিন।

এত জোরে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামতে গেল কিশোর, পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে। মুসার কাঁধ ধরে নাড়া দিল, 'এই ওঠ ওঠ, জলদি!' বলেই দিল দরজার দিকে দৌড়। টিঁইপ টিঁইপ করছে তার পকেটে ইমারজেন্সি সিগন্যাল।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই দু'জন দু'দিকে চলে গেল। লুকিয়ে পড়ল দুটো ঝোপের ভেতরে।

রান্নাঘরে বসে ঘড়ি দেখল রবিন। আবার তাকাল বারান্দার দিকে। বারান্দাটা একেবারে খোলা নয়। অর্ধেকটা বেড়া দেয়া। টেবিলটা রয়েছে সেই ঘেরা অংশের ভেতরে। সেখানে ঢোকার মুখের কাছে চলে গেছে ছায়ামূর্তিটা। একটা ছেলে,

কোনও সন্দেহ নেই। আবছা অন্ধকারেও কিশোর পাশার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। অবিকল একই রকম শরীর দু'জনের। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল ছেলেটা। খাবারের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল।

'এই, থামো!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'তোমাকেই বলছি, পিটার মনটেরো!'

যেন কারেন্টের শক খেয়েছে ছেলেটা, এমন করে ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে এল। ঘুরেই দিল দৌড়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আছাড় খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। পেছন ফিরে তাকাল একবার। রবিনের দিকে চোখ পড়ল। ঘরের কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

বেরিয়ে পড়েছে কিশোর। শিকারী বেড়ালের মতই এসে লাফ দিয়ে পড়ল যেন ছেলেটার ঘাড়ে।

ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ছেলেটা। পালাতে পারল না। ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। চেপে ধরল পিটারকে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল ছেলেটা।

'ভয় নেই, আমরা বন্ধু!' বোঝানোর চেষ্টা করল গোয়েন্দারা। 'স্যার মনটেরোর হয়ে কাজ করছি! তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি! কিং আর হ্যারি…!'

কিন্তু কোনও কথাই যেন ঢুকছে না ছেলেটার কানে। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করেই চলেছে। শক্ত করে তাকে চেপে ধরে রাখল রবিন আর মুসা। কিশোর বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'হার্বার্ট কিং?' অবশেষে যেন কথা কানে ঢুকল ছেলেটার। 'হ্যারি ম্যাকঅ্যাডাম? ওরা এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে,' কিশোর বলল। 'তুমি এখন পুরোপুরি নিরাপদ। কোনও ভয় নেই আর। চল, আমাদের হেডকোয়ার্টারে।'

প্রায় টেনেহিঁচড়ে পিটারকে নিয়ে এসে ট্রেলারে ঢোকাল তিন গোয়েন্দা।

'এটা…এটা কি?' জানতে চাইল পিটার।

'একটা ট্রেলার,' জবাব দিল কিশোর। 'জঞ্জালের তলায় লুকানো একটা মোবাইল হোম। আমাদের হেডকোয়ার্টার। তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ, যারা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়, এ মুহূর্তে তারা হয়ত এই ইয়ার্ডের চারপাশেই ঘুরঘুর করছে।'

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল পিটার। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। মুখ হাঁ। অনেক কষ্টে যেন কথা খুঁজে পেল, 'তুমি…তুমি দেখতে একেবারে আমার মত! অবিকল এক! কেন?'

চোদ্দ

হেসে বলল কিশোর, 'একই প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি।'

পিটারও হাসল। 'হ্যাঁ, তোমাদের দেশে যখন আছি প্রশ্ন করার অধিকারটা

তোমারই বেশি।'

'তার ওপর আবার কিশোরের পোশাক পরেছ,' মুসা বলল।

কিশোরের একটা পুরনো প্যান্ট পিটারের পরনে। গায়ে শাদা শার্ট, কয়েক মাস আগেই ওটা ফেলে দিয়েছিল সে। আর এক জোড়া ছেঁড়া স্যাণ্ডল।

'পালানোর সময় কাপড় ছিঁড়ে শেষ হয়ে গেছে আমার,' পিটার বলল 'একেবারে পরার অনুপযুক্ত। কি আর করব। জঞ্জালের নিচে হামাগুড়ি দেয়ার সময় একটা বাক্সের ভেতরে পেয়ে গেলাম এগুলো।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কথাবার্তার ভঙ্গিও দেখি এক। একজন কিশোর পাশার যন্ত্রণায়ই অস্থির, দু'জনকে সইব কি করে?'

হাসতে লাগল সবাই।

'তোমাদের বেকায়দায় ফেলে দিলাম। সরি,' পিটার বলল। 'তবে আমাকে যে খুঁজে বের করেছ এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি তো ঘাবড়েই যাচ্ছিলাম আদৌ কেউ বের করতে পারবে কিনা ভেবে।'

'তোমাকে পেয়ে আমিও খুব খুশি,' দাঁত বের করে হাসল কিশোর। 'যমজ তো।'

'একা থাকার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলাম না,' পিটার বলল। 'কিন্তু তোমরা কে? পরিচয়ই কিন্তু হয়নি এখনও।'

'তোমার যমজ ভাইয়ের নাম তো শুনলেই—কিশোর পাশা, গোয়েন্দাপ্রধান,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। 'আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। রেকর্ড রাখা আর রিসার্চের কাজগুলো আমি করি। আর ও হলো মুসা আমান, সহকারী গোয়েন্দা।'

'গোয়েন্দা?' অবাক হয়েছে পিটার। 'সত্যি?'

'এই যে আমাদের কার্ড,' পকেট থেকে বের করে দিল কিশোর।

'দারুণ তো!' তোমরা আমেরিকানরা খুব মজার মজার কাণ্ড কর। সত্যিই গোয়েন্দা?'

'সত্যিই গোয়েন্দা,' জবাব দিল রবিন। 'তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাদেরকে ভাড়া করেছে কিং আর হ্যারি। তুমি ভেবে কিডন্যাপাররা কিশোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর।'

'তাই নাকি? কিশোরকে কিডন্যাপ করেছে?'

সংক্ষেপে সব কথা পিটারকে জানাল কিশোর। মন দিয়ে শুনল ছেলেটা। তারপর বলল, 'তাহলে তোমরাই বের করেছ জ্যাঙ্গা'স প্লেস বলে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। বের করেছ রেড লায়নের আলমারিতে আঁকা ট্যাক্সির ছবি। সত্যিই বুদ্ধিমান।'

'তুমি যে এখানে লুকিয়ে আছ, এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছে আমাদের কিশোর,' মুসা বলল গর্বের সঙ্গে।

'দারুণ দেখিয়েছ, সত্যি। তো এখন কি হবে? কিং আর হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ করবে, যাতে আমার বাবাকে খবর দিতে পারে?'

'নিশ্চয়।' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। 'পিটারকে সোজা মিরামার হোটেলে

নিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'সেটা কি উচিত হবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিডন্যাপারগুলো ইয়ার্ডের বাইরে বসে চোখ রাখতে পারে। হোটেলেও চোখ রাখতে পারে।'

'তোমার তাই মনে হয়?' সতর্ক হয়ে গেল পিটার।

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল। 'সেটা হতেই পারে। সহজে হাল ছাড়বে না উগ্রবাদীরা। পিটার এখানেই নিরাপদ। অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বরং হ্যারি আর কিংকে ফোন করি। এখানে চলে আসুক।'

'করব?' বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই ফোনের দিকে হাত বাড়াল রবিন। মিরামার হোটেলে ডায়াল করল। অবাক হয়ে ট্রেলারের ভেতরটা দেখছে পিটার। সাজানো গোছানো চমৎকার একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যেন। নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। বিড়বিড় করে আনমনেই বলল, 'বাইরে থেকে ট্রেলারটা দেখেছি আমি জঞ্জালের নিচে ঘোরার সময়। ভেতরে যে এই অবস্থা কল্পনাই করতে পারিনি!'

'বাইরে থেকে দেখে যাতে কিছু বোঝা না যায় সেই ব্যবস্থাই করেছি আমরা।'

'সাংঘাতিক!'

রিসিভার রেখে দিল রবিন। 'কেউ ধরছে না ওদের ঘরে। কোথায় গেছে বলতে পারল না ক্লার্ক। বললাম আবার ফোন করব। মেসেজ দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করল, দিলাম না। বলা যায় না কার চোখে পড়ে যায়।'

'ঠিকই করেছ,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় রেড লায়নে নজর রাখতে গেছে। ফিরে আসবে সময় হলেই।' পিটারের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে আমরা খুঁজে না পেলে কি করতে?'

'আরও অপেক্ষা করতাম। তারপর নিরাপদ বুঝলে ফিরে যেতাম রেড লায়নে। দেখতাম, আমার মেসেজ পেয়ে ওখান পর্যন্ত কেউ যেতে পেরেছে কিনা।'

'ঠিক যা ভেবেছি আমি।'

'ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সেটা একেবারে শেষ অবস্থায় গিয়ে পড়লে। অর্থাৎ বাধ্য হলে। রেড লায়নের কিডন্যাপারগুলোকে দেখেই বুঝে গেছিলাম আমার পাঠানো মেসেজ দেখে ফেলেছে ওরা। বুঝে ফেলেছে। তার মানে কোনও একটা যোগাযোগ রয়েছে জানার। স্পাই আছে ওখানে। কাজেই মিশনকে আর বিশ্বাস করতে পারি না পুরোপুরি।'

ড্রয়ার থেকে হাতির দাঁতে তৈরি গহনাটা বের করল কিশোর। বক্স ক্যানিয়নে যেটা পেয়েছিল। পিটারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারো?'

জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল পিটার। 'নানদাতেই তৈরি হয়েছে, সন্দেহ নেই। চেনাও লাগছে। তবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

'রবিন,' মুসা বলল। 'অনেকক্ষণ তো হলো। করে দেখ আরেকবার।'

আবার মিরামার হোটেলের নম্বরে ডায়াল শুরু করল রবিন।

পিটার দেখতে লাগল ট্রেলারের ভেতরটা। সর্ব-দর্শন নামের পেরিস্কোপটা

দেখল, ট্রেলারের ছাত ফুঁড়ে যেটা বেরিয়েছে। দেখল টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো লাউডস্পীকার। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরাটার ওপর গিয়ে দৃষ্টি স্থির হলো। 'এত জিনিস কোথায় পেলে?'

'বেশির ভাগই বাতিল মাল থেকে নতুন করে বানিয়ে নিয়েছি,' মুসা জানাল। 'ইলেকট্রনিকের জাদুকর বলতে পার কিশোরকে...'

'আর ইঞ্জিনের জাদুকর মুসা,' হেসে যোগ করল কিশোর।

'রবিন হলো চলমান জ্ঞানকোষ,' মুসা বলল।

'তোমরা জিনিয়াস!' আরেকবার প্রশংসা করল পিটার।

রিসিভারের মাউথপিসে হাত রেখে ফিরে তাকাল রবিন। 'ক্লার্ক বলছে, হ্যারি নাকি ফিরেছে। ঘরের দিকে যেতে দেখেছে। কথা বলতে চাইলাম। ধরতে বলল।'

'ধর,' মুসা বলল। 'আমরা পিটারকে ওয়ার্কশপটা দেখিয়ে আনছি।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল কিশোর, মুসা আর পিটার। পিটার জানাল এটাতে কখনও ঢোকেনি। লোকজনের সাড়া পেয়ে ঢোকার সাহসই হয়নি আসলে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে যখন ট্রেলারে ঢুকেছে তখনও এখান দিয়ে নয়, ঢুকেছে সবুজ ফটক এক দিয়ে। ওয়ার্কশপের চেহারা দেখে আরও তাজ্জব হয়ে গেল। ছোটখাট একটা আধুনিক কারখানা বলেই মনে হল তার। বেলা হয়েছে। রোদ উঠেছে। পরিষ্কার দিনের আলোয় বেরিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ভয় ভয় করছে। প্রশ্ন করল, 'আমি এখানে নিরাপদ?'

'কেন নয়?' কিশোর বলল, 'এখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। ইয়ার্ডের চারপাশ ঘিরে বেড়া আছে দেখেছই তো। তার ওপর রয়েছে জায়গায় জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ। এর ভেতরে কেউ দেখতে পাবে না।'

হাসল বটে পিটার, তবে তেমন আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওয়াকর্শপের জিনিসপত্র। 'সাজিয়েছ বটে!'

সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। 'হ্যারির সঙ্গে কথা বললাম,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। 'কিংকে নিয়ে এখুনি চলে আসবে বলেছে। পিটারকে নিতে।'

'কিন্তু আমি যে যেতে চাই না,' পিটার বলল। 'তোমাদের হেডকোয়ার্টার ভারি পছন্দ হয়েছে আমার। দেখার অনেক কিছু বাকি। ভাবছি আজ সারাদিন ধরে দেখব।' ওয়ার্কবেঞ্চের নিচে ঝুঁকে একটা জিনিস দেখিয়ে বলল, 'এটা কি?'

দেশলাইয়ের বাক্সের সমান কালো একটা বাক্সমত জিনিস বের করল সে।

'ওটা?' বলতে চাইল মুসা, 'ওটা...ওটা...কিশোর, কি জিনিস?'

ছোট বাক্সটা দেখতে লাগল রবিন। 'এটা...এটা...'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। সতর্ক হয়ে গেছে। 'এটা আমাদের জিনিস নয়! বাগ!'

'বাগ?' ভুরু কোঁচকাল পিটার। 'ইংরেজিতে বাগ মানে তো পোকা, গোবরে পোকা, তাই না?'

'শ্রবণ যন্ত্রকেও বলে,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'এক ধরনের রিমোট

মাইক্রোফোন। দূর থেকে চুরি করে কথা শোনার কাজে ব্যবহার করে স্পাইরা। নিশ্চয় আমাদের কথা শুনছে কেউ। জলদি চল! বেরোতে হবে…'

ওয়ার্কশপের বাইরে থেকে কথা বলে উঠল কেউ। পরিচিত কণ্ঠ। 'তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, বুঝলে। পালাতে পারবে না।'

ওয়ার্কশপের দরজায় দেখা দিল লোকটা। বেঁটে, কোঁকড়া বাদামী চুল। তার পেছনে এসে দাঁড়াল পাতলা লম্বা লোকটা। সেই দুই কিডন্যাপার, কিশোরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল যারা।

দু'জনের হাতেই পিস্তল।

পনেরো

'গুড,' কুৎসিত হাসি হাসল বেঁটে লোকটা। 'সবাই আমরা এখানে রয়েছি।'

'ডেভ,' লম্বু বলল। 'মনে হয় আমাদের লোককে পেলাম।'

'সেরকমই তো লাগছে।'

'এই ছেলেগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আমাদের,' লম্বা লোকটা বলল, তিন গোয়েন্দার কথা। 'চালাক ছেলে। ওরা না থাকলে আমরা বেরই করতে পারতাম না। অনেক সহজ করে দিল আমাদের কাজ।'

'ওদেরকে তাহলে ধন্যবাদ দেয়া দরকার,' হেসে উঠল ডেভ।

যেন খুব উপভোগ করছে দুই উগ্রপন্থী।

হ্যারি আর কিং না আসা পর্যন্ত এদের আটকে রাখা দরকার, বুঝতে পারছে তিন গোয়েন্দা। গরম হয়ে রবিন বলল, 'এসব করে পার পাবেন না আপনারা!'

'স্যার মনটেরোকেও বাগে আনতে পারবেন না,' ফুঁসে উঠল মুসা।

'ছেলেটাকে নিয়ে পার হয়ে যেতে পারলেই আমরা খুশি,' ডেভ বলল। 'তারপর স্যার মনটেরো কথা শোনে কিনা দেখা যাবে।'

হাসল খাটো কিডন্যাপার। পিটারের দিকে তাকাল, তারপর কিশোরের দিকে। অন্য লোকটাও দেখছে দু'জনকে। কিশোরের চোখ চকচক করছে দেখতে পেল রবিন আর মুসা।

'তুমি খুব চালাক, কিশোর পাশা,' ডেভ বলল। 'তোমাদের মধ্যে কে পিটার সেটা গোপন করতে চাইছ। ভেবেছ আমরা বের করতে পারব না। হেলিকপ্টারটা ফেলে রেখে আবার এখানে ফিরে এসে ভালই করেছি বুঝতে পারছি। খবরের কাগজ দেখেছি। ভুল বুঝতে পেরেছি। জানলাম, মাস্টার মনটেরো এখনও এই এলাকাতেই আছে। পুলিশ কল্পনাই করেনি ওদের নাকের নিচে রয়েছি আমরা। ওরা আমাদেরকে অন্য জায়গায় খুঁজছে, আর আমরা পিটারকে খুঁজতে লাগলাম এখানে। ঠিক জায়গায়।'

'হ্যারি আর কিংকে দেখে ফেললাম আমরা,' হেসে যোগ করল জন। 'ওদের সঙ্গে যোগ দিলে তোমরা,' তিন গোয়েন্দার কথা বলল সে। 'বুঝে গেলাম আগে হোক পরে হোক পিটারের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যাবেই তোমরা। এই ইয়ার্ডে

অনেক লোক আসে। তাদের ভিড়ে ঢুকে পড়াটা কোনও ব্যাপারই না। ঢুকলাম। তোমরা তখন পিটারকে খুঁজতে এতই ব্যস্ত আমাদেরকে লক্ষই করলে না।'

'আপনাদের দেখেছি!' রেগে গেল মুসা।

'ঝোপের ভেতর ছিলাম চেহারা তো আর দেখনি। চিনবে কি করে? যাই হোক, তোমাদেরকে আমি ভাল করেই দেখেছি। কি করতে চলেছ বুঝেছি। এক ফাঁকে ঢুকে পড়লাম তোমাদের ওয়ার্কশপে। বাগটা ফেলে রাখলাম বেঞ্চের তলায়। তারপর তোমাদের অনেক আলোচনাই শুনেছি।'

বিশাল এক জঞ্জালের স্তূপের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই কিডন্যাপার। চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। এক ধরনের ফাঁদ পাতা আছে ওই জঞ্জালে। বিপদে পড়লে প্রয়োজনের সময় যাতে শত্রুর ওপর টান মেরে ফেলে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। মাথা নেড়ে নিষেধ করল কিশোর। দু'জন পিস্তলধারী লোক, ভয়াবহ বিপজ্জনক, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তবে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখল রবিন। কি প্ল্যান করেছে গোয়েন্দাপ্রধান?

'পুলিশ আপনাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে,' সময় নষ্ট করার জন্যে বলল মুসা।

'জানি,' জবাব দিল ডেভ। 'আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না। আমরা যাকে চাই তাকে পেয়ে গেছি।'

'আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা,' জন বলল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

'পিটার, চল, আর দেরি করতে পারছি না,' ডেভ বলল।

'চালাকির চেষ্টা করবে না কেউ,' হুঁশিয়ার করল জন। 'গুলি করতে দ্বিধা করব না আমরা বুঝতেই পারছ।'

'তা পারছি,' এগিয়ে গেল পিটার। 'চলুন, যাচ্ছি।'

তার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'হ্যাঁ, চলুন।'

'কিশোর,' পিটার বলল। 'আমার জন্যে তোমার এতবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ওরা এত বোকা নয়। ঠিক বুঝে গেছে আমিই পিটার।'

মস্ত বড় অভিনেতা কিশোর। বিখ্যাত পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিয়েছিল তাঁর ভাতিজা সেজে। জন আর ডেভ তো কিছুই না। পিটারের কথার টান নকল করে ফেলল সে অবলীলায়, 'তুমি সরো তো কিশোর। আমিও জানি ওরা বোকা নয়। ঠিকই বুঝতে পেরেছে কে পিটার।'

'কিশোর!' প্রতিবাদ করল পিটার। 'ওদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি যে পিটার বুঝতে পেরেছে। পেরেছেই।'

দু'জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে দুই কিডন্যাপার। হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। হঠাৎই আবিষ্কার করেছে, দুটো ছেলের মাঝে কোনজন কিশোর আর কোনজন পিটার, জানে না। কিশোরের চোখ কেন জ্বলজ্বল করছিল এতক্ষণে বুঝল রবিন। দু'জনের পরনে এক ধরনের পোশাক, এক চেহারা, কথাও বলছে একই রকম ভাবে।

শাসানির ভঙ্গিতে পিস্তল নাড়ল ডেভ, 'অনেক হয়েছে। যথেষ্ট। আসল পিটার কে, জলদি বলো!'

'প্লীজ, কিশোর,' অনুরোধ করল পিটার। 'আমি চলে যাই ওদের সঙ্গে!'

'থামো!' ধমক দিয়ে বলল কিশোর, 'ওরা জানে আমি পিটার। খামোকা আমাকে বাঁচাতে চাইছ কেন? চলুন, আমি যাচ্ছি।'

ভয়ংকর হয়ে উঠেছে দুই কিডন্যাপারের চেহারা।

'প্রিন্টের শার্ট পরা ছেলেটা পিটার,' ডেভ বলল। 'ও-ই বেশি করে যেতে চাইছে। বেশি ইচ্ছুক। তার মানে নতুন বন্ধুকে বাঁচাতে চাইছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' জন বলল। 'শাদা সার্ট পরা ছেলেটা পিটার। অহেতুক কিশোরকে বিপদে ফেলতে চাইছে না।'

পিস্তল হাতে আগে বাড়ল জন।

'কাপড় দেখ ওদের,' ডেভ বলল পেছন থেকে। 'ধোপার দোকানের চিহ্ন থাকবেই। বোঝা যাবে।'

কিশোরের শার্টের কলারের ভেতরটা উল্টে দেখল জন। 'ও-ই কিশোর পাশা, ডেভ। এই তো। পাশা ঃ তেরশো বত্রিশ!'

শ্রাগ করল কিশোর। আমি কিশোর নই। পালানোর সময় কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমারগুলো ফেলে তখন কিশোরের কাপড় নিয়ে পরেছি। বিশ্বাস না হলে ওর কলারের ভেতর দেখুন।'

পিটারের শার্টের কলারও দেখল জন। তাতেও লেখা রয়েছে পাশা ঃ আঠারোশো তেইশ। গাল দিয়ে উঠল সে।

মাথা ঝাঁকাল পিটার। 'কিশোর ঠিকই বলেছে। আমি কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তখন তার এক সেট কাপড় নিয়ে পরেছি।'

'তারমানে দু'জন পিটার হয়ে গেলাম আমরা, কিংবা দু'জন কিশোর,' হেসে বলল কিশোর। 'তাহলে আসল কিশোর কে? আমি?' বুড়ো আঙুল নাড়ল সে। 'মোটেও না।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কাপড়ের ব্যাপারটা জানা না থাকলে এখন ওরাও দ্বিধায় পড়ে যেত কে কিশোর আর কে পিটার ভেবে।

'শুনুন,' কিশোর বলল। 'কিশোরের পকেট দেখুন। একটা জিনিস পাবেন। যেটা প্রমাণ করবে সে কিশোর পাশা।'

দ্রুত পিটারের পকেটে হাত ঢোকাল জন। ছোট একটা যন্ত্র বের করল। ঘুরে তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'এ তো আমাদেরই বাগ! এটা পাশাদের ওয়ার্কশপ। নিশ্চয় পাশাই কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখেছে। সেটাই স্বাভাবিক।'

'ইডিয়েট!' ধমকে উঠল ডেভ। 'ওটা পিটার পেয়েছে, শুনলাম না তখন? তারপর হাতে হাতে ঘুরেছে। কার কাছ থেকে কার কাছে গেছে কি করে বুঝব? ওদের কথার কোনও বিশ্বাস নেই।'

রাগে লাল হয়ে গেল জনের মুখ। কিশোরের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। লোকটার জ্যাকেট খামচে ধরল কিশোর, যেন পতন ঠেকানোর জন্যে। গাল দিয়ে উঠল কিডন্যাপার, 'এই ছাড়, ছাড়, আমার জ্যাকেট ছাড়!'

ছেড়ে দিল কিশোর। তার পকেট ভালমত খুঁজে দেখল জন। তারপর

পিটারের সব পকেট দেখল। 'কিচ্ছু নেই!' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নিরাশ কণ্ঠে বলল সে।

হাসতে আরম্ভ করল কিশোর। দেখাদেখি পিটারও হাসতে লাগল।

'এটা বন্ধ করা দরকার!' চেঁচিয়ে উঠল ডেভ। 'পিটারের বাবার একজন শোফার আছে। আর্মির লোক। তার নাম আর র‍্যাংক বলতে হবে তোমাদেরকে। যে বলতে পারবে না, ধরে নেব সে-ই কিশোর পাশা। হ্যাঁ, বলে ফেল এখন।'

বরফের মত জমে গেল যেন রবিন আর মুসা। এইবার ফাঁদে পড়েছে কিশোর। কি করবে? প্রশ্নের জবাব জানা নেই তার। তাকে বাঁচানোর জন্যে সঠিক জবাবটা দিয়ে দেবে এবার পিটার।

'বেশ,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল পিটার। 'এবার আটকে ফেলেছেন। বলতে পারলাম না। আমিই কিশোর পাশা।'

ভাবান্তর ঘটল না মুসা আর রবিনের চেহারায়। তবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওরা। কিশোরের খেলাটা ধরে ফেলেছে পিটার। পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলতে আরম্ভ করেছে।

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি,' কিশোর বলল। 'আমি কিশোর পাশা। শোফারের নাম বলতে পারব না।'

প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল দুই কিডন্যাপার, বিশেষ করে ডেভ। ঝটকা দিয়ে ঘুরল রবিন আর মুসার দিকে। 'আশা করি তোমরা ওদের মত বোকা নও! মরার ইচ্ছে নেই! বলে ফেল কে কিশোর আর কে পিটার?'

'ও!' পিটারকে দেখাল মুসা।

'ও!' কিশোরকে দেখাল রবিন।

আস্তে মাথা নাড়ল ডেভ। 'হুঁ। একটাই উপায় আছে এখন আমাদের। এছাড়া আর কিছু করার নেই।'

দুই কিশোরের দিকে এগিয়ে এল সে, কিংবা দুই পিটার। কোনটা যে নকল কিশোর, বের করবে এবার।

ষোলো

রেড লায়ন থেকে কিংকে তুলে নিয়ে ইয়ার্ডে চলে এল হ্যারি। উজ্জ্বল রোদ। ভেতরে ঢুকল বিশাল চকচকে ক্যাডিলাকটা। ওদেরকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেল না কোনও কিশোর। নীরব চত্বরের চারপাশে চোখ বোলাল ওরা।

'পিটার!' চিৎকার করে ডাকল কিং। 'কিশোর!'

'রবিন বলেছে,' হ্যারি জানাল। 'ওদের গোপন হেডকোয়ার্টারে রেখেছে পিটারকে। জঞ্জালের ভেতরে লুকানো।' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কিশোর! কিশোর পাশা!'

'পিটার! কিশোর!' কিংও ডাকল।

'এত চেঁচামেচি কিসের! এই সক্কাল বেলা!' বাড়ির কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলেন

মেরিচাচী। ফুলগাছে পানি দিচ্ছিলেন বোধহয়। 'এখন ক'টা বাজে? এত সকালে এসে চেঁচামেচি জুড়েছেন!'

'সরি, ম্যা'ম,' মোলায়েম গলায় বলল কিং। 'ছেলেগুলোকে খুঁজছি আমরা। কিশোরকে দেখেছেন?'

'ও, আপনারা,' চিনতে পারলেন মেরিচাচী।

'কিশোরকে খুঁজছি আমরা,' হ্যারি বলল এমন ভঙ্গিতে, যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে। 'ও কোথায়?'

'জানি না। রাতে রবিন আর মুসা ছিল এখানেই। ভোর হতেই কোথায় যে গায়েব হয়েছে সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারবে কিনা সন্দেহ! আমি তো সাধারণ মানুষ!'

'কিন্তু আমাদেরকে এখানে দেখা করতে বলেছে ওরা,' হ্যারি বলল।

'তাহলে আছে কোথাও। ওদের ওয়ার্কশপে দেখুন। বাঁয়ের ওই যে বড় জঞ্জালটা...'

'থ্যাংক ইউ,' বাধা দিয়ে বলল কিং। 'যাচ্ছি।'

প্রায় দৌড়ে চত্বর পেরিয়ে এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল দু'জনে। কাউকে দেখল না।

'নেই তো!' কিং বলল।

'ও কি?' কান পেতে শুনছে হ্যারি।

কাছাকাছি কোনখান থেকে শব্দটা আসছে। ধাতব শব্দ। সেই সাথে চাপা গোঙানি।

'ওদিকটায়,' হ্যারি বলল। 'ওই বড় পাইপটার কাছে।'

পাইপের কাছে এসে খোলা মুখ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। হাত-পা বেঁধে তার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে রবিন আর মুসাকে। টেনে ওদেরকে বের করা হল। মুখের কাপড় খুলে নিতেই প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা, 'কিডন্যাপার!'

'নিয়ে গেছে ওদেরকে!' রবিন বলল।

'ওদেরকে?' কিং বলল, 'পিটার আর কিশোরকে? কোথায়? কখন?'

'পাঁচ মিনিটও হয়নি,' ককিয়ে উঠল মুসা। 'হয়ত আরও কম। কে কিশোর আর কে পিটার বুঝতে পারেনি, তাই দু'জনকেই ধরে নিয়ে গেছে?'

কথা বলতে বলতেই রবিন আর মুসার বাঁধন খুলছে দু'জনে। হ্যারি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'জানি না!'

'কি গাড়ি? লাইসেন্স নম্বর রেখেছ?'

'গাড়িটা দেখতেই পারিনি!' জবাব দিল রবিন।

'বেশি দূর যেতে পারেনি,' কিং বলল। 'পুলিশকে...'

'মুসা!' তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। 'তোমার বুকে ও কিসের আলো? এত লাল...'

'ইমারজেন্সি লাইট, মুসা,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'নিশ্চয় কিশোর! অন সুইচটা টিপে দিয়ে ডিরেকশনাল ডায়ালটা দেখ!'

শার্টের বুক পকেট থেকে খুদে যন্ত্রটা বের করল মুসা। অনিয়মিত ভাবে

জ্বলছে নিভছে লাল আলো। সুইচ টিপতেই টিইইপ টিইইপ শুরু করল। ডায়ালের তীরটা ঘুরে গেল রকি বীচের কেন্দ্রের দিকে।

'বেশ জোরাল!' মুসা বলল। 'তার মানে বেশি দূর যেতে পারেনি!'

'শহরের দিকে চলেছে,' বলল রবিন। 'কিং, জলদি! ওদের পিছু নেয়া যাবে। এখনও সময় আছে।'

ওয়ার্কশপ থেকে ছুটে বেরোল চারজনে। ক্যাডিলাকে এসে উঠল। মুসার চোখ সিগন্যাল ডায়ালের দিকে। স্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে যন্ত্রটা।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'সোজা শহরের দিকে।'

দ্রুত গাড়ি চালাল হ্যারি। কিং তাকিয়ে রয়েছে ডায়ালটার দিকে। 'কি যন্ত্র? কিভাবে কাজ করে?'

'একই সঙ্গে দুটো কাজ করে এটা,' বুঝিয়ে বলল রবিন। 'ডিরেকশনাল সিগন্যাল আর ইমারজেন্সি অ্যালার্ম। সংকেত পাঠাতেও পারে গ্রহণও করতে পারে। এখন ওটা কিশোরের পাঠান সংকেত ধরছে। টিঁপ টিঁপ করছে সে জন্যেই। যতই কাছাকাছি যাব জোরাল হবে সংকেত। কোনদিক থেকে সংকেত আসছে সেটা নির্দেশ করবে তীরটা। ইমারজেন্সি অ্যালার্ম হিসেবেও কাজ করে যন্ত্রটা, কণ্ঠস্বরেই চালু হয়ে যায়, ভয়েস কমাণ্ড। আলোটা জ্বলছে তার কারণ কিশোর এখন বলছে...'

'না না বলো না!' চেঁচিয়ে বাধা দিল মুসা, 'তাহলে কিশোরের সিগন্যাল অফ হয়ে যাবে!'

ঢোক গিলল রবিন। 'তাই তো! হেল্প শব্দটা বলতে পেরেছে হয়ত কিশোর, যন্ত্রের কাছে।'

'ডানে, হ্যারি,' আচমকা নির্দেশ দিল মুসা। বিড়বিড় করল আনমনে, 'শব্দ বাড়ছে। মনে হয় থেমে গেছে কিডন্যাপাররা।'

ভ্রূকুটি করল কিং। 'যন্ত্রগুলো একাধারে প্রেরক এবং গ্রাহক, তাই তো বললে? রবিন, কিশোর একটা যন্ত্র ব্যবহার করছে, তাই না?' যেন নিজেকেই কথাগুলো বোঝাচ্ছে সে। 'অ্যাক্সিডেন্টালি ওর সিগন্যাল যদি বন্ধ করে দিই আমরা কি ঘটবে?'

'অফ হয়ে যাবে ওর বীপারটা,' রবিন বলল। 'কিডন্যাপাররা কিছু শুনতে পাবে না। পকেট ভালমত লুকানো থাকলে আলো জ্বলাও দেখতে পাবে না।'

'আশা করি ভালমতই লুকানো আছে,' কিং বলল ধীরে ধীরে। 'কারণ সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে ও। মারাত্মক। অ্যাক্সিডেন্টালি আমরা একটা গোলমাল করেও দিতে পারি। তাহলে সংকেত দিতে শুরু করবে ওর যন্ত্র। আর সেটা কিডন্যাপারদের চোখে পড়ে গেলে, ওরা বুঝতে পারলে একটা সংকেত পাঠানোর যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, ভয়ানক বিপদ হবে কিশোরের। বুঝে যাবে কোন ছেলেটা কিশোর!'

মুখ শুকিয়ে গেল রবিনের। এ কথাটা ভাবেনি। তাগাদা দিল হ্যারিকে, 'জলদি, আরও জোরে চালান!'

*

কিডন্যাপারদের ভাড়া করে আনা নীল লিংকন গাড়িটা একটা সেলফ-সার্ভিস ফিলিং স্টেশনে ঢুকল। পেছনের সীটে বসে রইল কিশোর আর পিটার, জনের সঙ্গে। ডেভ নেমে গিয়ে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরতে শুরু করল। কেউ এল না গাড়িটার কাছে।

'সত্যি কথাটা বললে তোমাদের দু'জনের জন্যেই ভাল হত,' জন বলল।

'সাহায্য আসছে,' কিশোর বলল। 'আমি জানি, আসছেই। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'আমিও জানি,' একমত হলো পিটার। 'আমার বন্ধুরা আসবেই।'

'আসতে দেরি হলেই বুঝবে মজা,' খেঁকিয়ে উঠল ডেভ। 'এখনও সময় আছে। কিশোর বেরিয়ে যেতে চাইলে তাকে চলে যেতে দেব আমরা। পরে আর সুযোগ দেয়া হবে না। এক সময় না এক সময় জানতে পারবই আমরা কোনজন কিশোর। তখন তাকে মেরে ফেলা হবে।'

'কে বিশ্বাস করে আপনার কথা,' পিটার বলল।

'আমিও না,' কিশোর বলল। 'আমি যে কিশোর, একথা বললেই আপনারা ছেড়ে দেবেন, মোটেও বিশ্বাস করি না আমি। সাপকে বিশ্বাস করা যায়, আপনাদেরকে না। ভয় করি না। সাহায্য আসবেই।'

'গাধার মত কথা বল না।' ধমকে উঠল জন। 'কোত্থেকে সাহায্য আসবে? আর ভয়টা কিসের পাচ্ছ, শুনি? পিটার কে, সেটা জানলেও আমরা তার ক্ষতি করব না। বাঁচিয়ে রাখব আমাদেরই স্বার্থে। কারণ মেরে ফেললে তাকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে না। বল, কে পিটার?'

'আগে সাহায্য আসুক তো,' কিশোর বলল। 'তারপর নিজেরাই দেখতে পাবেন।'

'কপালে দুঃখ আছে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জন। 'আমরা আর কি করব!'

'না, আপনাদের কিছুই করার নেই,' পিটার বলল। 'যা ইচ্ছে করবেন। এত বকবক করছেন কেন?'

চড় মারার জন্যে হাত তুলেও থেমে গেল জন। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডেভ। 'মাথা গরম কর না। সুযোগ দিয়েছি, কথা শোনেনি। পরে আর আমাদেরকে দোষ দিতে পারবে না। ছেলেগুলোকে চালাক ভেবেছিলাম, এখন দেখছি একেবারে বোকা।'

রকি বীচের রাস্তা ধরে যতটা সম্ভব জোরে গাড়ি ছুটিয়েছে হ্যারি। তার পাশে বসে সিগন্যাল ডায়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। পেছনের সীট থেকে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এসেছে কিং আর রবিন, দেখার জন্যে। হঠাৎ কমে যেতে শুরু করল সিগন্যাল, দুর্বল হয়ে যেতে লাগল।

'ডানে!' চিৎকার করে বলল মুসা। তীরটা ঘুরে গেছে সাগরের দিকে।

মোড় নিল হ্যারি। চওড়া একটা রাস্তা, চলে গেছে বন্দরের দিকে। সকালের

প্রচণ্ড ভিড় রাস্তায়, দু'দিকেই ছুটে চলেছে প্রচুর গাড়ি। আরও কমে আসছে সংকেতের শব্দ, ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে।

'দক্ষিণে ঘুরেছে!' মুসা বলল।

'মুসা,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় হাইওয়ের দিকে চলেছে ওরা। তীরটা দেখছ? অর্ধেক উত্তরে অর্ধেক দক্ষিণে। তার মানে লস অ্যাঞ্জেলেস।'

'তুমি…মনে হয় ঠিকই বলেছ,' ঘাবড়ে গেছে মুসা।

'হাইওয়েটা কদ্দূর?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'মাইলখানেক,' জবাব দিল রবিন।

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'যা ভিড়! কিছুতেই জোরে চালাতে পারছি না।'

'হাইওয়েতে আমাদের চার গুণ জোরে চালাতে পারবে ওরা,' কিং বলল। 'তোমাদের যন্ত্রের রেঞ্জ কতোটা?'

'তিন মাইল,' রবিন জানাল।

জোরে চালানোর চেষ্টা করেও পারছে না হ্যারি। অসহায় লাগছে তার। পারলে গাড়ির ভিড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। ডায়ালের তীর দেখছে মুসা। থিরথির করে কাঁপছে ওটা, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে ঘুরবে। অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে সংকেত। দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে আসলে, সে জন্যেই হচ্ছে এরকম। এক সময় জিরোতে চলে এল তীর, কোনও দিক নির্দেশ করছে না আর। থেমে গেল সংকেতের শব্দ। নিভে গেল লাল আলো। রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে প্রেরক যন্ত্রটা।

'গেল!' মাথায় হাত দিয়ে ফেলল কিং। 'আর ওদেরকে ধরা যাবে না। কি গাড়ি তা-ও জানি না। কি ভাবে অনুসরণ করব? আর কোনও উপায় নেই। পুলিশের কাছেই যেতে হবে।'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে পিটার আর কিশোর। সীটের আরেক প্রান্তে পিস্তল হাতে বসে রয়েছে জন। চোখ বন্ধ।

কিশোরের কানে কানে বলল পিটার, 'মনে হচ্ছে বলে দেয়া উচিত, কিশোর। তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

'না, দেবে না। আমি গিয়ে সব ফাঁস করে দেব, এই ভয়ে। বিপদ আরও বাড়বে তখন আমাদের। পিটারের কোনও ক্ষতি ওরা করবে না, কিন্তু কিশোর পাশাকে ওদের কোনও প্রয়োজন নেই। অহেতুক কেন ঝামেলা রাখবে? তাছাড়া অনেক বেশি জেনে ফেলেছে কিশোর, তাকে চুপ করিয়ে দিতেই চাইবে…'

আচমকা চোখ মেলে ধমকে উঠল জন, 'এই, থামবে! এত কথা কিসের! যত্তোসব! একটাকে খতম করে দিতে পারলেই এখন বাঁচি!'

খিকখিক করে হাসল সে। আবার চোখ মুদল। সকালের উজ্জ্বল রোদে তীব্র বেগে ছুটছে লিংকন। কে জানে কোন অজানার উদ্দেশে।

সতেরো

থানার লম্বা বেঞ্চটায় বসে রয়েছে দুই গোয়েন্দা, হ্যারি আর কিং। ওদের সঙ্গে রয়েছেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা। সব কথা শোনার পর মেরিচাচী ভীষণ খেপে যাবেন ভেবেছিল রবিন আর মুসা। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত রয়েছেন তিনি।

'ওই যে, কিশোরের মত ছেলেটা,' হ্যারিকে বললেন তিনি। 'পিটার মনটেরো, আপনার দেশের লোকের কাছে খুবই মূল্যবান, তাই না? ভবিষ্যতে দেশটার স্বাধীনতার জন্যে?'

'হ্যাঁ, মিসেস পাশা,' মাথা দোলালো হ্যারি। 'খুবই দামী। সিভিল ওয়ার ছাড়া একমাত্র ওর বাবাই পারে দেশটাকে স্বাধীন করতে। শান্তি আনতে। কিন্তু ওই কিডন্যাপারগুলো তা চায় না। ওরা চায় ওদের ইচ্ছে মত চালাতে। স্যার মনটেরোর ছেলেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ওদের কথা শোনাতে বাধ্য করতে। সে জন্যেই পিটারকে উদ্ধার করা এখন এত জরুরী।'

'কিশোর আর তার বন্ধুরা আপনাদেরকে সাহায্য করেছিল, বলছেন, আর তখনই পিটারকে সহ কিশোরকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ, তাই,' জবাবটা দিল কিং।

'তাহলে ঠিক কাজই করেছে ছেলেরা,' যেন রায় ঘোষণা করলেন মেরিচাচী। 'ওরা যে আপনাদেরকে সাহায্য করেছে এ জন্যে আমি খুশি। এখন ছেলেদুটো নিরাপদে ফিরে এলেই আরও বেশি খুশি হই আমি।'

বেরিয়ে এলেন ইয়ান ফ্লেচার। গম্ভীর হয়ে আছেন। 'লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু ওরাই বা কি করতে পারবে বুঝতে পারছি না। গাড়িটা কি গাড়ি জানি না। লাইসেন্স নম্বর জানি না। শুধু কিডন্যাপারদের চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দেয়া হয়েছে…'

'আবার সেই একই ব্যাপার,' নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলেন মেরিচাচী। 'কিছুই করার নেই আপনাদের। আগের বারও একই অবস্থা হয়েছিল। আপনাদের নাকের নিচে দিয়ে সব কাণ্ড করে চলেছে লোকগুলো, কিছুই করতে পারছেন না আপনারা।'

'সাধারণত একই জায়গায় আবার ফিরে আসে না কিডন্যাপাররা, মিসেস পাশা। ওরা যে আসবে কি করে বুঝব?'

'বোঝা উচিত ছিল,' চীফের কথা একটুও পছন্দ হচ্ছে না মেরিচাচীর। 'কিশোর তো বলেইছিল আপনাদেরকে ওরা সাধারণ কিডন্যাপার নয়। তার কথা শোনা উচিত ছিল।'

'হয়ত ঠিকই বলেছেন আপনি, মিসেস পাশা,' তর্ক করলেন না ইয়ান ফ্লেচার। 'যাই হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করার কথা দিয়েছে। তবে পেলেও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'কেন নয়?' প্রশ্ন করলেন রাশেদ পাশা।

'কারণ কিশোর আর পিটারকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে কিডন্যাপাররা। ওদের কাছে অস্ত্র আছে। যা শুনলাম, তাতে মনে হয় ওরা সাধারণ কিডন্যাপার নয়, আরমির লোক। আর ওসব লোক বড় ভয়ংকর হয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া করে না। মুখোমুখি হয়ে ওদেরকে ঠেকানো হয়ত যাবে, কিন্তু ছেলেগুলোর মারাত্মক বিপদ হয়ে যাবে। একটাই উপায় আছে। কোনভাবে ওদেরকে চিহ্নিত করে চুপি চুপি গিয়ে ছেলেগুলোকে উদ্ধার করে আনা।'

'হুঁ!' ছেলেদের বিপদটা বুঝতে পেরে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা।

'তবে যতক্ষণ খোঁচাখুঁচি করা না হবে,' কিং বলল। 'ক্ষতি হবে না ছেলেগুলোর। পিটারকে মারবে না ওরা, তাহলে স্যার মনটেরোকে কথা শোনাতে পারবে না। কিশোরেরও ক্ষতি করবে না। করে কোনও লাভ নেই ওদের। শুধু আটকে রাখবে দু'জনকেই যতক্ষণ না ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়।'

'তা ঠিক,' চীফ বললেন। 'এখন একটাই জিনিস দেখতে হবে আমাদের, ছেলেগুলোকে নিয়ে যাতে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে ওরা। আচ্ছা, ওদের তো নানদায় যাওয়ার কথা। দক্ষিণ লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে গেল কেন? ওখানে কি আছে?'

'নিশ্চয় বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে ওরা,' হ্যারি বলল।

'চারজনকে বেরোতে হবে!' কি ভেবে হঠাৎ বলে উঠল রবিন। 'নিজেরা দু'জন, আর কিশোররা দু'জন। ওরা জানে না কোন জন পিটার। ওদের প্ল্যান ছিল তিনজনের বেরোতে হবে, চারজনের নয়। এতে কি প্ল্যানের পরিবর্তন করতে হবে না?' হ্যারি আর কিং-এর দিকে ফিরল সে। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার অন্য কারণ নেই তো? হয়ত ওখানে গিয়ে কোনভাবে সনাক্ত করতে পারবে পিটারকে।'

'আমার জানা নেই, রবিন,' কিং বলল।

'নানদাতে নিয়ে গেলে হতে পারে,' হ্যারি বলল। 'তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে নয়। আমার মনে হয় না কোনও উপায় আছে ওদের।'

মুসা বলল, 'নানদান ট্রেড মিশনে এমন কেউ নেই তো যে পিটারকে চিনতে পারবে? মানে, মনটেরোদের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু? কিংবা আত্মীয়?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল হ্যারি আর কিং। অবাক হয়েছে। এই সহজ কথাটা কেন ওদের মনে পড়েনি ভেবে।

'র‍্যামন রিভস?' যেন কিং-এর কাছে জানতে চাইল হ্যারি।

'স্যার মনটেরোর অনেক পুরনো বন্ধু অবশ্য তিনি,' আনমনে বিড়বিড় করল কিং। 'না, তাঁকে বোধহয় ফাঁকি দিতে পারবে না ছেলেগুলো। কি করে এখন...'

'এই র‍্যামন রিভসটি কে?' চীফ জানতে চাইলেন, 'আমেরিকায় কি করছেন?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে নানদান ট্রেড মিশনের প্রধান তিনি,' কিং জানাল। 'তবে ওই উগ্রপন্থীদের কিছুতেই সাহায্য করবেন না রিভস।'

'ইচ্ছে হয়ত নেই,' চীফ বললেন। 'তবে রবিনের কথাটাও না ধরে পারছি না।

পালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা তিনজন, চারজন নয়। এটা ওদের জন্যে বড় সমস্যা। এর জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠবে ওরা। মিস্টার রিভসকে বাধ্য করতে পারে পিটারকে চিনিয়ে দিতে। কিংবা চালাকি করে জেনে নেবে তাঁর কাছ থেকে। এখুনি হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার।'

'তাহলে ফোন করি,' কিং বলল। 'শয়তানগুলোকে বিশ্বাস নেই। আরেকটা ব্যাপার, মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওদের। ভেতরে নিশ্চয় ওদের স্পাই আছে। ওর সাহায্যও নিতে পারে ওরা। মিস্টার রিভসকে সতর্ক করে রাখলে তিনিও হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন। ফাঁদে ফেলে দেয়া যেতে পারে কিডন্যাপারগুলোকে।'

'করুন। এখুনি। আমার ফোনটাই ব্যবহার করুন,' চীফ বললেন।

ফোন করতে গেল কিং। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অন্যেরা। মেরিচাচী আর বসে থাকতে পারলেন না, উঠে পায়চারি শুরু করলেন।

'যদি কিছুতেই বুঝতে না পারে কোন ছেলেটা পিটার?' হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তাহলে, আমার বিশ্বাস, দুজনকেই নানদায় নিয়ে যেতে চাইবে।'

'আফ্রিকায়?' প্রায় চিৎকার করে বললেন মেরিচাচী। 'ওই শয়তানগুলো নিয়ে গেলে আর বাঁচিয়ে রাখবে...'

ফিরে এল কিং। 'মিশন অফিসে নেই রিভস। সম্ভবত হলিউডে গেছেন, জরুরী কাজে। প্রায়ই যান। অফিসের কেউ কিছু বলতে পারল না। মেসেজ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমিও ওদেরকে কিছু বলতে সাহস করলাম না। কোন লোকটা বিশ্বাসঘাতক কে জানে! এখুনি আমাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ,' তুড়ি বাজাল হ্যারি। 'লোকগুলো এখনও অফিসে না গিয়ে থাকলে ওদের আগেই আমাদের গিয়ে বসে থাকা উচিত। ঘাপটি মেরে থাকব। ওরা এলেই খপ করে ধরব।'

'ঠিক আছে,' চীফ বললেন। 'বুদ্ধিটা মন্দ না। আমি লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি। মিশন অফিসের ওপর নজর রাখুক ওরা। আপনারা যাওয়ার আগে যদি মিস্টার রিভস ফিরে আসেন তাহলে তাঁকেও যেন সতর্ক করে দেয়, বলে রাখব।'

জানালাশূন্য, অন্ধকার, একটা ছোট ঘরে বসে রয়েছে কিশোর আর পিটার। কয়েক ঘণ্টা হলো এখানে এনে ওদেরকে ভরেছে কিডন্যাপাররা। ঘরটা পাহাড়ের ওপর। চারপাশ ঘন গাছপালায় ঘেরা। এই অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

'কোথায় এনেছে, কিশোর?' পিটারের প্রশ্ন।

'হলিউড হিলের কোথাও হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'কারও বাড়ির স্টোররুম কিংবা সেলার এটা।' ঢোকানোর সময় আলো ছিল, ঘরটায় একবার নজর বোলাতে পেরেছিল সে। শক্ত করে ওদেরকে বেঁধে রেখে গেছে, তাই বেরোনোর পথ খোঁজার চেষ্টাও করতে পারছে না। যদিও কিশোরের ধারণা, খোলা রেখে গেলেও

বিশেষ সুবিধে করতে পারত না। পথ নেই, দেখেছে ঢোকার সময়ই।

'আমাদেরকে কি করবে, বল তো?' আবার প্রশ্ন করল পিটার।

'তোমাকে কি করবে, বলতে পারি। যেভাবেই হোক আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, নানদায়। তবে এখানে যে কেন রেখে গেল বুঝতে পারছি না। যদি না...'

'কী, কিশোর?'

'যদি না কারও জন্যে অপেক্ষা করে। এমন কেউ, যে তোমাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ। দু'জনকে নেয়ার কোনও ইচ্ছেই ওদের নেই। ভাবছি, তখন তোমাকে কি করবে ওরা?'

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি।

দুপুরের কড়া রোদ, বেজায় গরম। উইলশায়ার বুলভারের একটা অফিসের সামনে পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকালেন ইয়ান ফ্লেচার। বিশাল ক্যাডিলাকটা পুলিশের গাড়ির পাশে রাখল হ্যারি। চীফ গাড়ি থেকে বেরোতেই তাড়াহুড়া করে এগিয়ে এল লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন পুলিশ।

'মিস্টার রিভস ফেরেননি, চীফ,' লোকটা জানাল। 'সন্দেহজনক কোনও লোককেও অফিসে ঢুকতে দেখিনি। সারাক্ষণই চোখ রাখা হয়েছে অফিসের ওপর।'

'ওরা এখানে আসেনি, চীফ,' মুসা বলল। ইমারজেন্সি সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'কোনও সাড়া নেই যন্ত্রের।'

'বাড়ির ভেতরে ঢুকলে হয়ত সাড়া দিতে পারে,' হ্যারি বলল।

'দেখা দরকার,' বলল কিং। 'চীফ, আমার মনে হয় আপনার এখানে থাকাই ভাল। অবশ্যই লুকিয়ে থাকতে হবে। কিডন্যাপাররা যাতে দেখতে না পায়।'

দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল হ্যারি আর কিং। এলিভেটরে করে উঠে এল তিনতলায়, যেখানে রয়েছে মিশনের অফিস। বেশ সম্মান দেখিয়ে হ্যারি আর কিংকে স্বাগত জানাল রিসিপশনিস্ট মেয়েটা। রিভসের কথা জিজ্ঞেস করলে মাথা নাড়ল। কোনও খবর জানে না।

'তাঁর অ্যাসিসটেন্ট মিস ডলি জেসাপকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন,' মেয়েটা জানাল। 'নানদার হস্তশিল্পের একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, সেখানেও যেতে পারেন। তবে সারাদিন তো থাকার কথা নয়। ওরকম থাকেন না কখনও। মিস জেসাপ ফিরে এলেও জানা যেত মিস্টার রিভস কোথায় আছেন। সকাল থেকেই কয়েকবার করে দু'জনের কাছে ফোন এসেছে, কোথায় গেছে জানতে চেয়েছে, জবাব দিতে পারিনি।'

প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যেই যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। ওখানে আর থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

'আপনারা বললেন মিশনে স্পাই আছে,' মুসা বলল। 'স্পাইয়ের দরকার নেই। ওই একটা মেয়েই যে হারে কথা বলতে থাকে, সব গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

'হয়ত,' হাসল কিং। 'মেয়েটা কথা একটু বেশিই বলে। তবে আসল কথাটাই বলতে পারল না। আমরা যা জানতে চাই। রিভস কোথায়?'

'তার মানে,' হ্যারি বলল। 'মিস্টার রিভস কোথায় আছেন একথা কিডন্যাপারদেরকেও বলতে পারবে না সে।'

'তা তো বুঝলাম। এখন কি করা?' এলিভেটর দিয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন রাখল রবিন।

'অপেক্ষা আর আশা করা ছাড়া আর কি করার আছে?' কিং বলল। 'বসে থাকব। দেখব কে আগে আসে। মিস জেসাপ, মিস্টার রিভস, নাকি কিডন্যাপাররা। এছাড়া আর তো কিছু ভাবতে পারছি না।'

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পার্কিং লটে বসে বসে ঘামতে লাগল দুই গোয়েন্দা, দু'জন নানদান আর কয়েকজন পুলিশম্যান। হতাশ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ডায়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল মুসা। একবারের জন্যেও জ্বলল না লাল আলো।

'আর পারি না!' অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে মুসার কাছে। 'কিশোর আর পিটারের সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। কি করে জানব, পিটারকে চেনে এরকম আর কাউকে খুঁজে বের করেনি কিডন্যাপাররা?'

'জানার উপায় নেই,' ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আছে হ্যারি। শুধু জানি ট্রেড মিশনই ওদের একমাত্র আশা। সেজন্যেই বসে থাকতে হবে।'

অবশেষে, দুপুরের পরে, ওপরতলায় বসে যে শাদা পোশাকের পুলিশম্যানটি নজর রাখছিল, সে ওয়াকি টকিতে কথা বলল ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে। 'কালো চুলওয়ালা এক মহিলা এই মাত্র ঢুকল। এখানকারই কেউ মনে হচ্ছে। তাকে খুঁজছেন না তো?'

'মিস জেসাপ!' চেঁচিয়ে উঠল কিং। 'সে-ই হবে! গিয়ে দেখা দরকার!'

আবার ওপরতলায় ছুটে এল গোয়েন্দারা। একই রকম হাসি দিয়ে স্বাগত জানাল রিসিপশনিস্ট। 'হাল্লো, আবার এসেছেন! ভাল। মিস্টার রিভসের কোনও খবর নেই। তবে মিস জেসাপ ফিরেছে। ওর সঙ্গে দেখা করবেন? মিস্টার রিভসের অফিসে আছে।'

কোণের দিকে মিস্টার রিভসের অফিস। সেদিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মুসা। কান পেতে শুনছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

'অফিসে কথা শোনা যাচ্ছে। মিস জেসাপই বলছে হয়ত কারও সঙ্গে।'

হ্যারিও কান পাতল। 'কই, আমি তো শুনছি না।'

'কি জানি,' গাল চুলকাল মুসা। 'আমার ভুলও হতে পারে।'

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। মিস্টার রিভসের ডেস্কের কাছে

দাঁড়িয়ে কাগজপত্র ঘাঁটছে মিস ডলি জেসাপ। গায়ে সবুজ ব্লাউজ। পরনে ধূসর স্ল্যাকস। ওদেরকে দেখে চকচক করে উঠল চোখ, 'পিটারকে পেয়েছেন?'

'পেয়েছি,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিং। 'তারপর আবার হারিয়েছি।'

'হারিয়েছেন?' ধীরে ধীরে ডেস্কের ওপর থেকে একটা কানের দুল তুলে নিয়ে পরতে লাগল মিস জেসাপ।

'সারাদিন কোথায় ছিলে, ডলি?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল। 'মিস্টার রিভসের সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল ডলি।

'পিটারের কথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে?'

'না তো। কেন?'

'কিডন্যাপাররা পিটারকে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ধারণা,' কিং বলল। 'মিস্টার রিভসের কাছে যাবে ওরা পিটারকে সনাক্ত করার জন্যে…'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ডলি। 'মিস্টার রিভস তা পারবেন! ওরা তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। জলদি হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার!'

'তাঁকে পাব কোথায়?'

ঘড়ি দেখল ডলি। 'দুটো জায়গার কোনও একটাতে হতে পারে। হ্যাণ্ডিক্র্যাফট ইমপোর্টার গিল্ড, কিংবা দি আর্টস অভ আফ্রিকা। ওই দুটো জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বিকেল পাঁচটার আগেই সারতে হবে।'

'দেড় ঘণ্টা বাকি,' হিসেব করে বলল হ্যারি। 'একসঙ্গে গেলে সময় পাব না। ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে।'

'জলদি চলুন,' রবিন বলল।

দুটো জায়গার ঠিকানা লিখে দিল ডলি। দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের দিকে চলল চারজনে। যে মুহূর্তে এলিভেটরের দরজা বন্ধ হলো, ঘুরে তাকাল মুসা, 'মিস্টার কিং! ও মিথ্যে বলেছে! গাধা বানানোর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে!'

আঠারো

'মানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'কি করে বুঝলে?' হ্যারির প্রশ্ন।

'ভুল করছ তুমি, মুসা,' কিং বলল। 'ওই মেয়েটাকে বহু বছর ধরে চিনি আমি।'

'না, ভুল আমি করছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা। 'ডলি বলেছে মিস্টার রিভস তা পারবেন। আরও বলেছে, ওরা তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

বিস্ময় ফুটল কিং-এর চোখে। 'ঠিকই তো বলেছে। আমরা সবাই সেটা জানি।'

'জানি। কিন্তু আমরা একবারও বলিনি ডলিকে যে পিটার আর আরেকটা

ছেলেকে নিয়ে কোনও গোলমাল হয়েছে। বলিনি কিডন্যাপাররা দু'জনকে ধরে নিয়ে গেছে। তাহলে কি করে জানল সে, বোকা বানানো হয়েছে কিডন্যাপারদেরকে? পিটারকে সনাক্ত করা দরকার?'

চুপ হয়ে রইল অন্য তিনজন। এলিভেটর নিচে নামলে বেরিয়ে এল সবাই। অবশেষে হ্যারি বলল, 'ও ঠিকই বলেছে। ট্রেড মিশনের কেউই জানে না এ খবর। ডলি জানল কিভাবে?'

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'রকি বীচের বাইরে একমাত্র পুলিশ জানে। আর তারা নিশ্চয় ঢোল পিটিয়ে বলতে যাবে না ট্রেড মিশনের অফিসে।'

'এর একটাই মানে,' মুসা বলল। 'ডলির সঙ্গে কিডন্যাপারদের যোগাযোগ রয়েছে।'

'তা কি করে হয়?' প্রশ্ন তুলল কিং। 'সারাটা দিন সে মিস্টার রিভসের সঙ্গে সঙ্গে ছিল।'

'সেটা তার মুখের কথা। প্রমাণ তো আর নেই।'

'মিস্টার রিভসকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। ডলি মিছে কথা বলে থাকলে ফাঁস হয়ে যাবে।'

'এক মিনিট!' হাত তুলল রবিন। 'মুসার মনে হয়েছিল সে অফিসে কথা বলতে শুনেছে। আমরা শুনিনি। সে ভুল করেছে ভেবেছি। কারণ ডলি অফিসে একা, কার সঙ্গে কথা বলবে? ডেস্ক থেকে একটা কানের দুল তুলে তাকে পরতে দেখেছি। আমি যতটা জানি, কিশোরও অনেকবার বলেছে, টেলিফোনে কথা বলার সময়ই শুধু ওরকম ভাবে দুল খুলে নেয় মহিলারা। অস্বাভাবিক বড় দুল যারা পরে। কানে থাকলে রিসিভার চেপে ধরতে অসুবিধে হয়। হতে পারে টেলিফোনে কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলেছিল সে। মনে আছে, রিসিপশনিস্ট বলেছিল, সকাল থেকে অনেক ফোন এসেছে মিস জেসাপের কাছে? অনেকে নাকি খুঁজেছে। বাজি রেখে বলতে পারি এখন, কিডন্যাপাররাই যোগাযোগ করতে চেয়েছে ডলির সঙ্গে।'

'কিং,' মুসা বলল। 'আপনি বলছেন, অনেক বছর ধরে চেনেন ডলিকে। তার মানে তার সঙ্গে কাজ করেছেন। ডলি কি স্যার মনটেরোর সঙ্গেও কাজ করেছে? পিটারকে দেখলে চিনবে?'

'আমি শিওর না,' ভ্রূকুটি করল কিং। 'অনেক বছর ধরে স্যার মনটেরোর অফিসে কাজ করেছে অবশ্য, তবে মিস্টার রিভসের মত তাঁর পারিবারিক বন্ধু নয়। পিটারকে চিনতে পারবে কিনা জানি না। তবে বলাও যায় না। চিনেও ফেলতে পারে। ঈশ্বর, তাই তো, এখন মনে হচ্ছে সে-ই! পিটারের মেসেজটা তার হাত দিয়েও বেরিয়ে যেতে পারে!'

পার্কিং লটের দিকে দৌড় দিল চারজনে। ইয়ান ফ্লেচারকে জানাল সন্দেহের কথা।

'ওকে ধরা দরকার!' ফুঁসে উঠল হ্যারি। 'চাপ দিলেই…'

'না,' রাজি হলেন না চীফ। 'লাভ হবে না। উগ্রবাদীদের দলে হলে ভীষণ শক্ত

হবে। কিছুতেই মুখ খুলবে না। আপনাদেরকে ভুল জায়গায় পাঠাতে চেয়েছে। তার মানে সময় চেয়েছে সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। দেখা করার জন্যেও হতে পারে। আর তা করলে সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'ঠিকই বলেছেন,' মুসা বলল। 'সে ভাববে আমরা মিস্টার রিভসের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছি। এই সুযোগে সে চলে যাবে কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'হ্যাঁ। আমি পুলিশকে বলে যাচ্ছি এখানে থেকে অফিসের ওপর নজর রাখতে,' চীফ বললেন। 'তারপর আমার গাড়িতে করে তোমাদেরকে নিয়ে সরে যাব এখান থেকে, ডলি ভাববে আমরা চলে গেছি। ঘুরে আবার আরেক দিক দিয়ে চলে আসব। লুকিয়ে উঠে পড়ব ক্যাডিলাকে। ওকে অনুসরণ করব। আমাদেরকে পুলিশ কারে করে চলে যেতে দেখবে সে। কাজেই একটা ক্যাডিলাক পিছু নিলে খেয়াল করবে বলে মনে হয় না।'

বুদ্ধিটা ভাল। সবারই মনে ধরল। চীফের কথামতই কাজ করা হলো।

পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এল ডলি জেসাপ। একটা লাল পনটিয়াকে উঠল। গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলল হ্যারি আর কিং-এর ক্যাডিলাক।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে কিশোর আর পিটার। অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে একই ভাবে।

'আর আমাদের খুঁজে পাবে না তোমার বন্ধুরা,' পিটার বলল।

'পাবেই! আমি জানি, ওরা পাবেই! খুঁজে বের করবেই আমাদের!'

হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো। ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ করে দিল যেন ছেলেদের। ভেতরে ঢুকেছে দুই কিডন্যাপার। কিশোরের দিকে এগিয়ে এল জন, পিটারের দিকে ডেভ। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল দু'জনের শার্ট।

পিটারের দিকে তাকিয়ে ডেভ বলল, 'ভেরি গুড। খেল তাহলে খতম, অ্যাঁ?'

'কিশোরের দিকে তাকাল পিটার। তার পেটে ছোট একটা কাটা দাগ রয়েছে। কিশোরের তেমন দাগ নেই।

'এবার কি বলবে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে জন। 'ওরকম একটা দাগ তোমারও করে নেয়া উচিত ছিল।'

হলিউড হিলের একটা ছোট বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল লাল পনটিয়াক। থামল। বেরিয়ে এল ডলি। দৌড়ে এগোল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল বারান্দায়। দুটো বাড়ি আগে একটা মোড়ে থেমে গেল ক্যাডিলাক। ইমারজেন্সি সিগন্যালের দিকে তাকাল মুসা।

'না, কিছু নেই,' হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'মনে হয় কিশোরের যন্ত্রটা পেয়ে গেছে কিডন্যাপাররা। অফ করে দিয়েছে। কিংবা ওরা এখানে নেইই।'

'তাহলে কি আমাদের ভুল হলো?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল হ্যারি।

'না,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'ওই মেয়েটা কিডন্যাপারদের দলেরই।'

'চল,' কিং বলল। 'বাড়িতে ঢুকে পড়ি। তারপর যা হয় হবে।'

গাড়ি রেখে হেঁটে এগোল দলটা। নিঃশব্দে দ্রুত চলে এল বাড়ির আঙিনায়। লম্বা লম্বা গাছ, লতা আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল হয়ে আছে বাড়ির চারপাশে। সামনের দরজার কাছে এসে কান পাতল ওরা। কথা শোনা গেল না। শুধু কাঠের মেঝেতে ডলির হাই হিলের খটখট শব্দ। কলিং বেল বাজাল কিং। দরজা খুলে হাঁ হয়ে গেল ডলি।

'এখানে কি?' খেঁকিয়ে উঠল সে। পরক্ষণেই হাসল, অস্বস্তি আর ভয় মেশানো হাসি। সরে জায়গা করে দিল সবাইকে ঢোকার জন্যে। একটা লিভিং রুমে নিয়ে এল। 'মিস্টার রিভসকে পেয়েছেন? কিডন্যাপাররা তাঁর কাছে গিয়েছিল?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি আমরা,' হ্যারি বলল।

'কারণ,' কিং বলল। 'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার দরকার নেই কিডন্যাপারদের। পরে মনে হয়েছে আমাদের।'

'আপনাকে চুপ থাকতে অনুরোধ করব,' শান্তকণ্ঠে ডলিকে সাবধান করলেন চীফ। 'কারণ বেফাঁস যা কিছু বলবেন এখন আদালতে সব যাবে আপনার বিরুদ্ধে।'

'ওরা কোথায়?' ভুরু নাচাল মুসা। 'পিটার আর কিশোর?'

'কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আপনি,' রাগ চাপতে পারল না রবিন। 'জানি আমরা। ওরা কোথায়? কি করেছে কিশোর আর পিটারকে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ডলি। নিরাশ ভঙ্গিতে হাত ছড়াল দু'পাশে। 'কি বলছ বুঝতে পারছি না। এই কিশোরটি কে? কোনও কিশোরকে তো চিনি না আমি? আর আমি কি করে জানব পিটার কোথায় আছে?'

'খুব ভাল করেই জান এখন তুমি,' কড়া গলায় বলল কিং। 'কিশোর কে। আর পিটারের কি হয়েছে তা-ও জান, কারণ কিডন্যাপারদের দলেরই লোক তুমি।'

'আমি!' হাঁ হয়ে গেল ডলি। 'আমি? মানে আমি পিটারের ক্ষতি করব? বহু বছর আমি স্যার মনটেরোর কাজ করেছি। আমি তাঁর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'কেন মিথ্যে বলছ?' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যারি। 'চীফ, বাড়িটা খুঁজে দেখা দরকার।'

'তার জন্যে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে!' কঠিন হয়ে উঠল ডলির কণ্ঠ। তারপর কি ভেবে মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, দেখুন। যত খুশি দেখুন। আমার তো আর কিছু লুকানোর নেই। তবে মনে অনেক কষ্ট দিলেন আমাকে।'

'আমিও কি দিয়েছি?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'আপনি?' পলকের জন্যে রাগে বিকৃত হয়ে গেল ডলির মুখ। তারপর জোর করে হাসল। 'হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম, আপনিও দিয়েছেন।'

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' চীফ বললেন। 'খুঁজুন তো।'

ছড়িয়ে পড়লেন চীফ, হ্যারি, রবিন আর মুসা। লিভিং রুমে ডলির সঙ্গে রইল কিং।

'এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে, কিং,' শাসিয়ে বলল ডলি। 'কিডন্যাপারদের ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি। কিংবা ওই দুটো ছেলের

ব্যাপারে।'

'ছেলে যে দুটো কি করে জানলে?'

'একটু আগেই তো বললেন কিশোর নামে আরও একটা ছেলে রয়েছে।'

'না, কিশোর নামে আরেকটা ছেলে রয়েছে ওভাবে একবারও বলিনি। ছেলে কেন, বয়স্ক মানুষও হতে পারে কিশোর। কিন্তু তুমি একেবারে নিশ্চিত ভাবে বলে দিলে সে ছেলে। তারমানে তুমি জান। এই নিয়ে দু'বার মুখ ফসকাল তোমার। একবার অফিসে, একবার এখানে। তা কিডন্যাপারদেরকে চিনিয়ে দিয়েছ নাকি, পিটার কোনজন?'

'আর একটা কথাও বলতে চাই না আপনার সঙ্গে!'

ভেতরের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন আর হ্যারি। আরেক দিক থেকে এলেন ফ্লেচার আর মুসা। ডলির মুখোমুখি দাঁড়াল রবিন। 'কিছু কথার জবাব দিতে হবে আপনাকে, মিস জেসাপ।'

'ছেলেদেরকে দিয়েও আমাকে অপমান করাতে চান নাকি?' কিং-এর দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল ডলি।

কিং কিছু বলল না। রবিন তার কথা বলে গেল, 'আমার বন্ধু কিশোর বলে, ছোটখাট ব্যাপারও অবহেলা করতে নেই গোয়েন্দাগিরিতে। যাই হোক, আপনি একজন নানদান। এবং আমার বিশ্বাস, ওখানকার জুয়েলারি আপনার খুব পছন্দ।'

'কি বকবক করছে এই ছেলেটা?' কিং-এর দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল ডলি। 'দেখুন, আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করছি...'

পকেট থেকে হাত বের করল রবিন। হাতে হাতির দাঁতের তৈরি ছোট একটা গহনা। কানে পরার জন্যে। বলল, 'এটা আপনার বেডরুমে পেয়েছি, মিস জেসাপ। কানের দুল, তাই না? নানদার মেয়েরা পরে। মাত্র একটাই আছে। আরও একটা থাকার কথা ছিল, নেই। কারণ ওটা হারিয়ে গেছে। আবার পেয়েছি। সেই বক্স ক্যানিয়নে, যেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিশোরকে। কিডন্যাপারদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে ওখানে নেমেছিল হেলিকপ্টারটা।'

হাতির দাঁতের তৈরি খুদে হাতির দাঁতটার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডলির মুখ।

'কিশোর বলে,' বলতে থাকল রবিন। 'কোনও মহিলাই তার পছন্দের জিনিস ফেলে না, বিশেষ করে গহনা। একটা দুল হারিয়ে গেলে আরেকটা পরা যায় না, তবু রেখে দেয়। মহিলাদের স্বভাব। আপনিও মহিলা। একটা হারিয়ে এসেও আরেকটা ফেলতে পারেননি। আপনি স্যার মনটেরোর শত্রু, মিস জেসাপ। সেদিন ক্যানিয়নে আপনিই হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিলেন। পাইলট ছিলেন আপনিই। তখনই কোনভাবে আপনার কান থেকে দুলটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।'

উনিশ

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'ফ্লাইং স্যুট আর গগলসের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একজন মহিলা!'

'ও-ই পাইলট ছিল কিনা,' চীফ বললেন। 'সেটা শিওর হতে হবে আমাদের।'

'তা হওয়া যাবে,' কিং বলল। 'যাদের কাছ থেকে হেলিকপ্টার ভাড়া নিয়েছিল তাদের কাছে গেলেই হবে। নিশ্চয় কণ্ঠস্বর চিনতে পারবে ওরা।'

'আর কানের দুলটা তো আছেই,' হ্যারি বলল। 'প্রমাণ।'

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডলি। ঘৃণা আর রাগ ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। আচমকা হেসে উঠল খিলখিল করে; 'বেশ, আমিই পাইলট ছিলাম, হেলিকপ্টার চালিয়েছি। স্বীকার করছি। তাতে দোষের কি আছে? আমি একজন নানদান। দু'শো বছর ধরে ওখানে বাস করছে আমার বাপ-দাদারা।'

'আর আমরা বাস করছি দু'হাজার বছর ধরে,' বলল কালো চামড়ার নানদান, হ্যারি। 'আমরা তোমাদেরকে দয়া করে জায়গা দিয়েছি আমাদের দেশে, নানদা বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওটা আমাদের দেশ।'

'কক্ষণো না!' হিসিয়ে উঠল ডলি।

চীফ বললেন, 'আপনাদের দেশ, আপনাদের পলিটিকস, সেটা আপনাদের ব্যাপার। ওসব নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এটা নানদা নয়, আমেরিকা। এখানে এসে দুটো ছেলেকে কিডন্যাপ করেছেন।' ডলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি এখন কিডন্যাপারদের একজন। সেই বিচার হবে, শাস্তি আপনাকে মেনে নিতেই হবে।' সাংঘাতিক কঠোর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ, 'ছেলেদুটো কোথায়? পিটার আর কিশোর?'

'ছিল এখানেই,' ডলি জবাব দিল। 'এখন নেই। জন আর ডেভ এসে নিয়ে গেছে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল কিং।

'সেটা কোনদিনই তোমাকে বলব না আমি। পিটার এখন আমাদের কজায়। স্যার মনটেরোকে যা করতে বলব তাই করতে বাধ্য হবেন তিনি।'

'না, অত আশা কোরো না। তিনি কোনদিনই তোমাদের কথা শুনবেন না। নিজের ছেলের প্রাণের বিনিময়েও না। যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় নানদার ভবিষ্যৎ।'

'একমাত্র ছেলের জীবনের ঝুঁকি নেবেন?'

'নেবেন। আরও বড় ঝুঁকি হলেও নেবেন,' হ্যারি বলল।

চীফ রেগে গেলেন, 'জাহান্নামে যাক নানদা! আমি এখানকার পুলিশ। আমেরিকার। আমেরিকায় বসে কিডন্যাপিঙের মত মস্ত একটা অপরাধ করেছেন আপনি, মিস জেসাপ। ভাল চান তো ছেলেগুলো কোথায় আছে বলুন।'

'আমি একজন সৈনিক, দেশপ্রেমিক,' জবাব দিল ডলি। 'কিডন্যাপার নই। কিছুতেই মুখ খোলাতে পারবেন না আমার। ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে জন আর ডেভ। ওদেরকে ধরার সাধ্য নেই আর আপনাদের।'

চীফের মুখের ওপর হেসে উঠল সে। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন চীফ, হ্যারি, কিং, রবিন আর কিশোর। ডলি মুখ না খুললে কি করে জানা যাবে পিটার আর কিশোর কোথায় আছে? সবাই কিছুটা হতাশ, রবিন বাদে। চিন্তিত

ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ডলির দিকে। 'এখানে কিডন্যাপাররা না এসে থাকলে কি করে জানবে কে কিশোর আর কে পিটার?' ধীরে ধীরে বলল সে। 'নিশ্চয় মিস জেসাপ বলেছেন ওদেরকে। টেলিফোনে।'

হেসে উঠল ডলি। 'অবশ্যই বলেছি। সহজ ব্যাপার। পিটারের পেটে ছোট একটা কাটা দাগ আছে। কয়েক বছর আগে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করা হয়েছিল তার।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তবে সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি জন আর ডেভ যদি মিস জেসাপ আসার আগেই চলে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি এত তাড়াহুড়া করে অফিস থেকে চলে এলেন কেন? আসারই বা কি প্রয়োজন ছিল? জবাব একটাই। ফোনে সঙ্গীদের বলে দিয়েছেন, কিভাবে পিটারকে সনাক্ত করতে হবে। ওরা তখন পিটারকে চিনে নিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করতে লাগল। মিস জেসাপও চলে এলেন। নিশ্চয় কোনও জরুরী কাজ আছে।'

'ঠিক,' একমত হয়ে মাথা দোলালেন চীফ। 'রবিন ঠিক বলেছে। নইলে এত তাড়াহুড়া করে অসময়ে বাড়ি আসতে যাবেন কেন মিস জেসাপ?'

'এটা আমার বাড়ি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ডলি। 'যখন খুশি আমি আসতে পারি এখানে।'

'তা পারেন,' রবিন স্বীকার করল। 'তবে এত তাড়াহুড়া কেন? আমার কি মনে হয় জানেন? পিটারকে নিয়ে চলে যাবে আপনার বন্ধুরা। কিশোরকে ফেলে যাবে। তাকে পাহারা দিতেই আপনার এই আসা।'

'কিশোর?' ভুরু কোঁচকালেন চীফ।

'হ্যাঁ, ঠিক!' তুড়ি বাজাল হ্যারি। 'অহেতুক নানদায় বয়ে নিয়ে যাবে না ওরা কিশোরকে। ওদের দরকার পিটারকে। একলা তাকেই নেবে। দুটো ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি।'

'তার মানে এখানেই আছে এখনও কিশোর!' বলে উঠল মুসা।

'খোঁজ, খোঁজ, আবার খোঁজ!' নির্দেশ দিলেন চীফ।

এবার ডলির পাহারায় রইল হ্যারি। অন্যেরা ছড়িয়ে গেল খোঁজার জন্যে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি আলমারি, মোট কথা একজন মানুষ লুকিয়ে থাকার মত যত জায়গা আছে সব খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল। বেশিক্ষণ লাগল না সব দেখতে। কিশোরের চিহ্নও দেখতে পেল না।

'বাইরে দেখা দরকার,' কিং বলল। 'গ্যারেজে। ছাউনি-টাউনিও থাকতে পারে।'

ওদেরকে বাইরে বেরোতে দেখে মুচকি হাসল ডলি। গ্যারেজ বাদে ছোট একটা ছাউনি আছে। ছাউনির ভেতরে পাওয়া গেল শুধু বাগান করার যন্ত্রপাতি। গ্যারেজের ভেতরে কিছুই না। বাড়ির আশপাশে পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা খুঁজে দেখল মুসা। কিশোরের চিহ্নও পেল না।

আবার ঘরে ফিরে এল দলটা।

টিটকারির সুরে ডলি বলল, 'বলেছিলাম না, নেই। পাবে না। কিং, হার

স্বীকার করতেই হলো তোমাদেরকে। পরাজয় মেনে নিতে লজ্জা কিসের? দেখো, তোমাদের স্যার মনটেরোকেও কজা করে ছাড়ব আমরা।'

'আবার খোঁজ!' কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে রাজি নন ইয়ান ফ্লেচার। রাগে পিত্তি জ্বলছে তাঁর, কিন্তু কিছুই করার নেই। কথা আদায় করা যাচ্ছে না ডলির মুখ থেকে, রাগটা তাঁর এ জন্যেই।

অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়ির চারপাশে গাছপালা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না শেষ বিকেলের রোদ। বিছানার নিচে আর আলমারিগুলোতে আবার খোঁজার জন্যে আলো জ্বেলে নিতে হল।

'চীফ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

মিটমিট করতে শুরু করেছে বাল্বগুলো।

'কি ব্যাপার?' অবাক হয়েছে হ্যারি। 'বৈদ্যুতিক গোলমাল?'

জ্বলছে নিভছে...জ্বলছে নিভছে...কিছুতেই ঠিক হতে চাইছে না যেন আলো।

'আকাশ তো ভালই,' জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল রবিন। 'আবহাওয়ার জন্যে এরকম হচ্ছে না। গরমও তেমন নেই যে সার্কিটে ওভারলোড হয়ে যাবে।'

জ্বলছে নিভছে...জ্বলছে নিভছে...নিয়মিত।

'যেন ইচ্ছে করে করছে কেউ,' কিং অনুমান করল। 'মাস্টার সুইচ নিয়ে কিছু করছে না তো? কিংবা ফিউজ...'

'নিশ্চয় কিশোর!' আবার চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'সংকেত দেয়ার চেষ্টা করছে! আশপাশেই আছে কোথাও!'

'কিন্তু কোথায়?' ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগলেন চীফ। 'সমস্ত জায়গায়ই তো খোঁজা হয়েছে।'

'ওই মহিলা জানে!' ডলির দিকে আঙুল তুলে বলল রবিন।

হাসি মুছে গেছে ডলির মুখ থেকে।

'চীফ,' মুসা বলল। 'ঢালের ওপর তৈরি হয়েছে বাড়িটা। পেছন দিকের ভিত মাটিতে গাড়া হয়েছে, কিন্তু সামনের দিকটা পিলারের ওপর। মেঝের নিচে ফাঁকা জায়গা আছে। গোপন সেলার-টেলার থাকলে অবাক হব না।'

ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। ফিরে এল একটু পরেই। জানাল, 'কংক্রীটের ভিতের ওপর তৈরি হয়েছে বাড়িটা। বিরাট একটা বাক্সের মত হয়ে আছে নিচেটা। ভেতরে ফাঁকা থাকতেই পারে। তবে ঢোকার পথ দেখলাম না।'

'বাইরে না থেকে থাকলে,' রবিন বলল। 'ভেতরে আছে।'

'সরাও!' নির্দেশ দিলেন চীফ। 'সমস্ত কার্পেট সরিয়ে ফেলো। বিছানার নিচে আবার দেখো। ট্র্যাপডোর থাকতে পারে। আলমারির ভেতরেও গোপন দরজা থাকতে পারে।'

বেডরুমের সব চেয়ে বড় আলমারিটাতে পথ পেয়ে গেল রবিন। আলমারির নিচে। একটা ট্র্যাপডোর। সরু মই নেমে গেছে নিচের অন্ধকারে।

আলমারির ভেতরেই আলোর সুইচ খুঁজে পেল মুসা। জ্বেলে দিল। নিচের সেলারে জ্বলতে নিভতে আরম্ভ করল একটা বাল্ব। মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল ওরা

জানালাশূন্য একটা ঘরে। অনেক মদের বোতল আর বাতিল আসবাব পড়ে রয়েছে। আর রয়েছে···

'কিশোর!' চিৎকার করে বলল রবিন।

'কিশোর!' মুসাও চেঁচাল।

খুদে সেলারের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। পিঠের ওপর নিয়ে গিয়ে হাত বেঁধেছে। মুখে কাপড় গোঁজা। পুরনো ধাঁচের একটা সুইচ বক্সের হাতলে পা ঠেকানো। মাস্টার সুইচের হাতলে লাথি মারলেই নিভে যাচ্ছে আলো, আবার জ্বলে উঠছে।

'আমরা বুঝেছি,' মুসা বলল, 'তুমিই সংকেত দিচ্ছ।'

তাড়াতাড়ি কিশোরের মুখের কাপড় খুলে নিল রবিন। বাঁধন খুলে দিল।

'তোমাদের কথা অনেকক্ষণ থেকেই শুনছি,' কিশোর বলল। 'খোঁজাখুঁজি করছ তা-ও বুঝতে পারছিলাম। শেষে তো ভয়ই হচ্ছিল, পাবে না ভেবে···'

'তুমি সংকেত দেয়াতে ভাল হয়েছে,' মুসা বলল।

'নইলে সত্যিই হয়ত পেতাম না,' বলল রবিন। 'তবে মুসা আন্দাজ করে ফেলেছিল, সেলারে আটকে রাখা হয়েছে তোমাকে।'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। 'এখন বলে ফেল তো, কি করে এখানে এসে খুঁজে বের করলে আমাকে?'

সংক্ষেপে তাকে সব কথা জানাল রবিন আর মুসা।

'চমৎকার!' প্রশংসা করল কিশোর। 'ভাল গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ তোমরা ইদানীং। ভেরি গুড।'

কিশোরের প্রশংসা পাওয়া খুব কঠিন। খুশি হল দুই সহকারী। একনাগাড়ে বসে থেকে থেকে হাত-পা ঝিমঝিম করছে কিশোরের। তাকে মই বেয়ে উঠে বেরোতে সাহায্য করল রবিন আর মুসা। নিয়ে এল লিভিং রুমে। তার পিঠ চাপড়ে দিলেন ইয়ান ফ্লেচার।

'তুমি ভাল আছ, কিশোর?' কিং বলল, 'সত্যিই খুব খুশি লাগছে। তোমার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।'

'রবিন আর মুসার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত,' হেসে বললেন চীফ।

'হয়েছি।' চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। 'পিটার কোথায়? তাকে নিয়ে গেছে নাকি কিডন্যাপাররা?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

'তোমাদের ছাগল পেয়েছ,' রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল ডলি। 'এবার কেটে পড়তে পারো। জন আর ডেভকে ধরার চেষ্টা করলে অহেতুক সময় নষ্ট করবে। পিটারকে হাতে পেয়েছে ওরা। হাওয়া হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

সবাইকে নিরাশ মনে হলো, বিশেষ করে কিং আর হ্যারিকে। কেবল কিশোরের মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। ডলির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'দাঁড়ান, ছাগলই ভেড়া বানাবে আপনাদের। হাওয়া হয়ে গেছে বলছেন তো। পারবে না। আমি কিশোর পাশা থাকতে অন্তত না।'

বিশ

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে খবর দিলেন ইয়ান ফ্লেচার। তারা এসে গ্রেপ্তার করল ডলিকে। তারপর কিশোরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্যান ডিয়েগো পুলিশকে রেডিওতে খবর পাঠাল। নানদানদের ক্যাডিলাকটা ছুটে চলল মেকসিকো সীমান্তের দিকে।

'এখন বল তো, কিশোর,' চীফ জিজ্ঞেস করলেন। 'পিটারকে নিয়ে যাওয়া ঠেকাব কি করে?'

'ঠিক বলতে পারছি না এখনও। তবে সুযোগ আছে। পিটারকে সনাক্ত করার পর তাকে ওপরে তুলে নিয়ে গেল। তারপর ওদেরকে ফোনে কথা বলতে শুনেছি।'

'কার সঙ্গে?'

'ওদের সহকর্মীদের সঙ্গে, আমার বিশ্বাস। সহকারীরা রয়েছে মেকসিকোর টিজুয়ানায়। ওরা বলল, 'এবার পিটারকে ধরেছে, কোনও সন্দেহ নেই। আর প্ল্যান মোতাবেকই বেরিয়ে যাবে।'

'প্ল্যানটা কি?'

'জানি না। ও সম্পর্কে কিছু বলেনি ওরা।'

'তাহলে কি করে…?' বলতে গিয়ে বাধা পেল কিং।

'কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে,' কিশোর বলল। 'কিডন্যাপাররা মেকসিকো সীমান্তের কাছে টিজুয়ানায় কারও সঙ্গে দেখা করবে। টিজুয়ানা দিয়ে মেকসিকো সীমান্ত পার হবে ওরা।'

'কিন্তু সেটা কখন?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ। 'যে কোনও সময় পেরোতে পারে ওরা।'

'ওরা বলেছে স্যান ডিয়েগোতে কাজ আছে ওদের। সীমান্ত পেরোনোর আগে কিছুক্ষণ থামবে ওখানে। সীমান্ত পার হবে রাত দশটায়।'

'আর ঠিক ওই সময় আমরা গিয়ে বসে থাকব ওখানে!' কিং বলল। 'ভালই হবে, খুব ভাল!'

'ওদের প্ল্যান জানার আমাদের কোনও দরকার নেই,' চীফ বললেন। 'কার সঙ্গে দেখা করবে সেটাও জানা লাগবে না। ওসব ছাড়াই ওদেরকে আটক করতে পারব আমরা।'

'সে রকমই আশা করছি,' কিশোর বলল।

'কিশোর,' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'পিটারকে নিয়েই সীমান্ত পেরোবে তো? মানে, এতটা খোলাখুলি যাওয়ার সাহস করবে? ছদ্মবেশ নেবে না তো? কিংবা পিটারকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা?'

'তাই তো!' মুসা কথাটা ধরল। 'পুলিশ যে ওদের পিছে লাগতে পারে এটা না বোঝার মত বোকা নিশ্চয় নয় ওরা। সীমান্তেও কড়া নজর রাখা হতে পারে, এই সন্দেহও করতে পারে ওরা।'

'তা পারে,' মাথা দোলাল কিং। 'তাহলে চিনব কি করে ওদেরকে? পুলিশই বা বুঝবে কিভাবে?'

'সেটা আমাদের কাজ,' আশ্বস্ত করলেন চীফ। 'ছদ্মবেশী লোককে কি করে চিনতে হয়, সে ব্যাপারে ট্রেনিং আছে আমাদের।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। দক্ষিণে ছুটে চলেছে ক্যাডিলাক। স্যান ডিয়েগোতে পৌছতে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। ন'টার বেশি বেজেছে। সোজা সীমান্তের দিকে যেতে দেখল স্যান ডিয়েগো পুলিশের দুটো পেট্রল কারকে।

'আধ ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে,' ঘড়ি দেখে বলল কিশোর। 'তার পরে যে কোনও মুহূর্তে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করতে পারে কিডন্যাপাররা।'

'ওরা,' কিছুটা হতাশার সুরেই বলল মুসা। 'এবং আরও হাজারও মানুষ। সব সময়ই পেরোয়।'

অনেকগুলো লেন এগিয়ে গেছে সীমান্তের দিকে। অসংখ্য গাড়ি, বাস, আর ট্রাকের সারি যেন স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে সেদিকে। সবাই সীমান্ত পেরোবে। প্রতিটি গাড়ির প্রায় বাম্পারে বাম্পারে লেগে যাচ্ছে, এতই কাছাকাছি। চেক পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে। চেক হয়ে যাওয়ার পর ঢুকে পড়ছে মেকসিকোতে।

'এগুলোর মাঝে কি করে চিনবেন ওদেরকে, চীফ?' কিং-এর প্রশ্ন।

'লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা বর্ডার গার্ডকে দিয়ে দিয়েছে স্যান ডিয়েগো পুলিশ। ওদের লিংকন গাড়িটার বর্ণনা। এবং অবশ্যই পিটারেরও। মেকসিকান পুলিশ। কড়া নজর রাখবে। সন্দেহজনক লোক দেখলেই প্রশ্ন শুরু করবে।'

'আর আমরা তখন কি করব?' হ্যারি জানতে চাইল।

'বসে বসে নজর রাখব।'

রাস্তার পাশে এমন জায়গায় গাড়ি রাখা হলো, যাতে একযোগে সমস্ত লেনগুলো চোখে পড়ে। স্যান ডিয়েগো পুলিশের একটা গাড়িকে দেখা গেল সেন্টার বর্ডার বুদের কাছে। আরেকটা বেশ কিছুটা দূরে। সময় কাটছে। দশটা বাজতে দশ।

'দেখুন!' হাত তুলল কিং। 'একটা নীল লিংকন!'

সীটের একেবারে কিনারে বসে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাডিলাকের দর্শকরা। বিরাট নীল গাড়িটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে চেক পয়েন্টের দিকে। ভেতরে উঁকি দিল সীমান্ত প্রহরীরা। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে সতর্ক নজর রাখল স্যান ডিয়েগো পুলিশ। অনেকক্ষণ কথা বলল প্রহরীরা। তারপর সরে হাত নেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিল গাড়িটাকে।

'ওরা নয়!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'হলে এমন ছদ্মবেশ নিয়েছে,' হ্যারি বলল। 'পুলিশ চিনতে পারেনি। ধোঁকা খেয়েছে।'

'ছদ্মবেশে ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারবে বলে মনে হয় না আমার,' মাথা নাড়লেন চীফ। 'বর্ডার গার্ডেরা এমনিতেই ভীষণ সতর্ক আর চালাক। তার ওপর হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। তিনগুণ সতর্ক হয়ে গেছে ওরা। পিটারের বয়েসী

কাউকে দেখলে সহজে ছাড়বে না। দরকার হলে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করবে।

'কিন্তু কিডন্যাপাররা কি সেটা জানে না?' রবিন প্রশ্ন তুলল।

'নিশ্চয় জানে, রবিন,' জবাবটা দিল কিশোর। 'সেজন্যেই লুকিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। এমন কোনও গাড়িতে করে যেটা নিয়মিত সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করে, এবং যেটার দিকে প্রহরীদের নজর কম।'

যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'ওই বাসগুলোর মত?'

দুটো বাস এগিয়ে গিয়ে থামল চেক পয়েন্টের কাছে। ওগুলোতে উঠল স্যান ডিয়েগো পুলিশ। ক্যাডিলাকের দর্শকেরা দেখতে পেল সীটের সারির মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পুলিশেরা। প্রতিটি যাত্রীর চেহারা দেখছে। নেমে এল এক সময়। হাত নেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল বাসদুটোকে।

'নাহ্, হবে বলে মনে হচ্ছে না,' হ্যারির কণ্ঠে হতাশা।

'আমি…আমি আশা ছাড়তে পারছি না,' কিশোর বলল। তাকিয়ে রয়েছে গাড়ির লম্বা সারিগুলোর দিকে। একে একে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো চেক পয়েন্টের দিকে। চেক হয়ে গেলে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ছে মেকসিকোতে।

দশটা বাজতে দুই মিনিট।

'বেরিয়ে যায়নি তো!' আর আত্মবিশ্বাস রাখতে পারলেন না চীফ। 'মেকসিকো পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার…'

জোরাল একটা টিইপ টিইপ যেন ভরে দিল ক্যাডিলাকের ভেতরটা। চমকে উঠল সবাই। সব কটা চোখ ঘুরে গেছে মুসার দিকে। শব্দটা আসছে তার শার্টের পকেট থেকে।

'ইমারজেন্সি সিগন্যাল!' চিৎকার করে বলল সে।

'অফ কর ওটা,' চীফ বললেন। 'এখন এসব গোলমাল…'

'না না, কর না!' হাসল কিশোর। 'ওটাই তো আসল। বের করো পকেট থেকে। দেখো, তীরটা কোন দিক নির্দেশ করছে। কিডন্যাপাররা কাছাকাছিই রয়েছে।'

যন্ত্রটা বের করে ডায়ালের দিকে তাকাল মুসা। গাড়ির সারির দিকে নির্দেশ করে রয়েছে তীরটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যানবাহনগুলো। ওগুলোর মাঝে একটাও নীল লিংকন নেই। আর কোনও বাসও নেই। শুধুই গাড়ি আর গাড়ি। চার-পাঁচটা ট্রাক আর ভ্যানও রয়েছে।

'আসুন! নামুন সবাই!' বলতে বলতে নেমে পড়ল কিশোর।

যানবাহনের সারির দিকে এগোল ওরা। মাঝের লেনে একটা পুরনো ট্রাক রয়েছে। মেকসিকোর লাইসেন্স প্লেট। দু'পাশে মলিন অক্ষরে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা রয়েছে মেকসিকোর একটা লেটুস ফার্মের নাম। বর্ডার বুদের দিকে এগোচ্ছে ওটা। মুসার ডায়ালের কাঁটা সোজা মুখ করে রয়েছে ওটার দিকে।

'ওটাই!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি আসুন!'

আগে আগে ছুটছেন এখন চীফ। বুদের সামনে গিয়ে থামল ট্রাকটা। তিনিও

পৌঁছে গেলেন এই সময়। ট্রাকের পেছনের ক্যানভাসের ঢাকনা তুলল গার্ড। ভেতরে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। স্যান ডিয়েগো পুলিশকে ইশারা করল গাড়িটা ছেড়ে দেয়ার জন্যে।

'না!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'এই ট্রাকেই আছে ওরা!'

মাথা নাড়ল প্রহরী। 'সরি, ইয়াং ম্যান, ওতে কেউ নেই। পেছন দিকটা খালি। শুধু ড্রাইভিং সীটে ড্রাইভার। মেকসিকোর লোক।'

'হতেই পারে না,' জোর তর্ক শুরু করল কিশোর। 'শুনছেন, আমাদের সিগন্যাল কত জোরে বাজছে?'

যানবাহনের শব্দকে ছাপিয়ে টিঁপ টিঁপ করছে যন্ত্রটা। কিং আর ইয়ান ফ্লেচার গিয়ে ক্যানভাস তুলে দেখলেন। পেছনটা পুরো খালি।

'তোমার সিগন্যাল নিশ্চয় কোনও গোলমাল করছে,' কিং বলল।

ট্রাকের শূন্য পেছনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। একপাশে চলে এল। দেখল ট্রাকের সে পাশটা চকচক করে উঠল চোখ। 'না, মিস্টার কিং, আমাদের সিগন্যাল ঠিকই কাজ করছে। ট্রাকের ভেতরটা দেখুন। বেখাপ্পা লাগছে না বডিটা? বাইরের দেয়ালের ভেতরে আরেকটা দেয়াল আছে। মাঝখানটায় ফাঁপা।'

স্যান ডিয়েগোর দু'জন পুলিশকে নিয়ে লাফিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠলেন ইয়ান ফ্লেচার। দেয়ালটা পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। 'কিশোর, দরজা-টরজা কিছু নেই।'

'থাকার কথাও নয়,' জবাব দিল কিশোর। 'এত বোকা নয় কিডন্যাপাররা। ওরা ভেতরে ঢোকার পরই নিশ্চয় ভেতরের দেয়ালটা লাগান হয়েছে। স্যান ডিয়েগোতে থেমেইছিল সেজন্যে। এটাই ছিল ওদের জরুরী কাজ। দেয়াল খুলে আনতে হবে।'

'সাবধান, চীফ,' হুঁশিয়ার করল হ্যারি। 'ওরা ভয়ংকর লোক। অস্ত্র আছে।'

ট্রাকের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়তে ইশারা করলেন চীফ পুলিশ দু'জনকে। পিস্তল বের করলেন। দেয়ালে লাথি দিয়ে বললেন, 'ব্যস, হয়েছে, এবার বেরিয়ে এসো। হাত তুলে। কিছু করার চেষ্টা করলে মরবে।'

কোনও সাড়া এল না। শুধু যানবাহনের ইঞ্জিনের গুঞ্জন চলছে একটানা। আর মুসার সিগন্যালের জোরালো শব্দ।

কড়া গলায় আবার আদেশ দিলেন ফ্লেচার।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর মড়মড় করে কাঠ ভাঙার শব্দ হলো। ভেঙে খুলে গেল দেয়াল। হাত তুলে বেরিয়ে এল জন আর ডেভ। ওই যে কিশোর বলেছিল, ভেড়া বানিয়ে ছাড়বে, ভেড়াই বনে গেছে যেন ওরা।

কিশোরের ওপর চোখ পড়ল ডেভের। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি! এত তাড়াতাড়ি বেরোলে কি করে? ট্রাকটা চিনলে কি করে?'

'চুপ!' ধমক দিয়ে বললেন চীফ। 'অত কথার দরকার নেই!' ওদের পিস্তলগুলো কেড়ে নিলেন তিনি।

ভেতরে হাত-পা বাঁধা আর মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় পাওয়া গেল পিটারকে। তাকে বের করা হলো। মুখ থেকে কাপড় খুলতেই হাসল সে। 'অনেক

অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। বের করলে কিভাবে? তাজ্জব ব্যাপার!'

'কি করে, কিশোর?' হ্যারিও অবাক। 'সিগন্যালের সাহায্যেই করেছ, বুঝলাম, কিন্তু যন্ত্রটা ওখানে গেল কিভাবে? ট্রাকটা তো আগে কখনও দেখোনি?'

'ট্রাকে ওই যন্ত্র আমি ঢোকাইনি,' হেসে বলল কিশোর। 'ওরা নিজেরাই ঢুকিয়েছে।'

'ওরা?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।

'মনে আছে, ওয়ার্কশপে ডেভকে বলেছিলাম,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'বাগটা রয়েছে পিটারের পকেটে? বলার কারণ ছিল। আমার যন্ত্রটা ছিল আমার প্যান্টের পকেটে। কাজেই চাইছিলাম পিটারের পকেটেই আগে খুঁজুক ও। পিটারের দিকে ঘুরল সে। আমি তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। চট করে এক সুযোগে আমার যন্ত্রটা ফেলে দিলাম ডেভের কোটের পকেটে।'

দাঁত বের করে হাসল কিশোর। 'সারাক্ষণ তার পকেটেই ছিল যন্ত্রটা। ওটার বীপার অফ করা ছিল, কাজেই শব্দ করেনি। কিন্তু সিগন্যাল ঠিকই পাঠাচ্ছিল।'

ডেভের দিকে তাকিয়ে রাগ করে বলল জন, 'গাধা কোথাকার!'

জ্বলন্ত চোখে ডেভও তাকাল জনের দিকে, 'তোমার গাধামী বুদ্ধির জন্যেই এরকম হলো!'

'নিয়ে যান এগুলোকে,' বিরক্ত হয়ে পুলিশম্যানদের নির্দেশ দিলেন ফ্লেচার।

একে অন্যকে বকাবকি আর দোষারোপ করতেই থাকল দুই কিডন্যাপার। হাতকড়া পরিয়ে ওদের ট্রাক থেকে নামাল পুলিশ।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা রাগ করেই চীফ বললেন, 'সিগন্যালটার কথা আমাদেরকে বলনি, কিশোর!'

'ওটা যে কাজ করবে, শিওর ছিলাম না, স্যার,' কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন কিশোর। 'ডেভ পকেটে হাত ঢোকালেই তো শেষ হয়ে যেত। কাপড়ও বদল করতে পারত সে। করেনি, তার কারণ, অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিল ওরা। আর বাঁ পকেটে ঢুকিয়েছিলাম। সাধারণত ওই পকেটে কমই হাত দেয় লোকে। কোনও জিনিস বের করার জন্যে না হলে ঢোকায় না। আসল কথা হলো, আমাদের ভাগ্য ভাল, কাজটা হয়ে গেল।'

হাসলেন চীফ। 'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। যাই হোক, যন্ত্রটা ঢুকিয়ে দিয়ে কাজই করেছ একটা!'

তিন গোয়েন্দা হাসল। পিটার হাসল। এখন সে পুরোপুরি নিরাপদ। বিপদ কেটে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

'বাবারও কাজ করতে আর কোনও অসুবিধে হবে না,' বলল সে। 'ইচ্ছেমত করতে পারবে।'

'পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে সে আর কিশোর। দুই যমজ ভাইয়ের মত। অনেকেই অবাক চোখে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। অনেক অবাক ঘটনাই ঘটে এই পৃথিবীতে, যা বিশ্বাস করা কঠিন। এটাও তেমন একটা ঘটনা।

-ঃ শেষ ঃ-

তিন পিশাচ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯২

রবিনের চোখে পড়ল প্ল্যাস্টিকের ব্যাগটা। সৈকতের বালিতে দেবে রয়েছে। তুলে নিয়ে দেখে হাসল। স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের গায়ে লাল রঙে আঁকা রয়েছে কয়েকটা বেড়ালছানা। গলায় নীল রুমাল বাঁধা। ভেতরে অনেক জিনিসের মধ্যে রয়েছে একটা খেলনা ভালুক, কালো কুৎকুতে চোখ মেলে যেন তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'বাচ্চা মেয়ের জিনিস,' বলল সে। 'ভুলে ফেলে গেছে।'

সৈকতের এদিক ওদিক তাকাল মুসা। কোন বাচ্চা মেয়েকে চোখে পড়ল না। বেলা পড়ে এসেছে। নির্জন হয়ে গেছে সৈকত। কেবল একজন নিঃসঙ্গ সারফারকে দেখা গেল তার বোর্ড নিয়ে চলেছে রাস্তার দিকে। ওয়াচটাওয়ার থেকে নেমে চলে যাচ্ছে লাইফগার্ড।

'যেখানে আছে ফেলে রাখো,' বলল মুসা। 'মেয়েটার মনে পড়লে ফিরে এসে তুলে নেবে।'

'বয়েস বেশি কম হলে আসতে পারবে না,' বলল দলের তৃতীয় সদস্য কিশোর পাশা। 'তাছাড়া অন্য কেউও তুলে নিয়ে যেতে পারে।'

বালিতে বসে পড়ে ব্যাগটার জন্যে হাত বাড়াল সে। 'দেখি, কিছু মেলে কিনা। তাহলে পৌঁছে দিতে পারব।'

ব্যাগটা নিয়ে উপুড় করে সমস্ত জিনিস কোলের ওপর ঢেলে দিল কিশোর। 'হুঁম!' বলে ভুরু কোঁচকাল। মানিব্যাগ নেই। আইডেনটিটি নেই। রোমশ খেলনা ভালুকটা বাদেও রয়েছে একটা বই, নাম 'সাকসেস থ্রু ইমেজিং' আর 'পিপল' ম্যাগাজিনের একটা কপি। নানা রকম কসমেটিকসের বাক্স আর টিউব আছে। গুনল কিশোর। চার ধরনের লিপস্টিক, আই শ্যাডোর দুটো প্ল্যাস্টিক বক্স, একটা আইলাইনার পেনসিল এবং মেকাপ করার আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। একজোড়া লাল পাথর বসানো কানের টবও পাওয়া গেল।

'বাচ্চা মেয়ের নয় ব্যাগটা,' বলল সে। 'বয়স্ক মহিলার। প্রচুর মেকাপ নেয়।'

'এবং ছোটদের মত খেলনা পছন্দ করে,' যোগ করল মুসা।

বইয়ের মলাট উল্টে দেখল কিশোর। লাইব্রেরির বই। পেছনের মলাটের ভেতর দিকে আঠা দিয়ে সাঁটা একটা ম্যানিলা খাম, ফ্রেনসো পাবলিক লাইব্রেরির ছাপ মারা।

'সূত্র একটা মিলল,' খুশি হয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। বই বন্ধ করে বন্ধুদের

দিকে তাকাল। 'কে বইটা নিয়েছে নিশ্চয় খাতায় লেখা আছে। ঠিকানা নিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে আর অসুবিধে হবে না।'

'ফ্রেনসো, না?' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'ফোন করতে অনেক পয়সা লাগবে।'

'লাগুক,' মুসা হাসল। 'জিনিস ফেরত পেলে খুশি হয়ে কলের দামটা দিয়ে দেবে মহিলা।'

'হয়ত আমাদেরকে দাওয়াতও করে বসতে পারে,' আশা করল কিশোর। 'ফ্রেনসোর আঙুরের খেত দেখার জন্যে। চলো, তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে।'

বালির ওপর দিয়ে মেইন রোডের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। সাইকেল তিনটে শুইয়ে রেখে গেছে রাস্তার পাশে। তুলে নিয়ে ছুটল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

ইয়ার্ডে যখন পৌছল সূর্য তখন ডুবতে বসেছে। বাড়ির জানালাগুলোয় রোদ পড়ে কাচগুলোকে মনে হচ্ছে চারকোণা সোনার চাদর। সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই ওদের। তাড়াহুড়া করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ফ্রেনসোর ডিরেকটরি এনকয়ারিতে ফোন করল কিশোর। পাবলিক লাইব্রেরির নম্বর নিয়ে ডায়াল করল লাইব্রেরিতে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'সময় বেশি নেই।'

বেশি সময় লাগলও না। ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই টেলিফোন লাইনে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিল কিশোর, সবার শোনার জন্যে। ভারিক্কি চালে বলল, 'হ্যালো, কিশোর পাশা বলছি।' তারপর জানাল কেন ফোন করেছে।

'কমপিউটারে রেকর্ড করা আছে সব,' ওপাশ থেকে জবাব দিল মহিলা কণ্ঠ। 'দেখি, কি করতে পারি।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল কথা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মহিলা। 'তোমাদের নম্বরটা দেয়া যাবে? আবার ফোন করতে হতে পারে...

'যাবে।'

'প্লীজ!'

নম্বর দিল কিশোর।

'ফোনের কাছ থেকে নোড়ো না,' মহিলা বলল। কেটে গেল লাইন।

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। 'ব্যাপারটা কি বলো তো? মহিলাকে বেশ অস্থির মনে হল।'

'কিছু একটা হয়েছে,' মুসা বলল।

কয়েক মিনিট পরেই ফোন বাজল। ওপাশের কণ্ঠটা এবারেও একজন মহিলার, তবে আগের জনের নয়। উত্তেজনায় কাঁপছে, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। 'ওকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মহিলা। 'আমি আসছি। আমার মেয়েটা ...মেয়েটা হারিয়ে গেছে!'

ফুঁপিয়ে উঠল লাউডস্পীকার। আরেকটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'শান্ত হও নরিয়া, প্লীজ, ওরকম কোরো না!' রিসিভারটা মহিলার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন

তিনি। 'কিশোর পাশা?'

'বলছি।'

'বইটা সৈকতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রেনসো পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বইটা ধার নিয়েছিল আমার মেয়ে। তার পর পরই হারিয়ে গেছে।'

'বলুন।'

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, হলিউডে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করবে বলে।'

পেছন থেকে মহিলা বললেন, 'ওকে বলো, আমরা আসছি।'

'বলছি, নরিয়া, বলছি।'

লম্বা দম নিলেন ভদ্রলোক, টেলিফোনেই বোঝা গেল। বললেন, 'আমার নাম পিটার ডিকসন। তোমাদের ফোন পেয়ে আশা হচ্ছে, মনে হচ্ছে ডলি ভালই আছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। কথা বললে কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে। ব্যাগে কোন ঠিকানা পেয়েছ?'

'না।'

'পুলিশ কিছু করতে পারছে না। তোমাদের ঠিকানাটা দাও। কাল সকাল নাগাদ পৌঁছে যাব।'

'লিখে নিন।'

ঠিকানা লিখে নিয়ে কিশোরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন মিস্টার ডিকসন।

'মেয়ে হারিয়েছে!' প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা। 'চমৎকার আরেকটা কেস পেয়ে গেল বোধহয় তিন গোয়েন্দা, কি বলো?'

বইটার পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেছে কিশোর। 'জানি না।' কয়েকটা রশিদ বেরোল ভেতর থেকে। দেখে নিয়ে মাথা দোলাল সে, 'এটা হাই-লো লোন জুয়েলারি কোম্পানির। আর এটা ক্যাশ-ইন-আ-ফ্ল্যাশ, ইন্‌ক্। বন্ধকী কারবার করে। মনে হচ্ছে মেয়েটার টাকার খুব দরকার পড়েছিল।'

রশিদগুলো ভেতরে রেখে বইটা বন্ধ করে নামটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'সাকসেস থ্রু ইমেজিং। নাম শুনেছি বইটার। লেখক বলতে চান, শুধু কল্পনা করেই মনের জোরে তুমি যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। মনের মত কাজ চাও? পেয়ে যাবে। বাড়ি চাও···

'কিংবা সিনেমার অভিনেত্রী হতে চাইলেও হয়ে যাবে,' রবিন বলল।

'তাই।' আবার বইটা খুলল কিশোর। একটা বিশেষ অধ্যায়ের বিশেষ জায়গা পড়তে শুরু করল, কি ভাবে উন্নতি করা যায়। ইচ্ছে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যা ইচ্ছে তাই পাওয়া যায়।

'খাইছে!' হেসে ফেলল মুসা। 'এ তো দেখছি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগ। উইল পাওয়ার খাটাতে খাটাতে বাড়ি যাই। দেখব, একটা আস্ত কেক দিয়ে ফেলে নাকি মা।'

দুই

পরদিন সকালে ইয়ার্ডের অফিসের সামনে জটলা করছে তিন গোয়েন্দা। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা টয়োটা। ড্রাইভিং সিট থেকে বেরিয়ে এসে কিশোর পাশাকে খুঁজলেন এক ভদ্রলোক। লম্বা, মাথায় বাদামী চুল পাতলা হয়ে আসছে, চেহারায় বুদ্ধির ছাপ। পাশের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নামলেন এক মহিলা। কালো চুল। চোখেমুখে প্রচণ্ড উদ্বেগের ছাপ।

'মিস্টার ডিকসন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। তুমিই ডলির ব্যাগটা পেয়েছিলে তো?'

'আমি না, রবিন পেয়েছে।' দুই সহকারীর পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ডিকসনদের মেয়ে হারিয়েছে শুনে তাঁদেরকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন বসে কথা বলার জন্যে।

টেবিলে ব্যাগটা রেখে দিয়েছে কিশোর। মিসেস ডিকসন দেখে চিনতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন। 'ও রকম ব্যাগটা পছন্দ করে ডলি। হালকা।' ভেতরের জিনিসগুলো ঢেলে দিলেন টেবিলে। খেলনা ভালুকটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকালেন। 'এটা কিছু বলতে পারবে না।'

লাইব্রেরির বইটা তুলে নিলেন তিনি। ভেতর থেকে বের করলেন রশিদগুলো। একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পিটার, ও না খেয়ে আছে! পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিখিরি আর চোর-বদমাশদের সঙ্গে! মরবে তো!'

রশিদগুলো দেখে ডিকসনও গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'অনেক কারণেই মানুষ জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নেয়। না খেয়ে আছে, এটা জোর দিয়ে বলতে পারো না।'

হাতে করে একটা খাম নিয়ে এসেছেন তিনি। টেবিলের ওপর উপুড় করে ঢেলে দিলেন একগাদা ফটোগ্রাফ। 'ডলির ছবি। আঠারো বছর বয়েস। সৈকতে বেশি যাওয়ার অভ্যেস থাকলে নিশ্চয় তাকে দেখেছ।'

তিন গোয়েন্দার হাতে হাতে ছবিগুলো ঘুরতে থাকল। সুন্দর চেহারার কালো চুল আর সবুজ চোখওয়ালা একটা মেয়ের ছবি। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাজিয়ে দলের ড্রামবাদকের পোশাক পরা। কড়া করে লিপস্টিক লাগিয়েছে। কোনটাতে ব্যালে ড্যান্সার, কোনটাতে তীর্থযাত্রী। দশ বছর বয়েসে তোলা ছবি আছে, আছে তের বছর বয়েসে তোলা মিস টিন ফ্রেনসো প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হওয়ার ছবি।

ছবিগুলো অবাক করল ছেলেদের।

'একেক ছবিতে একেক রকম লাগছে,' মুসা বলল। 'কোনটা যে ওর আসল চেহারা বোঝাই মুশকিল।'

'চুলের কারণে লাগছে এরকম,' বুঝিয়ে দিলেন মিসেস ডিকসন। 'কখনও লম্বা, কখনও ছোট। কখনও সাদা লিপস্টিক, কখনও গাঢ় লাল, কখনও কমলা।

তবে সবুজ আর নীল কখনও লাগাতে দেখিনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে চুলেও রঙ লাগায়নি।'

কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস ডিকসন।

'পুলিশকে জানিয়েছি,' ডিকসন বললেন। 'কিছুই করতে পারছে না। সৈকতে যে জায়গায় ব্যাগটা পেয়েছ, সে জায়গাটা দেখতে চাই। তারপর লাইফগার্ডদের সঙ্গে কথা বলব।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সার বেঁধে গিয়ে উঠল ডিকসনের গাড়িতে। সারাটা সকাল তিনজনেই বসে বসে দেখল সৈকতময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডিকসন দম্পতি। লাইফগার্ড আর অল্প বয়েসী রৌদ্র স্নানার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন। বেলা একটা নাগাদ হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দু'জনে।

'ছবিটা কেউ চিনতে পারল না,' ডিকসন বললেন।

'ছবিতে যা দেখাচ্ছে মেয়েটা তার চেয়ে সুন্দর,' মিসেস বললেন। 'গোলমালটা বোধহয় সেখানেই।' আবার কাঁদতে শুরু করলেন তিনি।

'খুঁজে ওকে বের করবই,' বললেন ডিকসন। ছেলেদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ শহরে খুঁজতে কতটা সময় লাগবে, বলতে পার? বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করব। সুপারমার্কেটগুলোতে খোঁজ নেব। হ্যাণ্ডবিল বিলি করব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব।'

'এখানকার পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন,' পরামর্শ দিল রবিন। 'খুব ভাল লোক।'

সুতরাং থানায় চললেন ডিকসন দম্পতি। ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করে মেয়ে হারানোর কথা জানালেন।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই হলো সমস্যা।' একটা ছবিতে টোকা দিয়ে বললেন, 'এটা রাখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' মিসেস বললেন।

'শেষ কবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' জানতে চাইলেন ফ্লেচার।

'দু'মাস আগে। এর দু'দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ফোন করে আমাদেরকে চিন্তা করতে মানা করল। আমরা তাকে বোঝাতে যেতেই কেটে দিল লাইন।'

মাথা ঝাঁকালেন চীফ। ডিকসনদের ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, 'আমার লোকদের জানিয়ে দেব। খেয়াল রাখবে। ইয়ে, ছেলেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছেন না কেন?'

'ছেলেগুলো?' বুঝতে পারলেন না মিসেস ডিকসন।

'হ্যাঁ, ওরা,' তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন চীফ। 'ওরা গোয়েন্দা। ভাল কাজ করে। বহুবার সাহায্য করেছে পুলিশকে।'

এই সুযোগটারই যেন অপেক্ষায় ছিল কিশোর। চীফ বলেও সারতে পারলেন না, পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল সে।

কার্ডটা পড়লেন ডিকসন। বললেন, 'চীফ যখন সুপারিশ করছেন, কোন প্রশ্ন

আর করতে চাই না। বুঝতে পারছি তোমরা ভাল কাজ করো। ঠিক আছে, ভাড়া করলাম। চেক লিখে দেব?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'টাকা নিই না আমরা। শখে কাজ করি। তবে ডলিকে আগে পেয়ে নিই, খরচাপাতি যা হবে, বিল পাঠিয়ে দেব, দিয়ে দেবেন। এখন আপনার মেয়ের একটা ছবি দরকার আমাদের।'

'যা চাও,' পুরো খামটাই কিশোরকে দিয়ে দিলেন ডিকসন। 'যখন যা দরকার হবে, শুধু একটা ফোন করবে আমাকে। পেয়ে যাবে।'

'তো, আমরা এখন কি করব?' চীফকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস।

'বাড়ি ফিরে যান। টেলিফোনের কাছে বসে থাকবেন। আমরা কিছু জানতে পারলে জানাব।'

'হায়রে, মেয়েটাকে কত মানা করলাম বেরোতে,' গলা ধরে এল মিসেস ডিকসনের, 'শুনল না। আর দেখব কিনা কে জানে!'

তিন

'কাজটা আসলে আমাদেরকে গছিয়ে দিলেন চীফ,' মুসা বলল।

'তা তো দিলেন,' টেবিলে বিছানো ছবির দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'কিন্তু শুরু করব কোথেকে?'

হাসল কিশোর। 'বন্ধকীর দোকানগুলো থেকে করতে পারি।'

হেডকোয়ার্টারে বসে কথা বলছে ওরা।

সোজা হল রবিন। 'ঠিক।'

'ওসব জায়গা থেকে টাকা ধার করতে হলে,' কিশোর বলল। 'কোন মূল্যবান জিনিস জমা রাখতে হয়। নাম-ঠিকানা দিতে হয়।'

'তাহলে তো পেয়েই গেলাম!' নিশ্চিন্ত হলো মুসা।

'পাব,' সব সময় নিরাশ করার প্রবণতা কিশোরের, খারাপ দিকটা চিন্তা করে, 'যদি রশিদগুলো ডলির হয়। অন্য কাররটাও রাখতে পারে।' দুই সহকারীর মুখের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'রশিদে হলিউডের ঠিকানা দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই পিকআপ নিয়ে হলিউডে যাবে বোরিস। লিফট নিতে পারি আমরা।'

একমত হয়ে ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

হাতের কাজ শেষ করে গাড়ি বের করল বোরিস। মেয়েটা যে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, একথা শুনেছে। রাশেদ পাশার কিনে রেখে আসা পুরানো মাল আনতে হলিউডে যাচ্ছে সে। তিন গোয়েন্দাকে নিতে অসুবিধে নেই।

পেছনে উঠে বসল তিন কিশোর। রশিদের ঠিকানা মোতাবেক প্রথম দোকানটার সামনে নামল। ভেতরে আলো খুব সামান্য। কেমন ছাতলা পড়া গন্ধ। কিশোরের বাড়িয়ে দেয়া রশিদটার দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল মালিক, তারপর নীরবে খুলল একটা আলমারির তালা। নীল ফিতে লাগানো রূপার একটা মেডেল বের করে আনল। 'ফেরত নেবে?'

হাতে নিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগল কিশোর। স্ট্যাচু অভ লিবার্টির মত দেখতে একটা মূর্তি আঁকা রয়েছে মেডেলের একপিঠে। আরেক পিঠে লেখা রয়েছেঃ ফ্রেনসো জেসি'জ স্পেলিং বী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ডালিয়া ডিকসন।

'মেয়েটা ঠিকানা রেখে গেছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমরা তার বন্ধু।'

'বাড়ি থেকে পালিয়েছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ। মাস দুই আগে...'

হাত তুলে থামিয়ে দিল কিশোরকে দোকানি। 'আর বোলো না। ওসব পুরানো কেচ্ছা। শুনতে ভাল লাগে না।'

একটা রেজিস্টার বের করে কাউন্টারে বিছিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। 'কি নাম বললে?'

'ডালিয়া ডিকসন।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। জিনিসটা বন্ধক রেখে গেছে এলিজা পিলচার।'

'ঠিক বলছেন তো?' রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ।

'চোখ ভালই আছে আমার।'

'ঠিকানা আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

আবার খাতার দিকে তাকাল লোকটা। 'পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেস। তেরোশো বিরাশি রিভারসাইড ড্রাইভ।'

'কিন্তু পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসে তো কোন রিভারসাইড ড্রাইভ নেই?' রবিনের প্রশ্ন।

'মিথ্যে ঠিকানা অনেকেই দিয়ে থাকে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।' কিশোরের বাড়িয়ে ধরা ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল দোকানি। কিছুটা নরম হয়ে বলল, 'দেখতে তো ভালই। ও মেডাল নিয়ে আসেনি। যে এসেছিল তার চুল সোনালি, গালে একটা তিল আছে। ট্রায়াম্ফে অভিনয় করে যে মেয়েটা তার মত। প্রতি সোমবার টিভিতে দেখে আমার স্ত্রী।'

'ওই অভিনেত্রীর নাম এলিজা পিলচার,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল দোকানি। 'কি জানি, অন্য কেউও এসে তার নামে মেডেলটা দিয়ে টাকা নিতে পারে। ছদ্মবেশ ধরাটা তো কঠিন কিছু না। শোনো, এটা কি নেবে তোমরা? আট ডলার পঁচাত্তর সেন্ট লাগবে।'

টাকা দিয়ে মেডেলটা নিয়ে নিল কিশোর।

বাইরে বেরিয়ে পিকআপে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা।

'কেসটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার,' অভিযোগের সুরে বলল মুসা।

'খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাও তুমি,' কিশোর বলল। 'তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। কোন দোকানে খোঁজ পেয়েও যেতে পারি।'

দ্বিতীয় দোকানের মালিক ততটা নিরস নয়। তবে তেমন তথ্যও দিতে পারল না। শুধু বলতে পারল, সোনার একটা আংটি নিয়ে এসেছিল একটা মেয়ে। পরনে

টিউনিক, পায়ে হাঁটু সমান উঁচু বুট। মহাকাশের গল্প নিয়ে করা ছবি। 'সার্চ ফর এরিওয়ান'-এর অভিনেত্রীর মত পোশাক।

'কি নাম বলল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শেলি টেনার।'

'হুঁ। ছবিটার নায়িকার নাম।'

আংটিটা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। নিল না। পিকআপে ফিরে এসে দেখল অস্থির হয়ে উঠেছে বোরিস। বার বার ঘড়ি দেখছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

'তোমাদের হলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আর একটা দোকান,' জবাব দিল কিশোর। 'হলিউড বুলভারে যেতে হবে।'

'দেরি করলে রেগে যাবেন মিসেস পাশা,' বলল বটে, তবে গাড়ি নিয়ে চলল বুলভারে। 'এই রাস্তাটা আমার পছন্দ না।'

কেন, সেটা জানা আছে গোয়েন্দাদের। গলিটা নোংরা। দু'ধারের বাড়িগুলো জীর্ণ, মলিন। মানুষগুলোও তেমনি। হলিউডের চাকচিক্যের ছিটেফোঁটাও নেই এখানে।

যে দোকানটা খুঁজছে কিশোররা, তার এক ব্লক দূরে মোড়ের কাছে গাড়ি রাখার জায়গা আছে। নেমে গেল ছেলেরা। স্যুভনির আর হলিউডের ম্যাপ বিক্রি করে ওরকম একটা দোকান পার হয়ে আরও দুটো দরজার পর বন্ধকী দোকানটা। আগে আগে চলেছে মুসা।

'অহেতুক সময় নষ্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে। দোকানের দরজায় পা দিল।

হঠাৎ চেঁচামেচি শোনা গেল দোকানের ভেতর। ছুটে বেরোল একটা লোক। মুসার গায়ে এসে পড়ল।

কনুইয়ের গুঁতো মেরে তাকে ফেলে দিয়েছিল আরেকটু হলেই।

'অ্যাই অ্যাই!' করে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কালো মুখ ঠোঁটের দুই কোণ থেকে বেরিয়ে রয়েছে শ্বদন্ত। নাকের ফুটো বড় বড়। চোখ প্রায় দেখাই যায় না—গভীর কোটরের অনেক ভেতরে যেন লুকিয়ে রয়েছে। শয়তানী ভরা চাহনি।

আবার চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল মুসা। শব্দ বেরোল না। লোকটার হাতের দিকে তাকাল। কালো, রোমশ থাবা। বড় বড় নখ বেরিয়ে আছে আঙুলের মাথা থেকে।

দোকানের ভেতরে চিৎকার শোনা গেল। ছুটতে শুরু করল অদ্ভুত লোকটা।

আবার চিৎকার করে উঠল দোকানের ভেতরের লোকটা, 'ধর! ধর!'

গলির দিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা।

স্যুভনিরের দোকানের ভেতরে দুঃস্বপ্নের মত হারিয়ে গেল কিম্ভূত মানুষটা। আবার শোনা গেল চেঁচামেচি।

এতক্ষণে হুঁশ ফিরল যেন মুসার। দৌড়ে গেল স্যুভনিরের দোকানে। দেরি করে ফেলেছে। পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে লোকটা।

বন্ধকীর দোকানে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। দোকানদার কাঁপছে এখনও। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'ডাকাতি করতে এসেছিল! পালাল!'

সাইরেন শোনা গেল গলির মাথায়। ভেতরে এসে ঢুকল একটা পুলিশের গাড়ি। ওটা দোকানের সামনে এসে থামতে না থামতেই পেছনে এসে দাঁড়াল আরেকটা। ভিড় জমল। দোকানের মালিকের সঙ্গে বেরোল তিন গোয়েন্দা। পাগলের মত হাত নাড়ছে লোকটা।

জনতাকে পিছে হটিয়ে দিল একজন পুলিশ অফিসার। আরেকজন জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেল দোকানদারকে। হাত তুলে মুসাকে দেখিয়ে দিল লোকটা। তৃতীয় আরেকজন অফিসার এসে প্রশ্ন করল মুসাকে, 'তুমিই লোকটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কি হয়েছিল?'

দ্বিধা করল মুসা। বলল, 'বললে তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। পাগল ভাববেন আমাকে।'

'বলো।'

'লোকটা···লোকটাকে মানুষ মনে হল না। দানব!'

ধৈর্য হারাল না অফিসার। 'গরিলা? না অন্য কোন ধরনের দানব?'

'গরিলা-টরিলা নয়। কি বলব?···মায়ানেকড়ের মত লাগল। সিনেমাতে যেগুলো দেখায়।'

'হুঁম!' নোটবুক বের করল অফিসার। 'তা মায়ানেকড়েটা কতটা লম্বা হবে?'

'প্রায় আমার সমান।'

কিশোরের দিকে ফিরল অফিসার। 'তুমি কি জিনিস দেখেছ?'

কিশোর জানাল, সে-ও মায়ানেকড়েই দেখেছে। তারপর বলল, 'অবাক লাগছে না তো আপনার?'

হাসল অফিসার। 'গত হপ্তায় একটা পেট্রল স্টেশনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। গরিলা সেজে এসেছিল একজন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এতক্ষণে,' বলে উঠল বন্ধকী দোকানের মালিক। 'কাগজে দেখেছি। সবুজ মুখওয়ালা মানুষের কথাও পড়েছি। ঘাড় থেকে নাকি কি একটা বেরিয়ে থাকে। সান্তা মনিকায় কি যেন করেছিল।'

অফিসার হাসল। 'এ শহরে কোন কিছুই স্বাভাবিক নয়।'

পুলিশ চলে গেলে তিন গোয়েন্দাকে বলল দোকানদার, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?'

ডলির কথা বলল তাকে কিশোর। দোকানে ঢুকে রেজিস্টার বের করল লোকটা। তারপর ড্রয়ার খুলে ধনুকের মত দেখতে একটা সোনার পিন বের করল।

'এ রকম একটা জিনিস বন্ধক রাখতে আসে কেউ, বল?' লোকটা বলল। 'খারাপ লাগে না? ইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন নেয়ার পর সাধারণত মানুষ এ ধরনের

জিনিস উপহার পায়।'

'যে মেয়েটা বন্ধক রাখতে এসেছিল তার চেহারা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দেখুন তো ও নাকি?'

কিশোরের বারিয়ে ধরা ডালিয়া ডিকসনের ছবিটা দেখল দোকানি। 'হতে পারে। কড়া মেকআপ করে এসেছিল। চুলের রঙও আরেকটু হালকা ছিল। তবে এ-ই হতে পারে।'

আরেকবার রেজিস্টার দেখল লোকটা। জানাল পিনটা বন্ধক রাখতে এসেছিল এনভি নিউম্যান নামে একটা মেয়ে।

'আরেকজন অভিনেত্রীর নাম,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'নাহ্, কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

চার

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিনজনে। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়েছে মুসা। প্রশ্ন তুলল, 'এ রকম বহুরূপী একটা মেয়েকে কি করে খুঁজে বের করব আমরা?'

একটা মুহূর্ত কেউ কোন জবাব দিতে পারল না। তারপর কিশোর বলল, 'সিনেমায় ঢোকার চেষ্টা করছে ডলি। কাজেই দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে। ওদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি আমরা।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করতে দোষ কি?' খুব একটা আশাবাদী মনে হল না মুসাকে।

পরদিন সকালে বাসে করে হলিউডে চলে এল তিনজনে। একটা তালিকা তৈরি করে নিয়ে এসেছে কিশোর। এক নম্বর নামটা থেকে শুরু করল। প্রথমেই রিসিপশনিস্টের সঙ্গে দেখা। রোগাটে এক মহিলা। ওদের কথা শুনতেই চাইল না। অবশেষে জানিয়ে দিল, 'মক্কেলদের কথা বাইরের লোকের কাছে বলার নিয়ম নেই।'

'সে আপনাদের মক্কেল না-ও হতে পারে,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা।

'তাহলে আমাদের কাছে এসেছ কেন?' আবার টাইপিঙে মন দিল মহিলা।

দ্বিতীয় এজেন্সীটাতে গোমড়ামুখো মহিলা কড়া গলায় বলল, 'জানলেও বলতাম না। লজ্জা করে না? এই বয়সেই অভিনেত্রীদের পিছে লেগেছ?'

লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'পিছে লাগিনি। তার বাবা-মা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তাকে খুঁজে বের করতে...

'ও, বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তাহলে পুলিশের কাছে যায় না কেন? তিনটে ছেলেকে পাঠায়। যত্তসব! ওসব শয়তান ছেলেমেয়ের খোঁজ রাখার দায়িত্ব নিইনি আমরা। যেতে পার।'

তৃতীয় এজেন্সীটাতে অতটা খারাপ ব্যবহার করল না রিসিপশনিস্ট। কিশোরকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, মোটুরাম না! কি কাণ্ড দেখো তো!'

ছেলেবেলায় একটা কমেডি সিরিজে অভিনয় করেছিল কিশোর। সেটাতে তার নাম ছিল 'বেবি ফ্যাট সো'। নামটাকে ঘৃণা করে সে। এবং যে ওই নামে তাকে ডাকে, তাকেও।

ডলির ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মহিলা। 'ও রকম চেহারার অনেকেই আছে। কে ও? বোন? বন্ধু?'

তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড মহিলাকে দিয়ে কিশোর জানাল, 'ওর নাম ডালিয়া ডিকসন। ওকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করেছে ওর বাবা-মা। দু'মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।'

'মনে হয় অহেতুক সময় নষ্ট করছ। ওর মত আরও হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে। তবে সিনেমায় ঢোকার চেষ্টা করে থাকলে খোঁজ মিলতেও পারে। টেলিভিশনের জন্যে একটা সিরিজ হচ্ছে, রিচ ফর আ স্টার। তার অডিশনে যোগ দিতে পারে। ওখানে অ্যামেচারদেরকে ডাকা হয়েছে।'

যে স্টুডিওতে অডিশন হবে তার ঠিকানাটা দিল মহিলা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেরা। স্টুডিওতে পৌঁছে দেখল গেটের সামনে লাইন, লম্বা হয়ে চলে গেছে, সেই ব্লক পেরিয়ে তার পরের ব্লকের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।

সোজা গেটের দিকে এগোল কিশোর। চিৎকার করে উঠল লাইনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা। প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। 'এভাবে পারবে না। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। এ লাইনে দাঁড়ালে এ জনমে কোনদিন ঢুকতে পারব না।'

বাস স্টপেজের একটা বেঞ্চে বসে পড়ল কিশোর। 'উপায় তো একটা বের করতেই হবে।'

তিনজনেই ভাবছে। উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। 'এখানে ঢোকা যাবে না। তার চেয়ে আরেক কাজ করতে পারি আমরা। ট্যালেন্ট এজেন্টদের সাহায্য নিতে পারি। ডলির ছবি দিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছেপে ডাকে পাঠিয়ে দেব ওদের কাছে। এ শহরে যতগুলো স্টুডিও আর এজেন্ট আছে সবার কাছে পাঠাব। অনুরোধ থাকবে, এই মেয়েটিকে কেউ দেখে থাকলে দয়া করে তিন গোয়েন্দাকে একটা ফোন করবেন। ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিয়ে দেব আমাদের।'

সাড়া দিল না কিশোর।

'আমার কিন্তু বেশ ভাল মনে হচ্ছে,' আবার বলল রবিন।

'আমারও,' তার সঙ্গে একমত হলো মুসা। 'সারা হলিউড চষে বেড়াতে হবে না। যে সব লোক আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না তাদের কাছে গিয়ে ধরনা দিতে হবে না।'

এর চেয়ে ভাল আর কোন উপায় আপাতত কিশোরেরও মাথায় এল না। অগত্যা আবার রকি বীচে ফিরে চলল বাসে করে। ইয়ার্ডে ফিরে দেখল, রোভার একা। ভেনচুরাতে মাল কিনতে গেছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। বোরিসকেও নিয়ে গেছেন। কিশোরকে দেখেই রোভার বলল, 'বাজারে যেতে পারেননি আজ ম্যা'ম। ফ্রিজে কিছু নেই, বলে গেছেন, খিদে পেলে পয়সা বের করে নিয়ে গিয়ে

পিজাটিজা কিছু কিনে খেতে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' খুশি হয়ে উঠল মুসা। 'তাই খাব। দেরি করছি কেন?'

'দাঁড়াও, টাকা নিয়ে আসি,' কিশোর বলল। 'ভালই হল। খেতে খেতে হ্যাণ্ডবিলে কি লিখতে হবে সেটার একটা খসড়া করে ফেলতে পারব।'

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। রকি বীচে কোস্ট হাইওয়ের পাশের পিজা শ্যাকটা বেশ জনপ্রিয়। ওখানে গিয়ে ভিড় করে কিশোর আর তরুণেরা। পিজা খায়, ভিডিও গেম খেলে, মিউজিক শোনে, আর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ জমায়।

তিন গোয়েন্দা ঢুকে দেখল, ভিডিও গেম খেলছে কয়েকজন। কালো চুলওয়ালা হাসিখুশি একটা মেয়ে খেলছে আর মাথা ঝাঁকিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বড় সাইজের তিনটে পিজার অর্ডার দিয়ে কাউন্টারের সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। হুল্লোড় করে উঠল ভিডিও গেম প্লেয়াররা।

'মেয়েটা মনে হয় ভাল খেলে,' রবিন মন্তব্য করল।

খেলা শেষ। ফিরে তাকাল মেয়েটা। তারপর উঠে এল টুল থেকে। দরজার দিকে এগোল। তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। মেয়েটার স্কার্টের ঝুল এত বেশি প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। পুরানো ছাঁটের একটা ব্লাউজ পরেছে, সামনের দিকটা দোমড়ানো। খুদে একটা ঘড়ি বসানো রয়েছে বুকের একপাশে। কানে দুল। সব কিছু মিলিয়ে তাকে এ যুগের মেয়ে লাগছে না, মনে হচ্ছে একশো বছর আগের। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। বেরিয়ে গেল।

'এ রকম পোশাক পরেছে কেন?' অবাক হয়ে বলল রবিন।

কুমড়োর মত মোটা এক মহিলা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। হাতে ট্রে। খাবারে বোঝাই। তিনটে পিজা ছেলেদের সামনে নামিয়ে রেখে কোকা কোলা আনতে গেল।

খাবারের দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল কিশোর। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি!' তুড়ি বাজাল। 'ওই মেয়েটাই!'

'কোন মেয়েটা?' বুঝতে পারল না মুসা।

'ডলি! ডালিয়া ডিকসন! কোন সন্দেহ নেই!'

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ছুটে বেরোল। পিজা শ্যাকের সামনের পার্কিং স্পেসে এসে দাঁড়িয়ে তাকাল ডানে বাঁয়ে। তারপর মেইন রোডের দিকে। দু'দিক থেকেই চলাচল করছে গাড়ি। ওপাশে রাস্তার বাইরে দাঁড়িয়ে-বসে রয়েছে কয়েকজন ভবঘুরে। কিন্তু পুরানো পোশাক পরা মেয়েটা নেই।

পাঁচ

'এই শুনছ! এই ভাই, খেলাটা একটু থামাবে তোমরা? জরুরী কথা বলতাম।' খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলল কিশোর। আবার এসে পিজা শপে ঢুকেছে। খেলা

থামিয়ে ফিরে তাকাল সবাই। অবাক হয়েছে। রান্নাঘরে যাচ্ছিল মোটা মহিলা, থমকে দাঁড়াল।

'যে মেয়েটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল,' বলল কিশোর। 'তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমরা।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল খেলোয়াড়েরা। কারও কারও চোখে সন্দেহ ফুটেছে এখন। অস্বস্তি বোধ করছে। একজন জানতে চাইল, 'কেন?'

ডলির ছবি বের করে দিল কিশোর। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। বলল, 'ওর বাবা দিয়েছেন ছবিটা। খুঁজে বের করতে অনুরোধ করেছেন। ফ্রেনসোতে বাড়ি। দুই মাস আগে বেরিয়েছে, আর ফিরে যায়নি।'

'কিন্তু ওর বাবার নাম তো ডিকসন নয়,' বলল আরেকটা ছেলে। 'ওর নামও ডলি নয়।'

'হয়ত বানিয়ে অন্য নাম বলেছে,' রবিন বলল।

'অনেক বেশি ডিটেকটিভ ছবি দেখো তোমরা,' বলল একটা মেয়ে।

গরম হয়ে বলল মুসা, 'ছবি দেখলেই ডিটেকটিভ হয়ে যায় নাকি! খালি এককথা। বোঝে না শোঝে না, একটা বলে দিলেই হলো।'

তার ধমকে কাজ হলো। অস্বস্তিতে পড়ে গেল ছেলেমেয়েরা। আরেকটা মেয়ে বলল, 'ওই মেয়েটা বাড়ি থেকে পালায়নি। এদিকেই থাকে।'

'চেনো?'

'চিনি।'

'দুই মাসের বেশি?' কিশোর জানতে চাইল।

জবাব দিতে পারল না মেয়েটা।

'ঘন ঘন পোশাক পাল্টায়, তাই না?' আবার বলল কিশোর। 'চুলের রঙও বদলায়।'

চুপ হয়ে গেছে সবাই। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে খেলোয়াড়েরা। জবাব দিতে চাইছে না। ভাবছে বোধহয়, এই তিনজন কারা?

তামাটে রঙের একটা গাড়ি এসে থামল বাইরে। ধূসর চুলওয়ালা একজন লোক ঢুকলেন। 'কি ব্যাপার, সবাই এত চুপচাপ? কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, মিস্টার জেনসেন,' এগিয়ে এল ওয়েইট্রেস। 'এই ছেলেগুলো ওদের একজন বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে।'

'ও,' বলে কাউন্টারের ওপাশে চলে গেলেন মিস্টার জেনসেন। ক্যাশ রেজিস্টার খোলা এবং টাকা গোনা দেখেই বোঝা গেল তিনি ম্যানেজার।

অবশেষে কিশোরকে বলল একটা মেয়ে, 'ওই মেয়েটা কোথায় থাকে আমি জানি। মেইন রোড ধরে গেলে পুরানো একটা হাউজিং কমপ্লেক্স পাবে, চেশায়ার স্কোয়্যার, ওখানে। নাম বেটসি।'

'ভাল নাম?' রবিন জানতে চাইল।

'বেটসি অ্যারিয়াগো।'

নাক টানল কিশোর। 'নামটা ঠিক তো?'

'না হওয়ার তো কোন কারণ দেখি না,' জবাব দিল একটা ছেলে। 'আর বাড়ি থেকে পালালেই কেউ নাম বানিয়ে বলে না। কেন বলবে? বাড়ি থেকে বেরোনো অপরাধ না। বেরিয়েছে যে তারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে। হয়ত ওর মা দুর্ব্যবহার করত...'

'ও অভিনেত্রী হতে চায়,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'পালিয়েছে সে জন্যে। কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। অন্তত আমাদের জানা নেই।'

'বেশ,' ছেলেটা বলল। 'ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে তোমাদের কথা বলব। ঠিক আছে?'

দ্বিধা করল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, 'এই নাম্বারে ফোন করতে বোলো, প্লীজ।'

কার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। 'বাহ্, গোয়েন্দা।' জিনসের প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'বলব।'

ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে আবার কাউন্টারে ফিরে এল কিশোর।

রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো ওয়েইট্রেস মহিলা। পেছনে চললেন ম্যানেজার। ছেলেমেয়েরা ফিরে গেল তাদের খেলায়।

কিশোরের দিকে কাত হয়ে নিচু স্বরে বলল রবিন, 'মেয়েটা ফোন করবে বলে মনে হয় তোমার?'

'না,' পিজা চিবাতে চিবাতে জবাব দিল কিশোর। 'তার ফোনের অপেক্ষায় বসেও থাকব না। চেশায়ার স্কোয়্যার আমরাও চিনি। জলদি খাও।'

চেহারা পুরানো হলেও এখন আর পুরানো নেই কমপ্লেক্সটা। অনেক সংস্কার করা হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে, সাগরের দিকে মুখ। নতুন করে রঙ করা হয়েছে। চকচক করছে পেতলের জিনিসগুলো। নতুন লনে নতুন ফুলের বেড তৈরি হয়েছে।

যে লোক সংস্কার করেছেন, তিনি নিজেকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। রসিক লোক। সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধাঁধায় ফেলার জন্যেই তিনি একাজ করেছেন। 'মাটি খুঁড়ে বের করবে ওরা আঠারোশো নব্বই সালের বাড়ি,' তিনি বলেছেন। 'দেখবে ভেতরে বোঝাই হয়ে আছে উন্নত কারিগরির যন্ত্রপাতি, যেগুলো তৈরি হয়েছে আরও একশো বছর পরে। দ্বিধায় পড়ে যাবে ওরা।'

'ডলি নামের কেউ থাকে না এখানে,' পাহারাদার বলল।

'তাহলে বেটসি অ্যারিয়াগো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

সতর্ক হলো লোকটা। 'তোমাকে চেনে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার নাম?'

'কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। ফ্রেনসোর মিস্টার

ডিকসন পাঠিয়েছেন আমাদেরকে। বেটসির সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমাদের।'

দ্বিধা করল প্রহরী। টেলিফোনে হাত।

'বলেই দেখুন না, খুব খুশি হবে। মিস্টার ডিকসন, মনে রাখবেন।'

কিন্তু কিশোরের কথা শুনছে না লোকটা। নিচের মেন রোডে পুলিশের সাইরেন বাজছে। দ্রুত ছুটে আসছে।

রাস্তার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। রকি বীচ পুলিশের গাড়িটা চিনতে অসুবিধে হলো না। মোড় নিয়ে চেশায়ার স্কোয়্যারে ওঠার গলিতে পড়ল। উঠে আসতে লাগল ওপরে।

বাড়ির ভেতরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল কেউ। রাগ আর ভয় মেশানো চিৎকার।

'অ্যাই! অ্যাই!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

দারোয়ানের ছোট ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রহরী। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসা লোকটার পথরোধ করে দাঁড়াল। গাঢ় রঙের শার্ট পরনে। একটা মোজা টেনে দিয়েছে মাথার ওপর, যাতে চেহারাটা চেনা না যায়। তবে মাথায় কালো চুল, এটা গোপন করতে পারল না।

ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল লোকটা। ঝট করে পা বাড়িয়ে দিল প্রহরী। তৈরিই ছিল লোকটা। পা-টা এড়িয়ে গিয়ে এক ঘুসিতে চিৎ করে ফেলল প্রহরীকে।

মুসাও আটকাতে গেল ওকে। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল মুখে। তার মনে হলো হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে। বোঁ করে উঠল মাথা। রাস্তার ওপরই বসে পড়ল সে।

রবিন আর কিশোর কিছু করার আগেই ছুটে চলে গেল লোকটা। লাফাতে লাফাতে গিয়ে ঢুকল পাহাড়ের ঢালের ঝোপঝাড়ের ভেতর।

ছয়

ঘ্যাঁচ করে এসে গেটের কাছে ব্রেক কষল পুলিশের গাড়ি। লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল দু'জন অফিসার, ছুটল লোকটাকে ধরার জন্যে। আরেকটা গাড়ি উঠে এল ওপরে। আরও দু'জন অফিসার নামল। দারোয়ানকে উঠতে সাহায্য করল একজন। আরেকজন ঝুঁকল মুসার ওপর। 'বেশি লেগেছে?'

'দাঁত বোধহয় বারো-চোদ্দটা খসে গেছে।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। দারোয়ানের ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে চোখে পড়ল মেয়েটাকে। সেই লম্বা ঝুলওয়ালা স্কার্ট আর দোমড়ানো ব্লাউজ পরা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পুলিশকে বলতে লাগল, 'জোর করে ঢুকল!...আমি সবে বাড়িতে এসেছি!...দোতলায় উঠে হলের দিকে যাচ্ছি, এই সময় টের পেলাম কেউ আছে!'

সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। গলা কাঁপছে। পায়ে ব্যথা পেয়েছে

দারোয়ান। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বসল তার ঘরের সামনে রাখা চেয়ারে।

'কোন বাড়িটায়?' জিজ্ঞেস করল অফিসার। 'কোথায় থাকো তুমি?'

ছোট পার্কটার দিকে দেখাল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ করেই কাঁদতে শুরু করল।

'লেসিঙের বাড়ি,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল দারোয়ান। 'ওইটা। এগারো নম্বর। পার্কের ওধারের ওই যে বাড়িটা।'

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। সঙ্গীকে নিয়ে গিয়ে উঠল আবার গাড়িতে। মেয়েটা দাঁড়িয়েই আছে। ডিকসনদের দেয়া ছবির মেয়েটার চেয়ে এই মেয়েটা রোগা, তবে চোখের রঙ মিলে যাচ্ছে। ডালিয়া ডিকসনই? নাকি প্রায় একই রকম দেখতে অন্য কোন মেয়ে?

খানিক বাদেই ফিরে এল পুলিশের গাড়িটা। লোকটার পিছু নিয়েছিল যে দু'জন অফিসার, তারাও ফিরে এল। হাঁপাচ্ছে। কপালে ঘাম। যে অফিসার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে নেমে আবার বলল, 'এখন একটু ভাল লাগছে, না? আমাদের সাহায্য করতে পারবে? কিছু চুরিটুরি গেল কিনা দেখা দরকার।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়ল মেয়েটা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত নেড়ে বলল অফিসার। 'অত তাড়াহুড়া নেই। জিরিয়ে নাও। পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে পারবে?'

'হলের দিকে যাচ্ছিলাম,' মেয়েটা বলল। 'এই সময় মনে হলো পেছনে কেউ আছে। ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তখন মনে হলো, শোবার ঘরে শব্দ হয়েছে। তারপর...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল মেয়েটা। 'ভয় পেয়ে গেলাম। যদি চোরটোর হয়? মিসেস লেসিঙের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। আমার গলা ও শুনে ফেলতে পারে, এ জন্যে রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিয়ে পুলিশকে ফোন করলাম।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। ওসব সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তারপর?'

'তারপর আর কিছু না। পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাইরেনের শব্দ শুনে পালানোর চেষ্টা করল লোকটা। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার, পালাতে দিতে চাইলাম না। সিঁড়িতে গিয়ে জাপটে ধরলাম ওকে।'

'এটা বোকামি হয়ে গেছে। লোকটা কি করল?'

'ঝাড়া দিয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল।'

'ভাগ্যিস ছুরিটুরি মারেনি। ওরকম বোকামি আর করবে না।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'চলুন। এখন যেতে পারব।'

দারোয়ান বলল, 'তোমার সঙ্গে কারও থাকা উচিত। বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই? খবর দাও না।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আমার বন্ধুরা সব শহরের বাইরে।'

এগিয়ে গেল কিশোর। 'ডলি, আপনার মাকে খবর দিতে পারি আমরা।'

থমকে গেল মেয়েটা। তারপর আস্তে করে ঘুরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'ডলি? আমার নাম ডলি নয়। বেটসি। বড় জোর বেটি বলতে পারো।'

'ওকে বিরক্ত কোরো না!' কড়া গলায় বলল দারোয়ান। 'এমনিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। ভয়ে কাবু।'

পুলিশের গাড়িতে করে চলে গেল বেটি। একজন অফিসার তিন গোয়েন্দার কাছ থেকে ঘটনাটার বিবরণ লিখে নিতে লাগল।

মুসার চোয়ালের বেগুনী হয়ে যাওয়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল দারোয়ান। 'ব্যাটার গায়ে জোর আছে। তোমারই যখন এ অবস্থা করে দিয়েছে...নাহ্, আজকাল আর শান্তি নেই। এত বড় বাড়িতে মেয়েটার একা থাকা একেবারেই উচিত না।'

'বাড়িটার মালিক কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কোথায় থাকে?'

'মিসেস আরনি লেসিং। কয়েকদিন আগে ইউরোপ গেছে। কয়েক হপ্তা হল এসেছে বেটি, মিসেস লেসিঙের সঙ্গে আছে। তিনি খুব ভাল। ছেলেমেয়েদের কষ্ট সইতে পারেন না। কেউ অসুবিধেয় আছে দেখলেই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বেটি বোধহয় কোথাও একটা পার্টটাইম কাজটাজ করে। এখানে মিসেস লেসিঙের বাড়িঘর দেখাশোনা করে যে মহিলা, তাকে সাহায্য করে। বাড়িতে কি একটা জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় কাল থেকে আসছে না মহিলা। ফলে বেটি একা হয়ে গেছে।'

তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাল দারোয়ান। 'সত্যিই তাকে তোমরা চেন?'

ডালিয়া ডিকসনের ছবিটা বের করে দেখাল কিশোর। 'ডলির বাবা-মা এটা দিয়েছে আমাদেরকে। কি মনে হয়?'

সময় নিয়ে ছবিটা দেখল দারোয়ান। ভাবের পরিবর্তন হল না। 'এই বয়েসের একটা মেয়ে আমারও আছে।'

'আপনি নিশ্চয় চান, আপনার মেয়ে ভাল থাকুক?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'বেটির সঙ্গে আমি কথা বলব। ও-ই ডলি কিনা জানার চেষ্টা করব। এখন হবে না। মুখ খুলবে না ও। একে তো চোরের ভয়, তার ওপর পুলিশের ঝামেলা। টেনশনে আছে।'

'কাল সকালে আসি একবার, কি বলেন?'

'এসো। আমি বেটির সঙ্গে কথা বলে রাখব। কাল সকালে বাড়িতে যাতে থাকে, তারও চেষ্টা করব। অন্তত তোমরা যতক্ষণ না আসো, কাজে বেরোতে দেব না। আশা করি, আমার কথা রাখবে ও।'

পরদিন সকালে চেশায়ার স্কোয়্যারে একা এল কিশোর। মুসা আর রবিনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একা আসাই ভাল। বেশি মানুষ দেখলে হয়ত অস্বস্তিতে পড়ে যাবে মেয়েটা, তখন আর মুখ খুলতে চাইবে না।

কিশোরকে দেখেই বলতে শুরু করল দারোয়ান, 'ওর বাবা-মা যে

তোমাদেরকে পাঠিয়েছে একথা বলিনি ওকে। নিজে নিজেই হয়ত আন্দাজ করে নিয়েছে। আমি শুধু বলেছি, তোমরা তার ভাল চাও। দেখা করতে রাজি হয়েছে।'

মিসেস লেসিঙের বাড়িটা দেখিয়ে বলল সে, 'ওই যে, পার্কের ওপাশের বড় বাড়িটা।'

দারোয়ানকে ধন্যবাদ দিয়ে চত্বরে ঢুকল কিশোর। এসে দাঁড়াল ১১ নম্বর বাড়ির সামনে। দোতলা বাড়ি। ভিক্টোরিয়ান আমলের চেহারা। সে আবার পা বাড়াতেই একটা দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল বেটি। 'এসেছ। আমি তোমার জন্যেই বসে আছি।'

'কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

হেসে হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল বেটি। তারপর ঘুরে ঢুকে গেল ভেতরে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর। ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল। একলাফে যেন চলে এসেছে অন্য এক যুগে। ঘরের চেহারাটা বানিয়ে রাখা হয়েছে একশো বছর আগের। চওড়া সিঁড়ি, দোতলার কাঠের গ্যালারি, দেয়ালের প্যানেলিং, আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের। পুরু লাল কার্পেটে গোড়ালি দেবে যায়। দেয়ালে ঝুলছে ভারি ফ্রেমে বাঁধানো পেইনটিং।

'কেমন জানি লাগে, তাই না?' কিশোরকে বলল বেটি। 'এসো, রান্নাঘরে। এখানকার চেয়ে ভাল।'

মেয়েটার পিছু পিছু সিঁড়ির পাশ কাটিয়ে এল কিশোর। রান্নাঘরটা ভালই। রোদ আসছে। পুরানো আমলের একটা স্টোভে পানি ফুটছে। চেহারাটাই প্রাচীন, জিনিসটা আধুনিক, ইলেকট্রিক হীটার।

দুটো জানালার মাঝের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে টেবিল। ওখানে চেয়ারে বসতে বলল কিশোরকে বেটি। কিশোরকে কোক বের করে দিল সে। নিজের জন্যে চা ঢেলে নিল।

বেটি কাজ করছে, আর চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিশোর। মেঝে ছুঁয়ে যাওয়া গাউনই পরেছে। কালো ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। তার মনে হলো, বাড়িটার সঙ্গে মানানোর জন্যেই বুঝি এ রকম করে কাপড় পরেছে মেয়েটা।

'সত্যি,' শুরু করল কিশোর। 'মিসেস লেসিং খুব ভাল। আপনাকে থাকতে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। আসলেই ভাল।'

'তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল কি করে?'

'একটা বিউটি পারলারে।'

'পারলারটার নাম?'

'গোল্ডেন ড্রীম।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চেনে। রকি বীচেই ওটা।

'কাজকর্ম এখনও তেমন শিখতে পারিনি,' মেয়েটা বলতে থাকল। 'কাটতে গিয়ে মিসেস লেসিঙের চুল নষ্ট করে ফেলেছিলাম। অনেকেই এ রকম করে অবশ্য। শিক্ষানবিস অনেক আছে ওখানে। অভিনেত্রী হতে চায় ওরা। যাই হোক,

মিসেস লেসিং কিছু বলেননি আমাকে। অভিজ্ঞ একজন বিউটিশিয়ান এসে তখন তাঁর চুল ঠিক করে দিয়েছিল। নিয়মিতই তিনি ওখানে যেতেন। কথা হত আমার সঙ্গে। হপ্তা দুই আগে আমাকে বললেন, তিনি কিছুদিনের জন্যে ইউরোপে যাচ্ছেন। হাউসকীপার একা থাকতে ভয় পায়। আমি চাইলে তাঁর বাড়িতে থাকতে পারি। রাজি হয়ে গেলাম।'

'ভাল করেছেন। থাকাখাওয়ার জায়গা হয়ে গেলে সুবিধে। আপনি নিশ্চয় অভিনয় প্র্যাকটিস করার অনেক সুযোগ পাচ্ছেন।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তার মনের কথাটা কি করে বুঝে ফেলল ভেবে অবাক হয়েছে। 'লুই গনজাগা বলল তোমরা নাকি বেশ চিন্তায় আছ।'

'দারোয়ান?'

'হ্যাঁ।' সতর্ক হয়ে কথা বলছে বেটি। কিশোর কে, কতটা জানে তার সম্পর্কে, না জেনে সব কথা ফাঁস করতে চায় না।

ডলির ছবিটা বের করল কিশোর। টেবিলে রেখে ঠেলে দিল বেটির দিকে।

একবার ছবিটা দেখল মেয়েটা। কিছু বলল না। ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

'ডলি,' কিশোর বলল। 'তাহলে ধরে নিতে পারি...'

'বার ব্যার আমাকে ওই নামে ডাকছ কেন?' রাগ করে বলল মেয়েটা। 'আমি বেটি। বেটসি অ্যারিয়াগো।'

'অভিনেত্রীরা ওরকম গালভরা নামই বেছে নেয়।'

'তাতে তোমার কি? কে তুমি?'

'আমাকে আর আমার দুই বন্ধুকে অনুরোধ করেছেন আপনার বাবা-মা, আপনাকে খুঁজে বের করে দিতে।' সাগর সৈকতে পাওয়া ব্যাগটার কথা জানাল কিশোর। 'সারা রাত গাড়ি চালিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা। আপনার মা খুব কাঁদছিলেন।'

'ওদেরকে তো আমি বলেছি আমি ভাল আছি!' চিৎকার করে উঠল ডলি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যাক, স্বীকার করল এতক্ষণে! 'আসলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার ছিল আপনার। তাহলেই আর দুশ্চিন্তা করতেন না।'

'যোগাযোগ! জোর করে ধরে নিয়ে যাবে তাহলে!'

'কিন্তু কি যে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁরা কল্পনা করতে পারবেন না। একবার ফোন করেও তো বলে দিতে পারেন...'

'ঠিক আছে, বাবা, দেব!'

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খানিকটা চা কাপড়ে ফেলে দিল ডলি। সিঙ্কের কাছে একটা দেয়াল টেলিফোন রয়েছে। সেটার বোতাম টিপতে লাগল দ্রুত।

চেয়ে রয়েছে কিশোর। তার কাজ শেষ।

'হাল্লো!…হাল্লো! আম্মা?…আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি! ডলি! যে ছেলেটাকে আমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছ, এখানেই বসে আছে।…হ্যাঁ…'

থেমে ওপাশের কথা শুনতে লাগল ডলি। আবার বলল, 'না, আমি আসতে পারব না। খুব ভাল আছি। ছেলেটা বলল, তাই…'

আবার কথা শুনতে লাগল ডলি। রেগে গেল হঠাৎ। 'যা বলার বলেছি! আমি আসব না! এখানে একটা চাকরি করছি আমি। থাকার চমৎকার জায়গা পেয়েছি। কিছুদিন ক্লাস করতে হবে আমাকে…'

কিছুক্ষণ চুপ করে শুনল আবার। 'কিসের ক্লাস জানো না? কতবার বলব! অ্যাকটিং ক্লাস, অভিনয় শেখায় যেখানে। ওসব অ্যালজেব্রা-ফ্যালজেব্রার মধ্যে কোনদিনই যাব না আমি আর।'

ওপাশের কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'আব্বার শরীর খারাপটা কি আমি করেছি নাকি? তোমাকে ফোন করাটাই একটা গাধামি হয়ে গেছে!' খটাস করে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল ডলি। গজগজ করতে লাগল, 'যত্তসব! কারও কথা শোনাই উচিত না!' কিশোরের দিকে চোখ পড়তে বলল, 'বাড়ি ফিরে যেতে বলে! গেলে কি হবে জান? আবার ধরে ইস্কুলে পাঠাবে। গলা টিপে মেরে ফেলার অবস্থা করবে। তারপর যখন কতগুলো ছাইপাঁশ হজম করে ইস্কুল থেকে বেরোব, ওদের পছন্দ করা কোন হাঁদার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে! ব্যস, গেল আমার লাইফ!'

কি বলবে? জবাব খুঁজে পেল না কিশোর।

সাত

সেদিন সন্ধেবেলা রকি বীচে পৌঁছলেন ডিকসনরা। মেরিচাচীর সঙ্গে ইয়ার্ডে কাজ করছিল তিন গোয়েন্দা, গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল। বাড়ি ফিরেই আগে ফ্রেনসোতে ফোন করেছিল কিশোর। ডলির ঠিকানা দিয়েছিল, কি কি কথা হয়েছে বলেছিল। তাহলে এখানে কেন ওরা?

'খাইছে!' মুসা বলল। 'কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে!'

বেরিয়ে এলেন মিসেস ডিকসন। 'ডলিকে পেয়েছ!' হাসছেন, কিন্তু চোখ লাল। অনেক কেঁদেছেন বোঝা যায়।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'ফোনেই তো সব বললাম।'

মুসার দিকে তাকালেন মিসেস ডিকসন। চোয়াল এখনও নীল হয়ে আছে, যেখানে ঘুসি খেয়েছিল সে। 'আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশছে না তো ডলি?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল মুসা।

মিস্টার ডিকসনও বেরিয়ে এলেন। 'মেয়েটা এখন বাড়ি গেলেই হয়।'

'আপনাদের তো চেশায়ার স্কোয়্যারে যাওয়ার কথা,' কিশোর বলল। 'কোন গোলমাল?'

'আসলে,' হাসলেন মিসেস ডিকসন। 'তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই যাব ভাবলাম। আমরা গেলে হয়ত ভাগিয়ে দেবে। তোমরা যদি একটু বলেকয়ে…'

মেয়েকে ভয় পায় ডিকসনরা, বুঝে ফেলল কিশোর। তেতো হয়ে গেল মন। এদের সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত, ভাবতে লাগল সে।

সরে গেল মুসা। জঞ্জালের কাছে গিয়ে অযথাই কি যেন খুঁজতে লাগল। রবিন একটা চেয়ার পরিষ্কারে মন দিল।

কিন্তু এমন অনুরোধ শুরু করল ডিকসনরা, গাড়িতে উঠতে বাধ্য হল তিন গোয়েন্দা। আবার চেশায়ার স্কোয়্যারে চলল।

লুই গনজাগা নেই গেটে। আরেকজন দারোয়ানের ডিউটি তখন। লেসিং হাউসের মেয়েটার মা-বাবা তাকে দেখতে এসেছেন শুনে খুশি হল সে।

'দেখুন, বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কিনা।' গেট খুলে দিল দারোয়ান।

'ওরকম করে কথা বলল কেন লোকটা!' ফিরে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস।

কি বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন ডিকসন। সামনের ছোট পার্কটার দিকে নজর। আরও ডজনখানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ভিক্টোরিয়াম চেহারার বাড়িটার পাশে ছেলেমেয়েরা ভিড় করছে ওখানে। ষোলো থেকে উনিশের মধ্যে বয়েস।

সবখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। একটা ছেলে গিয়ে উঠেছে লেসিং হাউসের ছাতে। চিমনিতে পিঠ দিয়ে বসে পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে। সামার হাউসের ওপরেও উঠেছে কয়েকটা ছেলে। ড্রাইভওয়েতে ব্রেকড্যান্স করছে একটা ছেলে, ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরা। উৎসাহ দিচ্ছে।

সমস্ত কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেছে মিউজিকের আওয়াজ। ড্রাম, বাঁশি, আর আরও নানারকম বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র শব্দে কান ঝালাপালা।

'পার্টি দিচ্ছে মেয়েটা,' মিসেস ডিকসন অনুমান করলেন।

'একে পার্টি বলো?' মুখ বাঁকালেন ডিকসন। 'এ তো রায়ট লেগেছে!'

লেসিং হাউসের কাছ থেকে চারটে বাড়ি দূরে গাড়ি রাখলেন তিনি। হেঁটে এগোলেন। বাগানে গিজগিজ করছে ছেলেমেয়ের দল। চত্বরে আর বাড়ির পাশেও একই অবস্থা। কয়েকজনকে চিনতে পারল তিন গোয়েন্দা, পিজা শ্যাকে দেখেছিল।

বিকট বাজনার তালে তালে নাচছে কয়েকজন। চিৎকার করছে। কাগজের মোড়ক খুলে পিজা খাচ্ছে। পোশাক-আশাকও উদ্ভট। কেউ কেউ গহনা পরেছে। পরেছে বলেই গহনা বলে মনে হচ্ছে ওগুলোকে, নইলে কি জিনিস চেনাই যেত না। একটা ছেলে শার্ট-প্যান্ট কিছু পরেনি। কতগুলো কাপড়ের টুকরো শরীরে জড়িয়ে নিয়ে একগাদা সেফটিপিন দিয়ে আটকে রেখেছে। গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে একটা জীবন্ত সাপ। আরেকটা ছেলে এসব নাচানাচিতে নেই। সে গিয়ে চত্বরের পাশের সুইমিং পুলে ঢেলে একটা মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম খালি করছে।

সামনের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে বেলের বোতাম টিপলেন মিসেস ডিকসন। এই সময় আরও জোরালো হয়ে গেল মিউজিক। ছাগলের ডাকের মত

ম্যাঅ্যাঁ ম্যাঅ্যাঁ করে উঠল কি একটা যন্ত্র।

বাড়ির পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। হাতে ডিটারজেন্ট-পাউডারের বাক্স। ডিকসনদের ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, বেবি, লোক এসেছে।'

সামনের চত্বরে ছোট ফোয়ারাটায় গিয়ে পুরো বাক্স ঢেলে দিল সে।

বেজে চলেছে বাজনা।

ফোয়ারায় সাবানের ফেনা তৈরি হচ্ছে। ফুলে উঠল। বাইরে উপচে পড়তে লাগল ফেনা, ঘাসের ওপর দিয়ে পানির সঙ্গে বইতে শুরু করল। বাতাস এসে ঝাপটা দিয়ে কিছু ফেনা উড়িয়ে নিল। দেখতে দেখতে সাদা ফেনায় ভরে গেল কাছের পাতাবাহারের পাতা আর গাছের ডাল।

'দারুণ!' চিৎকার করে নিজের শিল্পকর্মের প্রশংসা করল ছেলেটা।

তিন গোয়েন্দার মনে হল, সব ক'টা বদ্ধ উন্মাদ।

দরজায় কিল মারতে শুরু করলেন ডিকসন। মারতেই থাকলেন, মারতেই থাকলেন।

অবশেষে খুলে গেল দরজা। মানুষের আকৃতির আজব একটা প্রাণী যেন বেরিয়ে এল। মেকাপ করে করে ফ্যাকাসে সাদা করে ফেলা হয়েছে চামড়া। কালো লিপস্টিক।

'ডলি!' চিৎকার করে বললেন মিসেস ডিকসন।

'এটা কিসের সাজ?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডিকসন। 'পেত্নীর?'

দরজা বন্ধ করে দিতে গেল ডলি। ঝট করে একটা পা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আটকালেন তার বাবা।

'ডলি! মা আমার!' ককিয়ে উঠলেন মিসেস ডিকসন। মেয়েকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি।

থমকে গেছে ডলি। কেঁপে উঠল ঠোঁট। চোখের কোণে পানি টলমল করল। ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল মায়ের বুকে। জাপটে ধরল। মেয়ের ভুরুতে লাগানো কালো মাসকারা দাগ করে দিল মায়ের সাদা ব্লাউজ, কিন্তু পাত্তাই দিলেন না তিনি।

দরজায় হেলান দিলেন ডিকসন। চুপ করে আছেন। মা মেয়ের মিলন নাটক চলছে, তা-ই দেখছেন নীরবে। মা কাঁদছে, মেয়েও কাঁদছে। মিনিটখানেক পরে ওদের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। স্টেরিও সেটটা দেখতে পেলেন, যেটা থেকে বেরোচ্ছে বিকট শব্দ। বন্ধ করে দিলেন।

আচমকা এই নীরবতা যেন বড় বেশি কানে বাজল।

হৈ চৈ কমে গেল অতিথিদের। ওরা বুঝতে পেরেছে, বয়স্ক মানুষ ঢুকেছে। পিছনে সরে যেতে শুরু করল যেন সকলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মা-বাবার সঙ্গে একা হয়ে গেল ডলি। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে পিজার মোড়ক, আর খাবারের ভুক্তাবশেষ। নোংরা করে রেখেছে। তিন গোয়েন্দার মনে হল, এই নরকে ঢোকার চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসে থাকা অনেক ভাল।

পার্টির লোকজনকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যেতে দেখে কান্না থামাল ডলি। ক্ষোভ জমতে লাগল মনে। শেষে সেটা প্রকাশই করে ফেলল, 'দিলে তো সব নষ্ট করে! আমার সব কিছুই এরকম করে নষ্ট কর তোমরা!' চিৎকার করে উঠল, 'আমার পার্টি নষ্ট করেছ! তা-ও যদি আমার টাকায় হত, এক কথা ছিল। সব করছে রোজার, আমার সম্মানে। কত কষ্ট করে কন্ট্রাক্টটা...'

'কন্ট্রাক্ট?' মা-ও চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কিসের কন্ট্রাক্ট?'

'কিসের আর! ড্রাকুলার! কি যে একখান ছবি হবে!...আম্মা, দেখলে তো আমি ভাল আছি। খামোকাই আমার জন্যে চিন্তা কর। অনেক শিখছি আমি। কিছু পয়সাও জমিয়েছি। ছবিতেও কাজ পেয়েছি। সব চেয়ে ভাল চরিত্রটা। ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেস সাজতে হবে আমাকে।'

চোখের পানি মুছে গেছে। ঝকঝক করে জ্বলছে এখন। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, অবশেষে কাজ একটা জোগাড় করেছি আমি।...ওই তো, রোজার। ইয়ান রোজার।' হাত নেড়ে ডেকে বলল, 'মিস্টার রোজার আসুন, এই যে আমার আব্বা আর আম্মা।...আম্মা, তুমি ভাবতেও পারবে না আমাকে কিভাবে নিয়েছেন মিস্টার রোজার। দেখেই বুঝে গেলেন, ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেসের চরিত্রটা আমাকেই দেয়া উচিত। আমিই পারব।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল লোকটা। এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। তাড়াতাড়ি বলল, 'গুড ইভনিং।'

তাকিয়ে রয়েছেন মিসেস ডিকসন। গোঁ জাতীয় বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল ডিকসনের কণ্ঠ থেকে।

রোজারের বয়েস তিরিশ হবে। মসৃণ চেহারা। তেমনি মসৃণ বালিরঙা চুল। কান ঢেকে আছে। পোশাক-আশাকও মসৃণ, একটা ভাঁজ নেই কোথাও।

'ডলির আম্মা!' মিসেস ডিকসনের দিকে তাকিয়ে বলল রোজার। কণ্ঠস্বরও মসৃণ, পোশাক আর চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। 'মা-মেয়ের চেহারা একেবারে এক। না বললেও চিনতাম।'

কতোটা সত্যি বলেছে লোকটা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবু খুশি হলেন মিসেস ডিকসন। আরও খুশি হলেন যখন তাঁর একটা হাত হাতে তুলে নিল রোজার, যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে, এমনি ভঙ্গিতে। 'আপনারা এসেছেন, কি যে খুশি হয়েছি আমি। মনে হচ্ছে, এতদিন কেন দেখা হয়নি। আমিও ভুল করেছি। বেটসির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করার আগে আপনাদের অনুমতি নেয়া উচিত ছিল। তাতে দেরি হত অবশ্য। হলে হত।'

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন মিসেস।

এমন মুখভঙ্গি করলেন ডিকসন, যেন পচা ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছেন। 'ড্রাকুলা, না? ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা?'

'ওটারই সীকল। পরের ঘটনা নিয়ে কাহিনী। একজন অভিনেত্রী চাইছিলাম আমরা, অপরিচিত নতুন একজন, যে মিনার চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। ব্রাম স্টোকারের কাহিনী পড়ে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে, ড্রাকুলার চেহারা দেখার

পর আর তার ভোঁতা স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হবে না। হতে পারে না। জোনাথন হারকারটা কোন কাজেরই না তো, তাই ভ্যাম্পায়ারই হয়ে যেতে চাইবে মিনা। ড্রাকুলার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে। আর তা-ই করাব আমরা আমাদের ছবিতে। উপায় একটা বের করে ফেলেছি মিনাকে ড্রাকুলার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়ার।'

'কি করে?' ডিকসনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'যতদূর মনে পড়ে, ধুলো হয়ে গিয়েছিল ড্রাকুলা।'

'তাতে কি? আমাদের মত জ্যান্ত মানুষের নিয়ম মানে না ভ্যাম্পায়াররা। ওদের জগতে অন্য রীতি।' এমন ভাবভঙ্গি করছে রোজার, যেন গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে জীবন্মৃত ভূতদের ওই জগৎ থেকে। 'আমাদের ছবিতে ধুলো থেকে ভ্যাম্পায়ারকে ফিরিয়ে আনার কৌশল জেনে যাবে মিনা। তারপর দু'জনে মিলে একটা নতুন গল্প তৈরি করবে।'

গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন, এরকম শব্দ করলেন ডিকসন। ওই মুহূর্তে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল কে যেন।

'ও, পরিচয় করিয়ে দিই,' মসৃণ কণ্ঠে বলল রোজার। 'আমার সহকারী হ্যারিসন রিভস। নাটক না করে আসরে আসতে পারে না ও। ঢোকার সময় কিছু একটা করা চাই-ই। তার যুক্তি, এতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুবিধে। হ্যারি, এস। ওঁরা বেটসির আব্বা-আম্মা।'

গোলগাল চেহারা রিভসের। রোজারেরই বয়েসী। তবে বেশভূষায় একেবারে বিপরীত। রোজার যেমন মসৃণ, সে তেমনি খসখসে। তার কালো, কোঁকড়া চুলগুলো খাটো, কান বেরিয়ে আছে। গোল গোল চোখ। নাকটা মুখের তুলনায় ছোট। সিঁড়ির গোড়া থেকে ওঠার সময় একটা হাসি দিল। বোকা বোকা লাগল হাসিটা।

'ও তাই নাকি, তাই নাকি...,' বলতে বলতে এগিয়ে এল রিভস। 'জুতোর গোড়ালিটা বেধে গিয়েছিল...'

'এই কিছুদিন আগেও টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল রিভস,' রোজার জানাল। 'কয়েক হপ্তা আগে অনেক জোরজার করে রাজি করিয়েছি ওকে ইয়ান ফিল্মসে কাজ করার জন্যে। হরর ছবি তৈরিতে তার জুড়ি কমই আছে। লোককে ভয় দেখাতে, চমকে দিতে ওস্তাদ। মানুষের মনের সমস্ত অলিগলি তার চেনা। পারেও সে জন্যেই। আমাদের ছবির দর্শকরা টের পাবে আতঙ্ক কাকে বলে। ছবি দেখে বেরিয়েই যে ভুলে যাবে, তা পারবে না। ভয়টা অনেক দিন চেপে থাকবে মনের ওপর।'

'সাংঘাতিক!' শুকনো গলায় বললেন ডিকসন।

'ডলি,' মিসেস ডিকসন বললেন। 'আয়, একটু বসা যাক। কথা বলি।'

'আবার কি কথা?' মনে হলো আবার রেগে যাবে ডলি। 'যা বলার তো বলাই হল। আর কি?'

অবাক মনে হলো রোজারকে। 'ডলি? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার নাম বেটসিই।' কিন্তু ভাবি-অভিনেত্রীর চোখে আগুনের ঝিলিক দেখেই তাড়াতাড়ি

সামলে নিল, 'ও, বুঝেছি বুঝেছি। আমি একটা গাধা। ভুলেই গিয়েছিলাম। আসল নামে অনেকেই পরিচিত হতে চায় না সিনেমায়। বেটসি তোমার স্টেজ নেম। তোমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে একলা থাকতে চাও তো? থাক। এতদিন পরে দেখা, ইচ্ছে তো করবেই। আমি দু'এক দিনের মধ্যেই যোগাযোগ করব।' ডিকসনের দিকে তাকাল রোজার। 'আমাকে আপনাদের দরকার হলে, কিংবা কোন প্রশ্ন করার থাকলে দয়া করে এই নাম্বারে একটা রিঙ করবেন।'

মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দিল সে।

'আপাতত মেষপালকের জীবন যাপন করতে হচ্ছে আমাকে আর রিভসকে,' যেন দুঃখে মসৃণ কণ্ঠটা আরও মসৃণ হয়ে গেল রোজারের। 'পাহাড়ের ওপরে একটা বাড়িতে থাকি আমরা। বাড়িটা ক্রুগার মনটাগোর। বিশ্বাস করবেন, সকালে বাড়ির পেছনের পাহাড়ে ভেড়ার ডাকে ঘুম ভাঙে আমাদের? নাহ্, আর পারা যায় না। বাড়িতে একটা ফোন পর্যন্ত নেই। তবে আপনাদের অসুবিধে হবে না। আমার সেক্রেটারি আপনাদের ফোন ধরবে, খবরটা ঠিকই পৌঁছে দেবে আমাকে।'

কার্ডটার দিকে না তাকিয়েই পকেটে রেখে দিলেন ডিকসন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমার মেয়ের যেন কোন ক্ষতি না হয়, এই বলে দিলাম। তাহলে জেল খাটিয়ে ছেড়ে দেব।'

'আব্বা!' চিৎকার করে উঠল ডলি।

'আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি,' ডিকসনের কথা গায়েই মাখল না রোজার। 'বাপ তার মেয়ের জন্যে অস্থির হবেই।' মসৃণ ভঙ্গিতে বাউ করে সহকারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে।

সামান্যতম নরম হলেন না ডিকসন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক হয়েছে! কয়েকটা কথা খোলাসা করে নেয়া দরকার!'

আট

'ডলি, মা আমার,' মিসেস ডিকসন বললেন। 'তুই জানিস তোকে আমরা ভালবাসি। বিশ্বাস করি।'

'কই করি?' স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন ডিকসন।

এড়িয়ে গেলেন মিসেস। 'মস্ত একটা সুযোগ তুই পেয়েছিস। তোকে আমরা সাহায্যই করব, কিন্তু...'

'নরিয়া, কি বলছ তুমি?' চিৎকার করে উঠলেন ডিকসন।

স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস ডিকসন। 'ও আমাদের মেয়ে বটে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক বাড়ি তো ছাড়তেই হবে। চিরকাল তো আর বাপের ঘরে থাকবে না। তাছাড়া-তাছাড়া এখন ও বড় হয়েছে। বেশ, তোমার আপত্তি থাকলে আমিই নাহয় এখানে থেকে যাই ওর সঙ্গে।'

'কোন দরকার নেই! কচি খুকি নই আমি!' চেঁচিয়ে উঠল ডলি। 'তাছাড়া থাকবে কি করে? এটা তোমার বাড়ি না। আমারও না। মিসেস লেসিঙের।

আমাকেই থাকতে দেয়া হয়েছে দয়া করে। আরেকটা কথা তোমাদের জানা থাকা দরকার, একটা বিউটি পারলারে চাকরি করি আমি।'

'ওসব কিছুই করার দরকার নেই,' গম্ভীর হয়ে বললেন বাবা। 'আমরা যা করতে বলব, তাই করতে হবে। বাড়িতে থাকতে হবে তোমাকে।'

'আহ, থাম না পিটার। আমাকে কথা বলতে দাও। তোমার সঙ্গে ও কখনোই সহজ হতে পারে না।'

'না পারলে না পারুক। পারার দরকারও নেই। আমি তার বাবা, ব্যস, যথেষ্ট।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। কয়েকবার হুমকি দিলেন। তবে আস্তে আস্তে গলার জোর কমে আসতে লাগল তাঁর। সুযোগ বুঝে দরজার দিকে তাঁকে টেনে নিয়ে চললেন মিসেস ডিকসন। বেরোনোর আগে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। মানিব্যাগ বের করলেন। এগিয়ে এসে কয়েকটা নোট মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে থেক।' বেরিয়ে গেলেন গাড়িতে ওঠার জন্যে।

মুসা আর রবিনকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। এই পারিবারিক ঝগড়ার মাঝে পড়ে অস্বস্তি বোধ করছে তিন গোয়েন্দা। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ডলিকে তো পাওয়াই গেছে, আর থেকে কি হবে?

ডিকসন দম্পতিকে অনুসরণ করে ওরাও বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। হঠাৎ বলে উঠলেন মিস্টার ডিকসন, 'ছবি না কচু! ওই ব্যাটা ছবির প্রযোজক হয়ে থাকলে আমি আমার কান কেটে ফেলব।'

চলতে আরম্ভ করল গাড়ি। চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে নেমে চলল মেন রোডের দিকে।

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' মিসেস বললেন শান্ত কণ্ঠে।

'হয়ত মানে?'

'মিস্টার রোজারকে চমৎকার লোক মনে হলো আমার। তবে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া দরকার তার সম্পর্কে। না নিলেও অবশ্য ক্ষতি নেই।'

কি ভেবে ছেলেদের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'একটা কাজ করতে পারবে? ওর কার্ড আছে আমাদের কাছে। কাজটা করতে পারবে? তোমরা চালাক ছেলে, ডলিকে যে ভাবে বের করে ফেললে, তাতেই বুঝেছি। জানতে পারবে মিস্টার রোজার সত্যিই ছবির প্রযোজক কিনা?'

গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'তা বোধহয় পারা যাবে,' কিশোর জবাব দিল। 'ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। তবে প্রযোজক হওয়ার জন্যে কোন সমিতি কিংবা সংগঠনে যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। টাকা থাকলেই হলো। আর ছবির ব্যাপারে সামান্য ধারণা। আসল কাজটা পরিচালকই করে দেয়।'

'ওই লোকটা একটা ধোঁকাবাজ!' গোঁ গোঁ করে উঠলেন মিস্টার ডিকসন। 'ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেস! কি একখান আইডিয়া! গল্পের ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই

তার। আর ওর সহকারী, ওটা তো আরেক হাঁদা। ইচ্ছে করে সিঁড়ি থেকে পড়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ···হাহ্! ধরে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত।'

মেন রোড ধরে চলতে চলতে মোড় নিলেন তিনি। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে চললেন। 'নরিয়া, এভাবে মেয়েটাকে একলা ছেড়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এক কাজ করা যেতে পারে। তুমি থাকো, চোখ রাখো। আমি বাড়ি চলে যাই।'

মাথা নাড়লেন মিসেস। 'না, তা করব না। ডলি এখন বড় হয়েছে। তাকে তার পছন্দমত চলতে দেয়া উচিত। আমরা বেশি নাক গলাতে গেলে অকর্মণ্য বানিয়ে ফেলব শেষে।'

আবার কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন ডিকসন। নানা রকম ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেন স্ত্রীকে, মেয়ের ক্ষতি হতে পারে, বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিছুতেই যখন বুঝলেন না মিসেস, তখন হুমকি দিতে লাগলেন। তাতেও কাজ হল না। অবশেষে ইয়ার্ডটা দেখা গেল। গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে ইয়ান রোজারের কার্ডটা বের করে কিশোরের হাতে দিয়ে বললেন, 'কিছু জানতে পারলে ফ্রেনসোতে ফোন কোরো আমাদের। সত্যি কথাটা জানা দরকার। মাথা খারাপ না হলে ডলিকে কেউ কোটি কোটি টাকার একটা ছবিতে স্টার বানাবে না। ও ছবির কি বোঝে?'

'বোঝে, বোঝে,' মিসেস বললেন। 'বুঝবে না কেন? বড় হয়নি?'

পরদিন খুব সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

'আমাদের কাজ এখন,' কিশোর বলল। 'ইয়ান রোজার সত্যিই প্রযোজক কিনা এটা জানার চেষ্টা করা।'

'গোলমালের দিকেই যত ঝোঁক মেয়েটার,' রবিন মন্তব্য করল। 'কিশোর, লেসিং হাউসে যে চোর ঢুকেছিল, তার সঙ্গে এই ছবিটবি বানানোর কোন যোগাযোগ নেই তো?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তা বোধহয় নেই। চোর যখন-তখন যার-তার বাড়িতে ঢুকতে পারে। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই।'

'তা ঠিক,' মুসার সঙ্গে একমত হল কিশোর। 'এ সময়ে মিস্টার ক্রিস্টোফার হলিউডে থাকলে কাজ হত। তাঁকে একটা ফোন করলেই রোজারের খবর জেনে যেতে পারতাম।'

'নেই তো কি আর করা,' হাত ওল্টাল মুসা। 'অন্য ভাবেই কাজ করতে হবে আমাদের।'

'মিস্টার সাইমনের সাহায্য নেয়া যায় না?' পরামর্শ দিল রবিন।

'বোধহয় যায়। হুঁম!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। বিড়বিড় করল আনমনেই। 'ভিকটর সাইমন! তিনিও যেহেতু গোয়েন্দা···দাঁড়াও, ফোন করি।'

'আরও একটা কথা ভুলে গেছ,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'সিনেমার সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ আছে। চিত্র-নাট্য লেখেন। ইয়ান রোজারের কথা তিনিও শুনে থাকতে পারেন।'

'ভাল কথা মনে করেছ তো!' ডায়াল করতে শুরু করল কিশোর।

ফোন ধরল ভিকটর সাইমনের ভিয়েতনামী কাজের লোক, নিসান জাং কিম। জানাল, তিনি নেই। ইডাহোতে একটা ছবির শুটিঙে দলের সাথে গেছেন। 'কয়েক দিন লাগতে পারে ফিরতে। কয়েক হপ্তাও হতে পারে। ঠিক করে বলে যাননি। ফিরলে তোমাদের কথা বলব।'

কিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নেই। ওভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে না। রোজারের কার্ডটা আছে। চলো, তার অফিসে চলে যাই।'

'ওর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে?' রবিন বলল। 'কিন্তু ওদেরকে বেতনই দেয়া হয় বাইরের লোক ঠেকা-নোর জন্যে। কথা গোপন রাখার জন্যে।'

'না বললে না বলবে। অফিসে গেলেই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।'

রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করল কিশোর। হ্যানসনকে চাইল। আছে। আর রোলস রয়েসটাও আছে। গাড়িটা পাঠাতে অনুরোধ করল সে।

চকচকে রোলস রয়েস নিয়ে হাজির হয়ে গেল হ্যানসন। মেরিচাচীর চোখে পড়ল প্রথমে। গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। 'তারমানে সারাদিনের জন্যে লাপাত্তা হবি। কিশোর, তোকে যে কাজটার কথা বলেছিলাম তার কি হবে?'

'কাল করে দেব, চাচী। মিস্টার ডিকসনের একটা জরুরী কাজ করতে যাচ্ছি আমরা।'

'সব সময় কথা তৈরিই থাকে মুখে,' নাক কুঁচকালেন চাচী। 'এমন কিছুই বলিস, যাতে মানা করা না যায়।'

গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। রোজারের কার্ডটায় সানসেট স্ট্রিপের ঠিকানা দেয়া আছে। যেতে বলল হ্যানসনকে। যেতে প্রায় আধঘন্টা লেগে গেল। স্ট্রিপে পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল হ্যানসন, যাতে অফিসটা খুঁজে পাওয়া যায়।

'মোড়ের কাছে ওই যে পার্কিঙের জায়গা,' বলল সে। 'রাখব ওখানে? লোকের চোখ পড়ে যায় গাড়িটার ওপর। গোয়েন্দাগিরিতে খুব অসুবিধে। নাকি লোকে দেখুক এখন, এটাই চাও?'

'অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই,' রবিন বলল। ডলি যদি জানতে পারে, ওর প্রিয় প্রযোজকের পেছনে লেগেছি আমরা, হুলুস্থুল বাধিয়ে ফেলবে।'

'তাহলে আর কি,' হাসল হ্যানসন। 'যা বললাম করি।' মোড়ের কাছে গেল না। আরেকটু নিরাপদ হওয়ার জন্যে পাশের একটা গলিতে ঢুকে গাড়ি রাখার জায়গা বের করে নিল।

'একসঙ্গে যাব সবাই?' মুসার প্রশ্ন।

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'না, বেশি লোক গিয়ে কাজ নেই। আমি একা যাব।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে রওনা হল সে।

দোতলা একটা বাড়িতে রোজারের অফিস। নিচতলায় একটা কফি শপ

আছে। তেমন চোখে পড়ার মত আহামরি কোন বিল্ডিং নয়। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে আবিষ্কার করল কিশোর, একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্মের সঙ্গে শেয়ারে অফিস ভাড়া করেছে ইয়ান ফিল্মস।

দরজার নবে হাত রেখেই চিৎকার শুনল কিশোর। 'যত্তোসব!'

একটা মহিলা কণ্ঠ বলল, 'একজন স্টান্ট ম্যান না পেলে হবে না। প্রোডাকশন বন্ধ রাখতে হবে। ডেভিস সাহেব তো আর রাজি হবেন না লাফটা দেয়ার জন্যে।'

'তাহলে তাই করা হচ্ছে না কেন? লোক জোগাড় করে নিয়ে এলেই হয়,' বলল প্রথম কণ্ঠটা। রোজার নয়। অন্য কেউ, যার কণ্ঠটা মসৃণ নয় রোজারের মত। 'এখানে শুটিং করলে এসব গোলমালে আর পড়তে হত না। গ্রিফিথ পার্কের পাহাড়ের সঙ্গে মেকসিকান পাহাড়ের কি এমন তফাৎ?'

নবে মোচড় দিয়ে ঠেলে পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর।

প্রথমেই চোখে পড়ল একজন মহিলাকে। ধূসর, কোঁকড়া চুল। চোখে রিমলেস চশমা। ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে। হাতে টেলিফোন রিসিভার।

টাকমাথা, নীল চোখওয়ালা একজন পুরুষ কটমট করে তাকালেন কিশোরের দিকে। তারপর গিয়ে ভেতরের আরেকটা ঘরে ঢুকে ধ্রাম করে লাগিয়ে দিলেন দরজা।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করল মহিলা। রিসিভার রাখল না।

'মিস্টার রোজার আছেন?'

'এখন অসময়। মিস্টার রোজারকে এসময়ে খুঁজতে এসেছ কেন?'

'ইয়ে…কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এক বন্ধুর বাড়িতে। কথা বলে মনে হল ছবিতে বোধহয় আমাকে ব্যবহার করতে পারবেন।'

'তোমাকে?'

'আমার অভিজ্ঞতা আছে। টেলিভিশনে অভিনয় করেছি। আপনাদের ড্রাকুলা ছবিতে কোন হাসির পার্ট থাকলে…'

'মিস্টার রোজার!' চিৎকার করে ডাকল মহিলা।

দরজা খুলে উঁকি দিলেন টাকমাথা লোকটা।

'মিস্টার রোজার, এই ছেলেটার সঙ্গে নাকি কাল আপনার দেখা হয়েছিল? ড্রাকুলা ছবির কথা বলছে। ব্যাপারটা কি?'

এঘরে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার রোজার। 'ড্রাকুলা? এনসিনাডার শুটিং নিয়েই তো মহা ঝামেলায় আছি, আবার কি? ড্রাকুলা নিয়ে ছবি তৈরি হবে কে বলল?'

দুটো সেকেণ্ড লোকটার দিকে স্থির তাকিয়ে রইল কিশোর। পকেট থেকে কার্ডটা বের করল। নীরবে সেটা তুলে দিল লোকটার হাতে।

কার্ডের দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে খোঁতখোঁত করলেন ভদ্রলোক।

'যে লোক এই কার্ড দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আজ এখানে এলে দেখা হবে,' কিশোর বলল। 'তিনি তাঁর নাম বলেছেন ইয়ান রোজার। এখন মনে হচ্ছে সত্যি কথা বলেননি তিনি।'

'তা তো বলেইনি। ছবিতে তোমাকে কোন কাজ দিয়েছে নাকি?'

'আসলে, আমাকে নয়। একটা মেয়েকে দিয়েছে।' সংক্ষেপে জানাল কিশোর, ডলিকে কাজ দেয়ার কথাটা।

'আমার কার্ড দিয়েছে,' টাকমাথায় হাত বোলালেন রোজার। 'ড্রাকুলা নিয়ে ছবি বানাচ্ছি না আমি। ওসব আমি বানাইও না। আমি তৈরি করি ডকুমেন্টারি আর বিজ্ঞাপন। তোমার মত কাউকে আপাতত দরকার নেই-আমার। আর মেয়েটাকে গিয়ে বলবে ড্রাকুলা ছবিতে অভিনয় করতে তাকে যে-ই বলে থাকুক, ঠিক বলেনি। মিথ্যে বলেছে। কাজটাজ কিচ্ছু দেবে না, নিশ্চয় ধোঁকাবজি। কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে কাজ করতে বলগে। টাকার কি খুব দরকার?'

'বলতে পারেন।'

'তোমার বন্ধু?'

'ঠিক তা নয়। চিনি আরকি। সবে পরিচয় হয়েছে।'

'তাকে একটা কথা বলবে, প্রযোজকের ব্যাপারে যেন হুঁশিয়ার থাকে। অনেকেই ওরকম মিথ্যে পরিচয় দিয়ে থাকে এখানে। লোক ঠকানোর জন্যে। আর যে লোক অন্যের কার্ড নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারে, তার ব্যাপারে তো খুবই সাবধান থাকা দরকার।'

'বলব। লোকটা কে কিছু আন্দাজ করতে পারেন? আপনার কার্ড নিয়ে এরকম ব্যাপার কি আরও ঘটেছে?'

শ্রাগ করলেন মিস্টার রোজার। 'না। তবে একগাদা কার্ড তোমাকে দিয়ে দিতে পারি আমি। দেয়ার জন্যেই বানানো হয়েছে ওগুলো। যে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে। লোকটা দেখতে কেমন?'

'এই তিরিশ মত বয়েস। হালকা বাদামি চুল। সব কিছুই মসৃণ। চলন-বলন, পোশাক-আশাক, সব। বলল পাহাড়ের ওপরের একটা বাড়িতে থাকে। বাড়ির মালিকের নাম ক্রুগার মনটাগো।'

'আরামেই আছে দেখা যায়। নিরাপদে। মনটাগো মারা গেছেন।' চিন্তিত দেখাল রোজারকে। 'মেয়েটাকে গিয়ে বলবে, এক্ষুণি যাতে কেটে পড়ে। ওই লোকের ধারেকাছেও আর না যায়। শয়তানগুলো মানুষ ঠকানোর তালে থাকে। নাম্বার ওয়ান ঠগবাজ একেকটা। মাঝে মাঝে ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ওরা।'

নয়

চেশায়ার স্কোয়্যারের গেটে এসে থামল রোলস রয়েস। ডিউটিতে রয়েছে লুই গনজাগা। তার ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বিশাল গাড়িটার দিকে।

ছেলেদের ওপর চোখ পড়তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরিব্বাপরে, কি গাড়ি নিয়ে এসেছ! সত্যি বলছি, অবাক করেছ আমাকে! বেটসি জানে এটার কথা? নাকি সারপ্রাইজ দিতে এসেছ?'

'সারপ্রাইজ তো বটেই,' মুসা বলল। 'আমরা যা বলতে এসেছি, শুনলে

রীতিমত ভরকে যাবে। কারেন্টের শক খেলেও অতটা চমকাবে না।'

'ঘরে আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে। লম্বা চুলওয়ালা লোকটা আর তার উজবুক সহকারীটা এসেছিল খানিক আগে। চলে গেছে। দাঁড়াও, ডাকছি।'

ছোট ঘরে ফিরে গেল দারোয়ান। জানালা দিয়ে দেখা গেল, টেলিফোন করছে। কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আছে তো আছেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে নামিয়ে রাখল।

'ধরছে না কেউ,' জানাল দারোয়ান।

'বাইরে-টাইরে যায়নি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল গনজাগা। 'গেলে দেখতাম।'

সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। 'মিস্টার রোজারের সঙ্গে বেরোয়নি তো? ঠিক দেখেছেন?'

'না, বেরোয়নি। রোজারের সঙ্গে গেছে হাঁদাটা। মোটকা, কোঁকড়াচুলো। বেটি যায়নি।'

উদ্বিগ্ন হলো দারোয়ান। তার ওপর আদেশ রয়েছে, ভালমত না জেনে, না চিনে যাতে স্কোয়্যারে কাউকে ঢুকতে না দেয়। 'দেখি, আবার চেষ্টা করি।'

আবার গিয়ে ঘরে ঢুকল সে। রিসিভার তুলে বোতাম টিপল। কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল। এবারেও সেই একই ব্যাপার। ধরল না কেউ। হাত নেড়ে রোলস রয়েসটাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল সে। কিশোররা নিজেই গিয়ে যাতে দেখতে পারে।

'দরজায় ধাক্কা দেবে,' বলে দিল সে। 'না খুললে গিয়ে দেখবে সুইমিং পুলে। কোথাও না পেলে সোজা চলে আসবে আমার কাছে। তারপর দেখব কি করা যায়।'

ছোট পার্কটার কাছে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। নীরব হয়ে আছে লেসিং হাউস। আগের সন্ধ্যার মত সরব নয়। তবে পার্টি যে একটা হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও রয়েছে। কাগজের কাপ, প্লেট, মোড়ক আর নানারকম জঞ্জাল পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে, ঝোপঝাড়ের নিচে। হাঁটার সময় পায়ের নিচে পড়ছে।

প্রথমে কলিংবেলের বোতাম টিপল কিশোর। কয়েকবার টিপেও কারও সাড়া পেল না। দরজা খুলতে এল না কেউ।

'ডলি নেই,' রবিন বলল।

'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে,' বলল কিশোর। 'আমি শিওর।'

'আমি গেটে যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'দারোয়ানের কাছে নিশ্চয় মাস্টার কী আছে।'

দৌড় দিল সে। রোলস রয়েসটার পাশ কাটাল। ভেতরে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।

কিশোর আর রবিন বাড়ির পাশ ঘুরে এগোল। দেখল, বাইরে কোথাও আছে কিনা ডলি। পেল না।

আবার সামনের চত্বরে ফিরে এসে দেখল দারোয়ানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

মুসা। হ্যানসনও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। সবাই উৎকণ্ঠিত। মাস্টার কী আছে দারোয়ানের কাছে। দরজার তালা খুলল। হলে ঢুকল সবাই। আগের সন্ধ্যার পার্টির চিহ্ন এখানেও রয়েছে।

'ডলি!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর।

জবাব দিল না কেউ।

খুঁজতে আরম্ভ করল ছেলেরা। নিচতলাটা দেখতে বেশি সময় লাগল না। তারপর ওপরতলায় চলল ওরা। তাদের সঙ্গে চলল লুই গনজাগা। হ্যানসন নিচতলায় পাহারায় রইল।

ওপরতলার দরজাগুলো বন্ধ। একের পর এক খুলতে লাগল দারোয়ান। ভেতরে উঁকি দিল ছেলেরা। আবছা অন্ধকার, অব্যবহৃত বেডরুমগুলোর পর্দা টানা। হলের শেষ মাথায় একটা ঘর দেখা গেল, যেটা হরদম ব্যবহৃত হয় বলে মনে হল। বেশ বড় একটা বিছানা। লাল রঙের চাদরের একটা ধার ওল্টানো। একজোড়া চপ্পল যেন ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে চেয়ারের নিচে। বিছানার পায়ের কাছটায় পড়ে রয়েছে একটা মখমলের আলখেল্লা।

একটা জানালার পর্দা টেনে দিল গনজাগা। রোদ এসে পড়ল ভেতরে। আলোকিত হয়ে গেল ঘরটা।

'মনে হচ্ছে এটাই মিসেস লেসিঙের ঘর,' দারোয়ান অনুমান করল। 'এই বেডরুমটাই ব্যবহার করেন।' ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল। ছোট একটা ট্রেতে সাজানো রয়েছে নানারকম পারফিউমের শিশি। 'বেটি মেয়েটা ভাল। এঘরে নিশ্চয় ঢোকে না সে। জিনিসপত্র ব্যবহার করে না। করে থাকলে ঠিক করেনি।'

ঘুরতে শুরু করল মুসা। টান দিয়ে একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা খুলল। ভেতরে এত জায়গা, ছোটখাট একটা বেডরুমই বলা চলে। কাপড় বোঝাই।

'মিসেস লেসিং না ইউরোপে চলে গেছেন?' ভুরু কুঁচকে বলল মুসা। 'কি নিয়ে গেলেন তাহলে? সবই তো ফেলে গেছেন মনে হচ্ছে?'

তার কথার জবাব দিল না কেউ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে কার্পেটের দিকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল দারোয়ানকে, 'আর কোন গেট আছে? স্কোয়্যার থেকে বেরোনোর?'

'আছে। আবর্জনার গাড়ি আর ডেলিভারি ভ্যানগুলো ঢোকে ও পথে। সব সময় তালা দেয়া থাকে। প্রয়োজনের সময় খুলে দেয়া হয়।'

'চাবি কার কাছে?'

'চাবি নেই। ঢোকার দরকার হলে আমাকে খবর পাঠায়। গার্ডহাউসে বসে সুইচ টিপে খুলে দিই।'

'পাশের বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে হয়ত ডলি,' রবিন বলল।

'মনে হয় না। এখানে কারও সঙ্গে মেলামেশা নেই ওর।'

আরেকটা দরজা খুলল মুসা। আশা করেছিল আরেকটা আলমারি দেখবে। তা নয়। ওটা বাথরুম। মার্বেল পাথরে তৈরি বাথটাবে উপচে পড়ছে সাবানের ফেনা। সাবানের গন্ধে বাতাস ভারি। মার্বেল পাথরে তৈরি একটা কাউন্টারের ওপর

বসানো হয়েছে দুটো সিংক, ওগুলোতে নানারকম শিশিবোতল আর জার। উল্টে রয়েছে একটা বোতল। মার্বেলের কাউন্টারে পড়েছে হলদেটে তরল, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে মেঝেতে।

'নোংরা স্বভাবের মেয়ে,' মন্তব্য করল রবিন।

জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। চোখ বোলাল পুরো বাথরুমে। 'ও বাথরুমে থাকতে ফোন বেজেছে। উঠে গিয়ে ধরেছে। জানল, গেটে দাঁড়িয়ে আছে রোজার। তাকে ছাড়তে বলল দারোয়ানকে। গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিচে নামল দরজা খোলার জন্যে। তারপরই কিছু ঘটেছে। বিপজ্জনক কিছু। ফিরে এসে আর বাথরুমটা পরিষ্কার করতে পারেনি।'

'না, আমার মনে হয় ফিরে এসেছিল। লোকটার তাড়া খেয়ে এখানে এসে ঢুকেছিল। ধস্তাধস্তি হয়েছিল হয়ত। হাত লেগে উল্টে পড়েছে বোতলটা।'

'অতি কল্পনা করছ তোমরা,' দারোয়ান বলল। অস্বস্তি বাড়ছে তার। 'আসলে অন্য কিছু ঘটেছে। স্বাভাবিক কিছু। মেয়েটা নোংরা। ফলে গোসল করার পর বাথরুম পরিষ্কার করেনি। পারফিউম ব্যবহার করে বোতলটা রেখেছে। উল্টে যে গিয়েছে খেয়ালই করেনি। বাথরুম এভাবে রেখেই মিস্টার রোজারকে দরজা খুলে দেয়ার জন্যে নিচে নেমে গিয়েছিল·তারপর...তারপর...'

'তারপর কি?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তারপর কোথায় গেল? রোজারের সঙ্গেও যায়নি, পাশের বাড়িতেও যায়নি, তাহলে গেলটা কোথায়? কি হয়েছে তার?'

ছোট তোয়ালেটা নজরে পড়ল রবিনের। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পায়ের কাছে রয়েছে ওয়েস্টবাস্কেটটা। তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে।

'এই, দেখে যাও!' নিচু হয়ে তোয়ালেটা বের করে আনল সে। সাদা রঙের। এককোণে এমব্রয়ডারি করা একটা প্রজাপতি। মরচে-লাল দাগ লেগে রয়েছে।

'এটার কি কোন গুরুত্ব আছে?' প্রশ্ন করল রবিন যেন নিজেকেই।

একবার তাকিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল গনজাগার। 'রক্ত!' দুই লাফে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল তোয়ালেটার জন্যে। 'এখনও ভেজা। কিছু একটা ঘটেছে আজ সকালে এখানে। পুলিশে খবর দেয়া দরকার।'

দশ

খবর পেয়ে চীফ ইয়ান ফ্লেচার নিজে এসে হাজির হলেন। অগোছালো নোংরা হয়ে থাকা বাথরুমে একবার চোখ বুলিয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন দারোয়ানের দিকে। 'সকালে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল বলছ। গাড়ির নম্বর রেখেছ?'

'রেখেছি। গার্ডহাউসের লগবুকে লেখা আছে। কসম খেয়ে বলতে পারি, মেয়েটা ওই গাড়িতে করে বেরোয়নি।'

'কিন্তু কোন ভাবে তো নিশ্চয় বেরিয়েছে। নাহলে নেই কেন?' নিচতলায় চললেন চীফ।

'পড়শীদের সঙ্গে কথা বলব,' আবার বললেন চীফ। 'কেউ না কেউ কিছু দেখে থাকবেই। এই,' তিন গোয়েন্দাকে বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলে যাও।'

'স্যার···' বলতে গেল কিশোর।

'চলে যাও। এখন আর কিছু করার নেই তোমাদের। যা করার পুলিশ করবে।'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরতে হলো তিন গোয়েন্দাকে, বিশেষ করে গোয়েন্দাপ্রধানকে। তাদেরকে ইয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে চলল হ্যানসন। কিছুক্ষণ থমথমে নীরবতা বিরাজ করল গাড়ির ভেতরে।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে মুখ খুলল মুসা, 'রহস্যটা ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

'কি বলতে চাও?' রবিনের প্রশ্ন।

'প্রথমে সৈকতে একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেলাম। মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। সহজেই হয়ে গেল কাজটা, লাইব্রেরিতে ফোন করে। কি জানলাম? ব্যাগের মালিকই হারিয়ে গেছে। তখন আবার তাকে খুঁজে বের করতে হল। করে দিলাম। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বাবা-মা। আমাদেরকে তদন্ত চালিয়েই যেতে বললেন। যে লোকটা ওঁদের মেয়েকে কাজ দিয়েছে, তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে। নিতে গিয়ে দেখলাম ভুয়া। গেলাম তখন মেয়েটাকে সতর্ক করতে। পারলাম না। কারণ, এখন মেয়েটাই গায়েব।'

'এবং এই প্রথম,' যোগ করল কিশোর। 'রহস্যটা জমতে আরম্ভ করেছে। আরও মজা হল, পুলিশ আমাদের বের করে দিয়েছে। নাক গলাতে নিষেধ করেছে।'

'করে তো ভালই করেছে। এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যাবে।'

'এর চেয়ে জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি।' বলে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

আবার নীরবতা।

ছেলেদেরকে ইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন। ইয়ার্ডের গেটের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বন্ধ করে রাখা হয়েছে পাল্লা। দিনের এই সময়ে, দুপুরবেলা ইয়ার্ডের গেট কখনও বন্ধ থাকে না।

'চাচা-চাচী নেই নাকি?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর।

'আমি বলি কি হয়েছে,' আগ বাড়িয়ে জবাব দিল রবিন। 'নোমে কতগুলো পুরানো বাড়ি ভেঙে ফেলার খবর পেয়েছেন রাশেদ আংকেল। ছুটে গেছেন দেখার জন্যে পুরানো পাইপ আর সিংক পাওয়া যায় কিনা।'

রবিনের অনুমান ঠিক হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এরকমই করেন রাশেদ পাশা। তবে জায়গার ব্যাপারে ভুল করেছে সে। নোমে যাননি তিনি। ডাক শুনে জঞ্জালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুই বেভারিয়ান ভাইয়ের একজন, রোভার। জানাল, লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন একটা ভাঙা বাড়ির পুরানো মাল কিনে আনতে।

'ম্যাম গেছেন রান্নাঘরে,' হাত তুলে দেখাল রোভার। 'ঢুকেছেন অনেকক্ষণ। আমি একা। চোরের তো অভাব নেই। কখন ঢুকে কি হাতে তুলে নিয়ে যায়। কাজ করছি। দেখতেও পারব না। তাই লাগিয়ে রেখেছি।'

গেট খুলে দিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা থাকবে তো? না আবার বেরোবে?'

থাকবে, জানাল কিশোর।

গেট আর বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করল না রোভার। চলে গেল নিজের কাজে।

রবিন আর মুসা বাড়ি চলে গেল। কিশোর রইল একা। অফিসের বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল ডালিয়া ডিকসনের কথা। কল্পনায় ভাসছে অগোছালো বাথরুম। কি ঘটেছিল? চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে মেয়েটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি দারোয়ান। রোজারের গাড়ির বুটে লুকিয়ে থাকেনি তো? নাকি একাই কোনভাবে বেরিয়ে পালিয়েছে আবার? তোয়ালেতে রক্তের দাগের কি অর্থ?

খচখচ করছে মন। চাচী এতক্ষণ কি করছেন? এই সময়ে তো তিনি অফিস ফেলে সাধারণত রান্না করতে যান না। আর গেলেও বড় জোর দুই কি তিন মিনিট। তাড়াহুড়া করে ফিরে আসেন। চুলায় চাপিয়ে দিয়েই। তারপর মাঝে মাঝে উঠে যান কতটা কি হল দেখার জন্যে। সাংঘাতিক একটা ব্যস্ত আর উত্তেজনাময় সময় কাটে তখন তাঁর। নাহ, দেখতে হচ্ছে।

'রোভার?'

জঞ্জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রোভার। ঘামছে।

'আমি বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'কাজ আছে। গেট দেখবেন।'

'আচ্ছা।'

রান্নাঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর।

ভেতরে কেউ নেই। চুলায়ও কিছু চাপানো নেই। মেঝেতে পড়ে আছে একটা খাবারের টিন, কেউ ফেলেছে। ঢাকনাটা খুলে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে আছে এককোণে।

হঠাৎ শীত করতে লাগল কিশোরের।

কান পেতে আছে। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। ডাকবে? মেরিচাচী কি আছে বাড়ির ভেতরে কোথাও? নাকি অন্য কেউ ঢুকে বসে আছে, যে চমকে দিয়েছে চাচীকে, হাত থেকে তখন টিনটা পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কে চমকে দিয়েছিল? চাচীই বা এখন কোথায়?

ডাইনিং রুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল ভেতরে। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা বাসন। সেগুলো মোছার কাপড়টাও মেঝেতে। আলমারির তাকের ড্রয়ারগুলো খোলা। নিচে পড়ে আছে আরও বাসন-পেয়ালা আর চামচ।

মুখ শুকিয়ে গেল কিশোরের। জোরে চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করল, তবে চাপা দিল ইচ্ছেটা। উচিত হবে না। যে ঢুকেছে সে এখনও বাড়িতেই থাকতে

পারে। মেরিচাচীকে ভয় দেখিয়ে আটকে রেখেছে হয়ত। কিশোর উল্টোপাল্টা কিছু করলে এখন চাচীর বিপদ হতে পারে।

ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগোল কিশোর। লিভিং রুমেও একই অবস্থা। তাকের বই আর অন্যান্য জিনিস মেঝেতে ছড়ানো। টেবিলের ড্রয়ার খুলে মেঝেতে ফেলে রেখেছে। লিভিং রুমের পরে হলঘরেরও একটা অংশ চোখে পড়ছে। একটা ওয়ারড্রোব খোলা। কাপড়-চোপড় আর জুতো বের করে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু মেরিচাচী নেই। দেখা গেল না কোথাও।

রাশেদ পাশার ব্যক্তিগত ঘরটাকেও রেহাই দেয়া হয়নি। তাঁর ডেকসেট আর টার্নটেবলটা নেই। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে স্পীকারগুলো। বেশি বড় বলেই বোধহয় অসুবিধে হবে মনে করে নেয়নি চোর। নাকি নেয়ার সময় পায়নি? কেউ এসে হাজির হয়েছিল?

হাজির! হ্যাঁ, এটাই হবে! মেরিচাচী এসেছিলেন কোন কারণে। চোরটা বাধা পেয়েছিল।

কেন এসেছিলেন চাচী, সেটাও বুঝতে পারল কিশোর। ক্যাশবাক্সটা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মনে পড়ল, রান্নাঘর দিয়ে আসার সময় ছোট টেলিভিশন সেটটার পাশের কাউন্টারে সেটা দেখে এসেছে। নিশ্চয় চাচীই রেখেছেন ওখানে।

দ্রুত আবার রান্নাঘরে ফিরে এল কিশোর। এখনও রয়েছে বাক্সটা। ডালা খুলে দেখল, ভেতরে টাকাপয়সা ঠিকই আছে। অনেক টাকা। একশো ডলারের বেশি। সেগুলো নেয়নি চোর।

কেন? মেরিচাচীই বা কোথায়?

'চাচী!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। গলা কাঁপছে।

জবাবে বিচিত্র একটা মিশ্র শব্দ কানে এল। চাপা চিৎকার। সেই সাথে কিল মারার আওয়াজ।

প্রায় উড়ে গেল যেন কিশোর। রান্নাঘরের লাগোয়া আরেকটা ছোট ঘর আছে। অনেকটা স্টোররুমের মত ব্যবহার করা হয় ওটাকে। ওয়াশিং মেশিন আর ড্রাইয়ার মেশিনগুলো ওখানেই থাকে। এককোণে রয়েছে একটা আলমারি, তাতে ঝাড়ু, ব্রাশ আর ঘর পরিষ্কারের অন্যান্য জিনিস রাখা হয়। ওটার ভেতর থেকেই এসেছে শব্দটা।

বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে আলমারির পাল্লা, ঝুল ঝাড়নের লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে। একটা মাথা দরজার হাতলে ঠেকিয়ে আরেক মাথা আটকে দেয়া হয়েছে ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে। ফলে ভেতর থেকে যত ঠেলাঠেলিই করা হোক, আলমারির দরজা আর খোলা যাবে না।

'চাচী,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ভেতরে আছ তুমি? আমি কিশোর!'

আলমারির ভেতর থেকে চাপা কথা শোনা গেল আবার।

হ্যাঁচকা টানে ডাণ্ডাটা সরিয়ে আনল কিশোর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আলমারির দরজা।

সফট ড্রিংকসের বোতল খুললে যেমন ফস্‌স্‌ করে আচমকা বেরিয়ে আসে গ্যাস আর তরল পদার্থ, অনেকটা তেমনি ভাবে বিশাল শরীর নিয়ে ছিটকে বেরোলেন মেরিচাচী। তাঁর সঙ্গে বেরোল প্রচুর ধুলো, ব্রাশ আর নানারকম টিন।

'কিশোর! এলি শেষতক!'

টকটকে লাল হয়ে গেছে তাঁর মুখ। ঘাড়ের কাছে চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। মেঝেতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। চোখ জ্বলছে।

'দাঁড়া, আগে ধরে নিই শয়তানটাকে! তারপর দেখাব মজা!'

মনে মনে হাসল কিশোর। এই মুহূর্তে লোকটা যদি মেরিচাচীর সামনে পড়ে তাহলে ওর জন্যে করুণাই হবে তার।

এগারো

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এল। রান্নাঘরের চেয়ারে বসে কিশোরের বানিয়ে দেয়া কফিতে চুমুক দিচ্ছেন তখন মেরিচাচী।

'কি হয়েছিল, সব বলতে পারবেন, এখন ম্যা'ম?' অনুরোধ করল একজন অফিসার।

নিশ্চয় পারবেন তিনি। আর বললেনও বেশ উৎসাহের সঙ্গে। তবে তাতে রাগ আর ক্ষোভ প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে। রান্নাঘরে এসেছিলেন তিনি স্যুপ তৈরি করার জন্যে। সবে একটা টিন পেড়েছেন তাক থেকে, এই সময় ডাইনিং রুমে নড়াচড়ার শব্দ শুনলেন। ভাবলেন কিশোর এসেছে। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

জবাব পেলেন না। মুহূর্ত পরেই পেছন থেকে কেউ জাপটে ধরল তাঁকে। নাকেমুখে চেপে ধরল নরম কোন জিনিস। হাত থেকে টিনটা খসে পড়ে গেল তাঁর। ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল আলমারিটার কাছে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আটকে দেয়া হলো। এমন ভাবেই ঘটে গেল ঘটনাটা, লোকটাকে দেখতে পর্যন্ত পারেননি তিনি। সারাক্ষণই পেছনে ছিল লোকটা।

আলমারির কাছে একটা পুরানো বালিশ দেখতে পেল অফিসার। ওটাই মেরিচাচীর মুখে চেপে ধরা হয়েছিল বলে অনুমান করা হল। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কতক্ষণ ছিল, আন্দাজ করতে পারবেন? ক্যাশবাক্স ছোঁয়নি সে। দামী আরও অনেক জিনিস আছে, ইচ্ছে করলে নিতে পারত। নেয়নি। যেন কোন কারণে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

'ভয়! ভয় তো কাকে বলে জানেই না সে! জানাব! একবার ধরতে পারলে হয়!'—ঘোষণা করে দিলেন মেরিচাচী। 'ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ ছিল। কিশোর আসার একটু আগে গেছে। কিশোর যে ঢুকেছে, টের পেয়েছি আমি। ভেবেছি, চোরটাই। সে না ডাকলে বুঝতে পারতাম না।'

অফিসার আর তার সহকারী সূত্র খুঁজতে শুরু করল। ডাইনিং রুমের জানালার একটা পর্দা খুলে নিচে পড়ে আছে।

'এদিক দিয়েই ঢুকেছে মনে হয়,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল একজন

অফিসার। 'চুরি করতে। যা যা সরাতে চেয়েছিল সরানোর আগেই ঢুকে পড়েছিলেন তোমার চাচী। তাঁকে আটকে ফেলার পরেও আর বেশি সময় পায়নি। কিংবা এত বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কাজটা আর ঠিকমত সারতে পারেনি। চুরি করতে ঢুকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে এমনিতেই চোরের কলজে কাঁপে। অনেক সময় অকারণেই ভয় পেয়ে পালায়।'

চোরাই ডেকসেটটা উদ্ধারের ভরসা দিতে পারল না পুলিশ। তবু মেরিচাচীকে বলল, সাধ্যমত চেষ্টা করবে বের করার। বলে চলে গেল। ওরা যাওয়ার একটু পরেই রাশেদ পাশা এসে ঢুকলেন। কিশোর তখন অগোছাল জিনিসগুলো গুছিয়ে শেষ করেছে। পর্দাটা লাগাচ্ছে রোভার।

কাজ শেষ করে ওয়ার্কশপে চলল কিশোর। ঢুকে দেখল, মুসা এসেছে। সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখছে।

'পুলিশকে যেতে দেখলাম,' মুসা বলল। 'এখানেই এসেছিল নাকি?'

'হ্যা। রকি বীচে মনে হয় চোরের উপদ্রব বেড়েই গেল। দু'দিন আগে মিস লেসিঙের বাড়িতে ঢুকেছিল। আজকে ঢুকেছে আমাদের বাড়িতে। মেরিচাচীকে আলমারিতে আটকে রেখেছিল।'

'কি বললে?'

সংক্ষেপে জানাল কিশোর।

হা হা করে হাসতে লাগল মুসা। 'আল্লাহ না করুক, চোরটা যদি ধরা পড়ে তবে ওর কপালে দুঃখ আছে। হা হা! আর লোক পায়নি, শেষকালে মেরিচাচীকে…হাহ হা!'

কিশোরও হাসল।

'তা মেরিচাচীর চোরটাকে খুঁজতে বেরোবে নাকি?'

'না। পুলিশই যা করে করুক। মনে হচ্ছে সাধারণ চোর।'

'তার মানে ডালিয়া ডিকসনের কেসেই শুধু আপাতত মাথা ঘামাব আমরা?'

জবাব দেয়ার আগে ভাবল কিশোর। 'সেটাও পারব কিনা বুঝতে পারছি না। চীফ তো আমাদেরকে প্রায় তাড়িয়েই দিলেন। তার মানে তিনি চান না ডলিকে নিয়ে মাথা ঘামাই আমরা।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার সে। উজ্জ্বল হলো মুখ। 'তবে, তার বাবা-মাকে ফোন করতে পারি আমরা। যা যা ঘটেছে, জানাতে পারি।'

'আমরা মানে কি? আমাকে এসব থেকে বাদ দিতে পার তুমি। একা পারলে করগে। ডিকসনদেরকে অপছন্দ করি আমি, তা নয়। মিস্টার ডিকসন ঠিকই আছেন, তবে মিসেস একটু বেশি লাই দেন মেয়েকে। আমার মনে হয় তাঁর জন্যেই খারাপ হয়েছে মেয়েটা। ভাগ্যিস আমার মায়ের ঘরে জন্মায়নি। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলত।'

হাসল কিশোর। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সরাল। 'এসো, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।'

হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দু'জনে। ডেস্কে বসেই আগে ফ্রেনসোতে ডিকসনদের

নম্বরে ডায়াল করল কিশোর। ওপাশে বেজেই চলল ফোন। রিং হচ্ছে···হচ্ছে···দশবার পর্যন্ত গুনল সে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'বাড়ি নেই। কেউ ধরছে না।'

'চীফ হয়ত ফোন করেছিলেন,' মুসা বলল। 'রওনা হয়ে গেছেন ওঁরা। রকি বীচে আসার জন্যে।'

'হতে পারে।···এখন ভেবে দেখা দরকার, কি কি সূত্র আছে আমাদের হাতে? রোজারের কার্ডটা ভুয়া। প্রমাণ হয়ে গেছে। আর তার সহকারী···সহ···'

চুপ হয়ে গেলে কিশোর। হাত এখনও রিসিভারে।

'কি হল? কিছু ভাবছ মনে হয়?'

'হ্যারিসন রিভস! রোজার বলেছে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সে কাজ করেছে নাকি লোকটা। সত্যি বলেছে?'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিল মুসা। খুঁজতে শুরু করল। ফিল্ম স্টুডিওর নামটা বের করতে সময় লাগল না। দেখাল সেটা কিশোরকে।

ডায়াল করল কিশোর। অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল হ্যারিসন রিভসের নাম। কিছুক্ষণ খাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে অপারেটর জানাল, ওই নামে কেউ নেই। কিশোরকে জিজ্ঞেস করা হল সে কে বলছে। বানিয়ে বলে দিল কিশোর, সে রিভসের খালাত ভাই। লস অ্যাঞ্জেলেসে বেড়াতে এসেছে। ভাইয়ের ঠিকানাটা খুব দরকার।

'এত মিথ্যে বলতে পারো!' বিড়বিড় করে বলল মুসা।

মাউথপীসে হাত রেখে তার দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

জবাব শোনার আগেই ওপাশ থেকে মহিলা বলল, 'আরেকটা রেজিস্টার খুঁজে দেখলাম। নেই। ওই নামের কেউ নেই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর।

'নেই। কোন সূত্রও পেলাম না, যা দিয়ে শুরু করতে পারি। দু'জন লোক যেমন রহস্যজনক ভাবে দেখা দিল, তেমনি ভাবেই গায়েব হয়ে গেল আবার। সেই সঙ্গে ডলিও গায়েব।'

'ওই পিজা শ্যাকে আরেকবার গেলে কেমন হয়? খাওয়াও যাবে, শোনাও যাবে। ডলির পার্টিতে যারা গিয়েছিল তাদের কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, ডলির খোঁজ জানে কিনা। রোজার আর তার হাঁদা সহকারীটার কথাও কিছু জানতে পারে।'

'সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে···রাজি হয়ে গেল কিশোর। বেরিয়ে এল দু'জনে। সাইকেল নিয়ে চলল পিজা শ্যাকে। রবিনকে ফোন করল না ইচ্ছে করেই। জানে, করলেও লাভ হবে না। কারণ অনেক দিন পর লাইব্রেরিতে গেছে রবিন। সেখান থেকে যাবে তার চাকরির জায়গায়, মিউজিক কোম্পানিতে।

পিজা শ্যাকে পৌঁছল দু'জনে।

একই রকম ভাবে মিউজিক বাজছে, জোরে জোরে। ভিডিও গেম খেলছে ছেলেমেয়েরা। হৈ চৈ করছে। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে বসে খাচ্ছে অনেকে। অর্থহীন কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে।

সেদিন পার্টিতে গিয়েছিল এরকম একটা ছেলে কিশোর আর মুসাকে দেখেই চিনল।

'অ্যাই!' হাত নেড়ে ডাকল সে। হাসল। তার কাছে গিয়ে বসতে বলল। 'চিনতে পার? সেদিন পার্টিতে দেখা হয়েছিল। তো, আছ কেমন?'

'আছি একরকম,' জবাব দিল কিশোর। 'ডলিকে খুঁজতে এলাম।'

'ডলি? ও আচ্ছা, বেটির কথা বলছ। কি হয় তোমার? বোন?'

'না। কিছু হয় না।'

'ও,' কিছুটা অবাকই হলো যেন ছেলেটা।

তার পাশের চেয়ারটায় বসল কিশোর। মুসা বসল উল্টো দিকে, ওদের দিকে মুখ করে।

'চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে নিখোঁজ হয়েছে ডলি,' ছেলেটাকে জানাল কিশোর। 'আমাদের ধারণা, কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

হাঁ হয়ে গেল ছেলেটা। 'যাহ্, ঠাট্টা করছ।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আজ সকালেও লেসিং হাউসে ছিল ডলি। দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলেছে। রোজার দেখা করতে এল তার সঙ্গে। সাথে করে রিভসকেও এনেছিল। তারপর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটাকে।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ছেলেটা। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'অ্যাই, শুনে যাও তোমরা। এরা কি বলছে শুনে যাও।'

বন্ধ হয়ে গেল ভিডিও মেশিন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল কিশোরদেরকে, গল্প শোনার জন্যে। কাউন্টারের ওপাশে ওয়েইট্রেস মহিলাও গলা বাড়াল।

ডলির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ না দিয়ে। শেষে বলল, 'রোজার আর রিভস তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে। রোজারের সঙ্গে নিশ্চয় তোমাদের কারও কারও পরিচয় হয়েছে। লোকটা একটা ভুয়া। নামটাও আসল কিনা সন্দেহ আছে। ফলে তাকে ধরাটাও মুশকিল। তোমাদের কারও কি কিছু জানা আছে?'

চুপ করে আছে সবাই।

দরজা খুলে ঢুকলেন ধূসর চুলওয়ালা লোকটা। ম্যানেজার। কিশোর আর মুসাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন ছেলেমেয়েদেরকে।

'কি হয়েছে?' ওয়েইট্রেসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওদের বন্ধুর কথা আলোচনা করছে, মিস্টার জেনসেন,' মহিলা বলল। 'এত সুন্দর একটা মেয়ে, হারিয়ে গেল। কত আসত এখানে। ভিডিও গেম খেলত। সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করত। ওরা বলছে, ওকে নাকি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কিডন্যাপ?' ভুরু কুঁচকে গেল ম্যানেজারের।

'তাই তো বলছে।'

মহিলার দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। 'রোজার সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? এখান থেকে অনেক পিজা নিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'বিশেষ কিছু জানি না। তবে ওকে পছন্দ হয়নি আমার। এদের বন্ধু হওয়ার বয়েস নয় ওর।'

'হলিউডের অনেক বড় প্রযোজক ও,' একটা ছেলে বলল। 'ও নিজেই বলেছে। বেটির অনেক প্রশংসা করে বলেছে, ও নাকি অভিনয়ে সাড়া জাগাতে পারবে।'

'এখানেই দেখা করেছে?' কিশোর জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। সাথে করে নিয়ে এসেছে বোকা লোকটাকে। আলাদা হয়ে গিয়ে ফিসফাস করে কথা বলেছে বেটির সঙ্গে। এমন ভান করেছে যেন বেটিকে পেয়ে হাতে সোনার বার পেয়ে গেছে।'

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল একটা মেয়ে। একটা চেয়ার খালি রয়েছে, তাতে বসল।

'বেটির মাথায়ও বোধহয় ছিটটিট আছে। বাস্তবতা বোঝে না, কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। কি বলছি বুঝতে পারছ? ওর ধারণা, ও ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে। কাজেই লোকটা এসে যখন বলল, লাফিয়ে উঠল একেবারে। তারপর আর কি? লোকগুলোর সঙ্গে খাতির করে ফেলল। একসাথে বসে পিজা খেতে লাগল। লোকগুলো অনেকক্ষণ কথাটথা বলার পর আমাদের সবাইকে ডেকে বলল, বেটসির নতুন কাজটাকে সেলিব্রেট করার জন্যে একটা পার্টি দেবে।'

'বুঝলাম না,' মুসা বলল। 'সবাইকে দাওয়াত করতে গেল কেন?'

'ওসব এক ধরনের চালিয়াতি। হয়ত ভেবেছে, এরকম ধুমাধাম করলে বেটি তাকে বিশ্বাস করবে। কোন সন্দেহ থাকবে না। সবাইকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করলে তাড়াতাড়ি সহজ হয়ে আসবে বেটি।'

কিশোর আর মুসার মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, মিস লেসিঙের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই ওকাজ করেছে লোকটা। একা নিয়ে যেতে চাইলে নতুন পরিচিত একজনের সঙ্গে যেতে যদি রাজি না হয় বেটি, সে জন্যেই সবাইকে নিয়ে গেছে। পঞ্চাশ জনের কম ছিল না।...ইয়ে, সত্যিই হারিয়ে গেছে বেটি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

চিন্তিত দেখাল মেয়েটাকে। 'বিউটি পারলারে, যেখানে সে কাজ করে, টেলিফোন করেছিলাম। ওরা জানাল, আজ নাকি যায়নি। আর বেশ গরম গরম কথাই শুনিয়ে দিল। ওর বাবা-মা কোথায় এখন?'

'তাঁরা ফ্রেনসোতে ফিরে গিয়েছিলেন,' কিশোর বলল। 'আবার হয়ত রওনা হয়ে পড়েছেন এখানে আসার জন্যে। বাড়িতে ফোন করেছিলাম। পাইনি।'

'লোকটার নাম রোজার নয় কেন মনে হলো তোমার?' ভিড়ের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করল একটা ছেলে।

'কারণ আজ সকালে আসল ইয়ান রোজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।'

'রোজার? লোকটা তার নাম রোজার বলেছে? কিন্তু তার দোস্ত তো অন্য নামে ডাকছিল। অদ্ভুত একটা নাম!'

'ডেগি,' বলল আরেকটা মেয়ে। 'হ্যাঁ, ডেগি বলেই ডাকছিল।'

'ডেগি?' কাউন্টারের ওপাশ থেকে বলে উঠলেন ম্যানেজার।

সবাই ফিরে তাকাল তাঁর দিকে।

'ডেগি!' গম্ভীর হয়ে গেছেন মিস্টার জেনসেন। 'এটা কি রকম নাম হলো?' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ওরকম নামের একটা লোক ভাল হতেই পারে না। খারাপ লোক। খুব খারাপ। এত সুন্দর মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল! কোন্ দুনিয়ায় বাস করছি আমরা!'

তাঁর সঙ্গে একমত হলো অনেকেই।

কিশোর আর মুসা অপেক্ষা করতে লাগল। ভুয়া চিত্র প্রযোজকের সম্পর্কে আর কেউ কিছু মনে করতে পারে কিনা সে সুযোগ দিল।

কেউই কিছু বলতে পারল না আর।

বার

রাতেই রকি বীচে পৌছলেন ডিকসনরা। ইয়ার্ডে এলেন সকাল আটটায়। বিধ্বস্ত চেহারা। চোখ লাল। চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করেই এসেছেন।

তাঁদের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন মেরিচাচী। আদর করে বসিয়ে নাস্তা-টাস্তা এনে দিলেন। তবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন না। মেয়েকে ফিরে না পেলে অহেতুক সান্ত্বনা দিয়ে মা-বাবার মন শান্ত করা যাবে না।

'কেউ কিছুই দেখেনি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না,' ডিকসন বললেন। 'পড়শীদের সঙ্গে কথা বলেছেন চীফ। ওই লোকদুটোর সঙ্গে ডলিকে বেরোতে দেখেনি কেউ। রোজার যে গাড়িটা নিয়ে এসেছিল সেটা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে জনৈক ডক সাইমারের নামে। সাইমার আবার বিক্রি করে দিয়েছে পিটারের কাছে। পিটার আর নিজের নামে রেজিস্ট্রি করায়নি। কাজেই লাইসেন্স নম্বরে সুবিধে হয়নি। গাড়িটা ধূসর রঙের, এটুকুই জানি আমরা। ডলি যেখানে চাকরি করত সেখানেও খোঁজ নিয়েছি। যে বুড়িটা জবাব দিল, সে ভাল করে কথাও বলতে চায়নি।'

শেষ দিকের কথাগুলো তিক্ত শোনাল তাঁর।

'মিস্টার ডিকসন,' মেরিচাচী বললেন। 'আপনারা দু'জনেই ক্লান্ত। কয়েকদিন এখানেই থেকে যান না? আমাদের ঘর আছে। থাকতে অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডিকসন। 'রকি বীচ ইনে ঘর ভাড়া করেছি আমরা। ওখানেই থাকতে পারব। চীফের ফোনের অপেক্ষা করব। বাড়িতে একজনকে রেখে এসেছি ফোন ধরার জন্যে। কিছু জানলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবে। কিডন্যাপাররা যদি ফোন করে, খবর দেবে। হয়ত

মেয়েকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে কিছু টাকাটুকা চাইবে।'

ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস।

'তুমি আর তোমার বন্ধুরা অনেক করেছ আমাদের জন্যে,' কিশোরকে বললেন ডিকসন। 'থ্যাঙ্কস।'

স্ত্রীর হাত ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ওয়ার্কশপে চলে এল কিশোর। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। মুসা আর রবিন এসে বসে আছে।

ফাইলিং কেবিনেটে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসেছে মুসা। চোখে ঘুম। 'ডিকসনদের গাড়িটা দেখলাম অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রবিনকে ফোন করলাম সে জন্যেই। আর কিছু ঘটেছে?'

'না,' নিজের ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসল কিশোর। 'রকি বীচ ইনে উঠেছেন ডিকসনরা। ডলির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত যাবেন না।'

'খোঁজটা পেয়ে গেলেই ভাল,' রবিন বলল। নোটবুক বের করল। দেখে নিয়ে বলল, 'এ যাবৎ যা যা করেছি আমরা, কোনটাতেই ফল হয়নি। যেখানে শুরু সেখানেই শেষ, এই হয়ে যাচ্ছে অবস্থা।'

'অনেক কিছুই মিলছে না,' কিশোর বলল। 'ওই লোকদুটো ডলিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক। কিন্তু সব কিছুর জন্যেই একটা মোটিভ লাগে। কেন নিল? উদ্দেশ্যটা কি? কিডন্যাপিং হলে মুক্তিপণ চাইছে না কেন? আর যদি নিয়েই থাকে নেয়ার অনেক সুযোগ পেয়েছে আগেই। কেন একটা পার্টি দিয়ে, লোক জানাজানি করে এরকম একটা কাজ করতে গেল?'

দু'হাতের আঙুলের মাথা এক করে ছোট একটা খাঁচার মত তৈরি করল সে। 'তারপর রয়েছে সেই রহস্যময় চোরটা। যে লেসিং হাউসে ঢুকেছিল, ডলির সঙ্গে রোজার আর রিভস দেখা করার আগেই। ওই দু'জনেরই একজন চোরটা ছিল কিনা কে জানে। তাহলে প্রশ্নঃ কেন ঢুকেছিল? ডলির জন্যে? নাকি লেসিং হাউস থেকে কিছু চুরি করতে?'

'কাকতালীয় না তো?' রবিন বলল। 'সেই বন্ধকী দোকানের মায়ানেকড়েটার মত?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'সারা দিন ধরে চিবালেও এই রহস্যের মধ্যে ছিবড়ে ছাড়া আর কিছু মিলবে না।'

প্ল্যাস্টিকের সেই ব্যাগ, যেটা সৈকতে কুড়িয়ে পেয়েছিল ওরা, এখনও অফিসেই রয়েছে। চেশায়ার স্কোয়ারে ডলির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ওটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। ফাইলিং কেবিনেটের ওপর থেকে নামিয়ে এনে ভেতরের জিনিসগুলো টেবিলে ঢেলে দিল রবিন। মেকাপের সরঞ্জাম, লাইব্রেরির বই আর খেলনা ভালুকটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল, যেন ওগুলো কোন সূত্র বলে দেবে। কিংবা বলবে ডলি এখন কোথায় আছে। কালো নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে ভালুকটা তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

বইটা তুলে নিয়ে আনমনে পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। কিছু কিছু পৃষ্ঠায়

লেখার নিচে দাগ দেয়া রয়েছে। বিড়বিড় করে ইংরেজিতে যা পড়ল সে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে 'সাফল্য', 'ভালবাসা', 'ধনী' এই শব্দগুলো ঘন ঘন আওড়াবে। সূর্য যেমন উঠবেই, তেমনি নিশ্চিত করে জেনে রাখো, সাফল্য, ভালবাসা আর অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যাবে তুমি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা।

ভালুকটাকে চোখের সামনে নিয়ে এল মুসা। বলল, 'তুমিও এই বইয়ের কথা মেনে চলতে পার। ভাবতে থাকো, কাল থেকে গভীর বনের বাতাসে শ্বাস নেবে বুক ভরে। কে জানে, কাল সকালেই হয়ত খেলনা ভালুক থেকে জ্যান্ত ভালুকে পরিণত হবে তুমি।'

আরেকবার হেসে উঠল ওরা।

বাড়ি রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।

কিশোর বসেই রইল। বসে বসে ভাবতে লাগল। তাকিয়ে রয়েছে ভালুকটার দিকে। তার মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা সূত্র অবশ্যই রয়েছে, যেটা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে ওদের। ওটা পেয়ে গেলেই ডলিকে বের করার ব্যবস্থা করতে পারবে।

ব্যাগের ভেতরে আবার জিনিসগুলো ভরতে আরম্ভ করল সে।

হঠাৎ ট্রেলারের বাইরে কি যেন নড়ে উঠল।

থমকে গেল সে। কান পাতল। কি নড়ছে? জঞ্জালের ভেতর কোন ছোট জানোয়ার ঢুকল?

আবার শোনা গেল শব্দটা। এতই মৃদু, বাতাসের ফিসফিসানি বলেই মনে হয়। কিংবা কেউ বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলল জোরে। ঘাপটি মেরে রয়েছে কিশোরের বেরোনোর অপেক্ষায়।

নাহ্, দেখতে হচ্ছে।

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল সে। ধাক্কা লেগে চেয়ারটা যাতে সরে গিয়ে শব্দ না হয়ে যায়, খেয়াল রাখল। ঘুরে চলে এল ডেস্কের আরেক পাশে। আবার কান পাতল।

নীরব হয়ে আছে। আর হচ্ছে না শব্দটা।

কোন জানোয়ারই হবে। ইঁদুর, বেড়াল, কিংবা ছুঁচো। কাঠবেরালিও হতে পারে। মাঝে মাঝেই ওগুলোকে ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেছে সে।

হেডকোয়ার্টার থেকে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরোনোর পথটা হল 'সহজ তিন'। সেই পথ ধরে চত্বরে বেরোল সে। ছোট জানোয়ার কিংবা রহস্যময় অনুপ্রবেশকারীকে দেখার আশায় তাকাল এদিক ওদিক। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। প্রথমেই তাকাল টেবিলের দিকে, যেখানে ব্যাগটা রেখে গিয়েছে।

ওটা আছে জায়গামতই। কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ডেস্কের ওপর। টেলিফোনের কাছে খুলে রয়েছে একটা নোটপ্যাড। তারমানে সে যখন বাইরে বেরিয়েছিল, চুপ করে এখানে ঢুকে পড়েছিল কেউ। নোটপ্যাডটা খুলে দেখেছে

ওটাতে কি লেখা রয়েছে। শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতর।

তেমন জরুরী কিছু লেখা নেই। তবে কেউ একজন ঢুকেছিল এটা স্পষ্ট। হঠাৎ করেই টের পেয়ে গেল, যে ঢুকেছে, সে এখনও ভেতরেই রয়েছে।

স্থির হয়ে গেল কিশোর। বুঝতে পারছে, পেছনেই রয়েছে অনুপ্রবেশকারী। ছোট ডার্করুমটার দিকে পেছন করে আছে সে। দরজায় পর্দা ঝুলছে। তার ওপাশেই রয়েছে কেউ··· অপেক্ষা করছে···নিঃশ্বাস ফেলছে···

'নিঃশ্বাসটা এতই ধীর, প্রথমে বুঝতেই পারেনি কিছু সে। আস্তে আস্তে জোরাল হয়েছে। শব্দটা অদ্ভুত। খসখসে। হালকা ভাবে কোন জিনিস সিরিশ কাগজে ঘষা হচ্ছে যেন।

খলখল করে একটা শয়তানী হাসি যেন ফেটে পড়ল ঘরের ভেতরে।

লাফ দিয়ে পর্দার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল।

টান দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পর্দা।

ভয়ঙ্কর একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল তার। আঁশে ঢাকা শরীর। চোখা দাঁত। চেহারার কোন আকৃতি নেই। গলে গলে পড়ছে মাংস। যেন হরর ছবি থেকে উঠে আসা জীবন্ত এক আতঙ্ক।

আবার হেসে উঠল ওটা। ঈগলের মত বাঁকা আঙুলওয়ালা একটা থাবা বাড়িয়ে দিল কিশোরকে ধরার জন্যে।

সরার চেষ্টা করতে গিয়ে ডেস্কের সঙ্গে বাড়ি খেল সে। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল।

হাসতে হাসতেই আঘাত হানল বীভৎস প্রাণীটা।

আঘাতটা লাগল কিশোরের গায়ে। মনে হল, ধাতব ফাইলিং কেবিনেটটা ছুটে আসছে তার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে।

কপাল ঠুকে গেল ওটাতে। এরপর সব অন্ধকার।

তেরো

'ব্যাগটার জন্যেই এসেছিল,' কিশোর বলল। 'হুঁশ ফিরতে দেখি ওটা নেই। চাচীকে যেদিন আলমারির ভেতরে আটক করেছিল, সেদিনও ওটা খুঁজতেই এসেছিল, ব্যাগটা নেই দেখে বুঝলাম। ওটার জন্যেই কিডন্যাপ করা হয়েছে ডলিকে। তারপর, আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ওটা পেয়ে নিয়ে চলে গেছে।'

হুঁশ ফিরে পেয়েই দুই সহকারীকে ফোন করেছে গোয়েন্দাপ্রধান। ছুটে চলে এসেছে ওরা। বসে আছে এখন কিশোরের মুখোমুখি।

চেহারা এখনও ফ্যাকাসে হয়ে আছে কিশোরের। ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। 'আর আমি গাধা,' আবার বলল সে। 'কাজটা সহজ করে দিলাম তার জন্যে। সহজ তিনের পথ খুলে দিয়ে। ঘরে ঢুকে লুকিয়ে ছিল ওটা।'

ভয়ানক কুৎসিত চেহারাটার কথা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিল তার।

মুসার মনে পড়ল বন্ধকী দোকানের সেই মায়ানেকড়ের চেহারার কথা। জিজ্ঞেস করল, 'একই চেহারার? ওই যে, সেদিন দেখেছিলাম, মায়ানেকড়ে?'

'না।' অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে কিশোর। 'তবে একই লোক হতে পারে।' মুখের রং ফিরতে শুরু করেছে তার। 'রোজার আর রিভস হরর ছবির ছাত্র। অন্তত ওদের কথাবার্তায় সে রকমই মনে হয়েছে। সুতরাং ছদ্মবেশে অপরাধ যদি করতেই আসে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তবে,' রবিন বলল। 'লেসিং হাউসে যে চোরটা ঢুকেছিল, সে আর দশটা চোরের মতই সাধারণ। মোজা মাথায় গলিয়ে চেহারা ঢেকে অনেক চোরই চুরি করতে আসে।'

'ওই চোরটাকে সাধারণ ভাবতে পারছি না ডলির জন্যে। তার সঙ্গে কোনভাবে যোগাযোগ থাকতে পারে। কাজেই চোরটাও একই লোক হতে পারে।'

'ঠিক!' একমত হল মুসা। 'কিন্তু দানবটা ব্যাগ নিল কেন? কি চায়? বন্ধকীর দোকানের রশিদগুলো?'

'যেগুলো বইয়ের ভেতরে রেখে দিয়েছিল ডলি?' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। যেসব জিনিস বন্ধক রেখেছে, একেবারেই সাধারণ। দাম আর কত। একটা আংটি, একটা মেডেল, আর একটা সোনার পিন। ওগুলো রেখে মাত্র কয়েকটা ডলার পেয়েছে ডলি। নাহ্, ওই রশিদের পেছনে কেউ লাগেনি।'

'তাহলে কিসের জন্যে? বইটার জন্যে? উফ, মাথাই ধরে যাচ্ছে আমার।'

'ওই বই যে কোন লাইব্রেরিতে গেলেই মেলে,' রবিন বলল। 'তবে বিশেষ ওই বইটাতে যদি কিছু লেখা থাকে তাহলে আলাদা কথা। নোটফোট লিখে থাকতে পারে ডলি। কিন্তু কিসের নোট? বয়েস কম। কোন অপরাধ করেছে বলে মনে হয় না। লুকানোর নিশ্চয় কিছু নেই। বাড়ি থেকে ওরকম অনেকেই পালায়। সে-ও পালিয়েছে। একটা উদ্দেশ্যও আছে তার। ছবিতে কাজ করতে চায়।'

'খেলনা ভালুক!' আচমকা বলে উঠল কিশোর।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা।

'ওটার আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ওটাই চায় তথাকথিত দানবটা,' কিশোর বলল। 'সাধারণ খেলনা নয় ওটা। অন্যান্য টেডি বিয়ারগুলো বানানো হয় তুলো দিয়ে, কিন্তু ওটা আসল রোম।'

'তাতেই বা কি? যদি সবচেয়ে দামি মিংক দিয়েও বানানো হত, তাতেই বা কি হত? এমন কিছু দাম হত না যার জন্যে এতসব ঝামেলা করতে চাইবে কেউ।'

'হয়ত ভালুকটার ভেতর কিছু আছে!'

'এইবার বলেছ একটা কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তাই হবে। রত্ন! অলঙ্কার! ড্রাগ! যেকোন জিনিস হতে পারে। রোজার আর রিভস জানে, একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে সাংঘাতিক দামি কিছু লুকানো রয়েছে। সেটা খুঁজতে লেসিং হাউসেও গিয়েছিল, ডলির জন্যে পারেনি। সে দেখে ফেলে পুলিশে খবর দিয়েছিল। তারপর অন্যভাবে ঢুকেছে ওই বাড়িতে। খুঁজেছে, পায়নি। তখন ধরে নিয়ে গেছে-ওকে জিজ্ঞেস করার জন্যে। ও বলেছে ওটা আমাদের কাছে থাকতে

পারে। তখন এসেছে ইয়ার্ডে। আমাদের অনুসরণ করেই এখানকার ঠিকানা বের করেছে ওরা।'

'ওদিকে ডলিকে আটকে রেখেছে,' যোগ করল মুসা। 'যাতে সে পুলিসকে বলে দিতে না পারে।'

'চমৎকার থিওরি,' কিশোর বলল। 'সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। এখন বাথরুমের তোয়ালেতে রক্তের কথাটায় আসা যাক।'

'হ্যাঁ। ওটাও সহজ। জোরাজুরি করতে গিয়ে কেউ জখম হয়েছিল। কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মুছেছে তখন।'

টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। রিসিভার তুলে নিল। চকচক করছে চোখ। 'আমাদের এখন জানতে হবে খেলনাটা ডলির হাতে এল কিভাবে? এটা জানা জরুরী। হয়ত এর সাহায্যেই ওই রহস্যময় দানবকে ধরতে পারব আমরা।'

দ্রুত ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাল কিশোর। 'এই যে, পেয়েছি। রকি বীচ ইন।'

ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই মিস্টার ডিকসনকে চাইল সে। তিনি ধরতে বললেন, 'কিশোর পাশা বলছি। একটা সূত্র বোধহয় পেয়েছি, যেটা কাজে লাগতে পারে। ডলির ব্যাগের খেলনা ভালুকটার কথা মনে আছে? ফ্রেনসো থেকে আসার সময় কি ওটা সঙ্গে নিয়েছিল? ভালুকটা আসল রোম দিয়ে তৈরি।'

'কি ভালুক?'

'টেডি বিয়ার।'

'এক মিনিট। নরিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

ওপাশে আলোচনা চলছে, কথাগুলো বুঝতে পারল না কিশোর। একটু পরেই লাইনে ফিরে এলেন ডিকসন। 'না, সে-ও বলতে পারছে না। যতদূর জানি, কাপড় আর মেকআপের জিনিসগুলো ব্যাগে ভরেই বাড়ি ছেড়েছে ও। কেন?'

'আমরাও শিওর নই, মিস্টার ডিকসন। তবে ভালুকের ব্যাপারে জানাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। যাই হোক, নতুন কিছু জানতে পারলে জানাব।'

লাইন কেটে দিল কিশোর। সহকারীদেরকে বলল, 'ভালুকটা এখান থেকেই জোগাড় করেছে ও। কোত্থেকে, সেটা বের করব কিভাবে?'

'পিজা শ্যাক!' রবিন বলল। 'ওখানকার ওরা কিছু জানতে পারে।'

'ঠিক বলেছ। ওখান থেকেই শুরু করতে পারি।'

কয়েক মিনিট পরেই কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। পিজা শ্যাকে ঢুকে কয়েকজন পরিচিতকে দেখল। ওরা হাত নাড়ল। কাউন্টারের ওপাশের মহিলা হাসল।

'ওরা এলে খুব একটা খায়টায় না,' হেসে মিস্টার জেনসেনকে বলল মহিলা। 'তবে ভাল ছেলে। ভদ্র।'

মন্তব্য করলেন না ম্যানেজার। নজর রাখলেন তিন গোয়েন্দার দিকে। ওরা ছেলেমেয়েদেরকে খেলনা ভালুকটার কথা জিজ্ঞেস করছে যে, সেটাও শুনলেন।

'টেডি বিয়ার?' একটা ছেলে বলল, 'কি বল! অতবড় একটা মেয়ে ব্যাগের

ভেতর খেলনা বয়ে বেড়াবে?'

'এতে অবাকের কি আছে?' গাঢ় লাল লিপস্টিক লাগানো একটা মেয়ে বলল। 'অনেকেই বয়েস হলেও বাচ্চাই থেকে যায়। অন্তত ছোটদের কিছু কিছু স্বভাব থেকে যায়। বেটিটা একটু পাগলাটে ধরনেরই। ওর পক্ষে সব সম্ভব। আমি দেখেছি ব্যাগে। জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় পেয়েছে। বলেনি।'

'অনেক দিন ধরে ছিল তার কাছে?' জানতে চাইল কিশোর।

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'দু'এক দিন হবে।'

আর কেউ কিছু বলতে পারল না। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পিজা শপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'এবার?' বেরিয়েই প্রশ্ন করল মুসা, 'আর কাকে জিজ্ঞেস করব?'

'খেলনার দোকানে যাওয়াই তো উচিত,' জবাব দিল কিশোর।

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'জানো, কটা দোকান আছে?'

'জানি। গোয়েন্দাদের কাজটাই কঠিন।'

'পিজা শপ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরেই পাওয়া গেল প্রথম খেলনার দোকানটা। ওখান থেকেই শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ওখানে ভালুকের সমাহার দেখে আরেকবার গোঙাল মুসা। 'খাইছে! কি করে জানব? এত ভালুক যারা বিক্রি করে তাদের কি আর মনে থাকবে?'

'দেখাই যাক না,' কিশোর বলল। 'তবে এখানে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না। একটাও রোমশ ভালুক নেই। রোম দিয়ে তৈরি নয়, সব তুলো।'

'তবু, এসেছি যখন জিজ্ঞেস করেই যাই,' রবিন বলল।

দোকানের মালিক এক মহিলা। একটা খেলনা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছে ওরা শুনে একটু অবাকই হল। কিশোর বলল, 'আসল রোম। মিংক হতে পারে।'

'এতটাই দামি?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না। গাঢ় রঙের রোম। আমাদের এক বন্ধুর কাছে দেখেছি। এখান থেকেই কিনে নিল কিনা জানতে এসেছিলাম।'

'না। এখানে ওরকম জিনিস পাবে না। সান্তা মনিকায় চলে যাও। বন্দরের ধারে কয়েকটা বড় বড় দোকান আছে। দামি খেলনা বিক্রি করে একমাত্র ওরাই। আর ওদের কাছে যদি না থাকে, বলে দিতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে।'

সাইকেল রেখে বাসে করে সান্তা মনিকায় এল তিন গোয়েন্দা। বন্দরের কাছে প্রথম যে দোকানটা দেখল, ওটাতেই ঢুকল। পরে এক এক করে বাকিগুলোতে ঘুরবে। অনেক ধরনের খেলনা ভালুক দেখতে পেল ওখানে। মিংকের তৈরি টেডি বিয়ার অবশ্য পেল না।

অল্প বয়েসী একটা সুন্দরী মেয়ে কাউন্টারে রয়েছে। সে ওদেরকে বলল, বেভারলি হিলের খেলনার দোকানগুলোতে খোঁজ নিতে। ওখানে নাকি মিংকের তৈরি টেডি ভালুক বিক্রি হয়। কয়েকটা দোকানের নাম ঠিকানাও দিল।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার রাস্তায় বেরোল ছেলেরা। একটা অডি গাড়ি চলে গেল সামনে দিয়ে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বাসস্টপে চলে এল ওরা। ধপাস

করে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল মুসা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হবে না এভাবে। বুঝলে, হবে না। সারা জীবন ধরে খুঁজলেও পাব না।'

'হবে,' কিশোর অতটা নিরাশ হতে পারল না। 'তবে বাসে করে ঘুরে কূল করতে পারব না। একটা গাড়ি লাগবে।'

চোদ্দ

রোলস রয়েস নিয়ে হাজির হয়ে গেল হ্যানসন। তিন গোয়েন্দাকে বেভারলি হিলে নিয়ে গেল। পার্ক করল বেভারলি ড্রাইভের একটা লোডিং জোনে।

'আমি এখানেই থাকি,' বলল সে। 'দরকার হলে ডাকবে। বাড়িটা ঘুরেই গাড়ি বের করে নিয়ে যেতে পারব।'

দু'জন মহিলা হেঁটে চলল। একজনের হাতে একটা গাইডবুক। অন্যজনকে বলল, 'এই, শোন, এখানকার সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত অঞ্চল বেভারলি হিল। অনেক দামি দামি ফিল্ম স্টারের বাড়ি এখানে। দোকানপাটগুলো...' সাড়া না পেয়ে পেছনে তাকিয়ে মাঝ পথে কথা থামিয়ে দিল সে।

'ইরিনা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'গাড়িটা কি দেখেছ! তোলো তোলো, ছবি তোলো।'

দেখেও না দেখার ভান করল হ্যানসন। হেঁটে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ঝট করে ক্যামেরা তুলে রোলস রয়েসটার একটা ছবি তুলে ফেলল ইরিনা।

যেখানে গাড়িটা পার্ক করা হয়েছে তার কাছেই পাওয়া গেল দুটো খেলনার দোকান। প্রথমটাতে খুঁজে কিছু পেল না গোয়েন্দারা। পরেরটাতে চামড়ার প্যান্ট পরা একজন লম্বা লোক জানাল একটা মিংকের তৈরি টেডি বিয়ার দেখেছে।

'বিক্রির জন্যে ছিল না অবশ্য ওটা,' লোকটা বলল। 'আমাদের একজন কাস্টোমার বোনাস হিসেবে পেয়েছে ওটা। উইলশায়ারের কোণের একটা দোকান থেকে একটা ফারের জ্যাকেট কিনেছিল। জ্যাকেটটা তার বাড়িতে ডেলিভারি দেয়ার সময় ভালুকটা চলে গেছে ওটার সঙ্গে। দোকানের তরফ থেকে উপহার।'

'ও,' কিশোর বলল।

'ওখান থেকে ইচ্ছে করলে ওরকম ভালুক কিনতে পারো। যদি আরও থাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের কাছেও আছে। দরকার হলে চলে এসো। এই ধরো না মাউজ হাউসের কথাই। অনেক আছে আমাদের।'

'কেন?' মুসা জানতে চাইল, 'ইঁদুর পোষার জন্যে?'

'খেলনা ইঁদুর। বেভারলি হিলে জ্যান্ত ইঁদুর রাখা নিষিদ্ধ।'

নাক মুখ কুঁচকে এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন বোঝাতে চাইল, সবখানেই পাগল থাকে। নইলে খেলনা ইঁদুরের আবার বাড়ি কেন?

গাড়িতে ফিরে এল ওরা। একজন পথচারীকে বোঝাচ্ছে হ্যানসন, গাড়িটা ছবিতে ব্যবহারের জন্যে তৈরি হয়নি। বিশ্বাস করাতে পারছে না লোকটাকে। তিন

গোয়েন্দাকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাড়াতাড়ি ওদেরকে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। উইলশায়ারের দিকে যেতে যেতে বলল, বেভারলি ড্রাইভ আস্তে আস্তে পর্যটন কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে। ট্যুরিস্টদের উৎপাত বাড়ছে।

'কয়েকবার করে আমাকে সহ গাড়িটার ছবি তুলে নিয়ে গেছে কয়েকজনে,' জানাল সে। 'লোকের ধারণা, আমি ফিল্ম স্টার।'

'লোকের দোষ নেই,' রবিন বলল। 'গাড়িটা যেমন চোখে পড়ার মত, আপনার ইউনিফর্ম তেমনি। এমনকি বেভারলি হিলের জন্যেও অস্বাভাবিক।'

'অস্বীকার করছি না,' হেসে বলল হ্যানসন।

উইলশায়ারের কোণের দোকানটার নাম উচ্চারণ করাই কঠিনঃ ভ্রনস্কি ফ্রেরিজ। সাদাটে ধূসর দেয়াল, ধূসর কার্পেটে গোড়ালি দেবে যায়। ছেলেরা ঢুকে দেখল, গলায় দরজির ফিতে ঝোলানো একজন লোক যুবক বয়েসী একজনকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিছুতেই বুঝতে চাইছে না যুবক। মুখ গোমড়া করে একনাগাড়ে অভিযোগ করে চলেছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভাল না হলে সে কিভাবে কাজ করবে?

'টেডি বিয়ার?' কিশোরের প্রশ্ন শুনে লোকটা বলল। 'কিছু ভালুক ছিল আমার কাছে। তবে এখন একটাও নেই। সব নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে?'

'চুরি। ও জানো না? জানবেই বা কি করে। পত্রিকায় ছাপা হয়নি। চুরিদারি আজকাল আর কোন ব্যাপারই না।'

উত্তেজিত হলো কিশোর। 'চুরি? কবে?'

'প্রথমে কিছু ফার চুরি করেছে। হপ্তাখানেক আগে। তারপর চারদিন আগে কিছু রেকর্ড চুরি করে নিয়ে গেছে। কেন? তোমার এসব জানার আগ্রহ কেন? খেলনা ভালুক চাও তো? খেলনার দোকানে চলে গেলেই পারো।'

'কিন্তু আমার বন্ধুরটা ছিল ফারের ভালুক। আসল রোমের তৈরি, বুঝতেই পারছেন। আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। কে জানি আমাদের বাড়িতে ঢুকে নিয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ঠিক আমার দোকানে যা ঘটেছে। পয়লা বার যখন চুরি করল, ফারের সঙ্গে খেলনাগুলোও নিয়ে গেল। তারপর এল আমার ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলে গেল। কিছু কাগজ এখনও পাচ্ছি না। ফারগুলো ভাগ্যিস বীমা করানো ছিল। ওগুলো নিয়েছে, নাহয় বুঝলাম দামি জিনিস বলে। কাগজপত্র ঘাঁটল কেন? সব শয়তানী। আসলে কাজের লোকের ওপর বোধহয় রাগ আছে। ফলে যারা কাজ করে খেতে চায় তাদের সঙ্গে নষ্টামি শুরু করেছে।'

এটা যুক্তির কথা নয়। তবু কিশোর বলল, 'হবে হয়ত।'

সকেট থেকে প্লাগ খুলে যন্ত্রটা নিয়ে পেছনের ঘরে চলে গেল যুবক।

'ওই যে দেখ না,' যুবকের কথা বলল লোকটা। 'এর কথাই ধরো। সে সৎও হতে পারে আবার অসৎও হতে পারে, কি করে বুঝবে? কেবল অনুমান করতে

পার। আর কিছু করার নেই। এ তো কাজটা অন্তত ঠিকভাবে করে, আগেরটা তা-ও করত না। ওকে কাজ করতে বলতাম, চুপ করে থাকত। যা-ই বলতাম, কিছুই বলত না। এর চেয়ে কবর থেকে একটা লাশকে তুলে নিয়ে এসে যদি বকাঝকা করতাম, কাজ হত। তবে সিনেমার ব্যাপারে বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। আমি সিনেমা দিয়ে কি করব, বল?'

উত্তেজনা বাড়ল কিশোরের। এমনকি পেছনে মুসাও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন, যাতে দোকানদারের একটা কথাও কান না এড়ায়।

'সিনেমায় কাজ করত?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'হরর ছবির ব্যাপারে কিছু জানত কি?'

'তুমি কি করে বুঝলে? জানত! অবশ্যই জানত! ড্রাকুলা! মায়ানেকড়ে! কবর থেকে উঠে আসা নানারকম পিশাচ, যারা মানুষের কলজে খায়! বিচ্ছিরি সব ভাবনাচিন্তা!'

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেলল লোকটা। সন্দেহ দেখা দিল চোখে। 'লোকটাকে চেন নাকি? তোমরা কারা? কি চাও?'

'আমরা···আমরা আমাদের বন্ধুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি,' সাবধানে বলল কিশোর। 'ভালুকটা তারই ছিল। হারিয়ে গেছে সে। তাকে উদ্ধার করা খুব জরুরী।' অনুরোধ করল সে। 'প্লীজ! একটা উপকার করুন। লোকটাকে কিভাবে জোগাড় করেছেন, বলবেন? কোন এজেন্সির মাধ্যমে?'

ভ্রূকুটি করল লোকটা। 'এমনি এসে হাজির হলো একদিন। একটা চাকরি চাইল। খুব নাকি দরকার। যেকোন কাজ করতে রাজি।'

'চুরির আগে এসেছিল, না পরে? গেছে কবে? কতদিন কাজ করেছে?'

'দু'দিনও করেনি। কোনমতে তাকে দিয়ে কাজ করাতে না পেরে শেষে বিদেয় করে দিয়েছে। হপ্তা দুই আগের কথা সেটা। ওসব শুনে তোমার লাভ হবে না।'

'লোকটার ঠিকানা জানেন?' চাপাচাপি শুরু করল কিশোর। 'কোথায় থাকে? কি নাম বলেছে? মিসেস লেসিংকে চেনেন? চেশায়ার স্কোয়্যারে থাকেন? তিনি আপনার কাস্টোমার?'

'বাহ্! এবার আমার কাস্টোমারদের কথাও জানতে চায়?' আরও সন্দিহান হয়ে উঠল লোকটা। 'মতলবটা কি তোমার? যাবে, না পুলিশ ডাকব?'

'প্লীজ, আপনি বুঝতে পারছেন না! ব্যাপারটা জানা খুবই জরুরী।' গড়গড় করে ডলির গল্প বলতে আরম্ভ করল কিশোর। কি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল, কি করে ওরা খুঁজে বের করেছিল, কি করে লেসিং হাউসে চাকরি নিয়েছে, বলল। ওর ব্যাগের খেলনা ভালুকটার কথাও বলল। বলল তার উদ্বিগ্ন মা-বাবার কথা। শেষে বলল, 'মনে হয়, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আর এর সঙ্গে ভালুকটার যোগাযোগ থাকতে পারে।

পুরো গল্পটা শোনার পরেও সন্দেহ গেল না লোকটার। বলল, একজন মিস লেসিংকে চেনে। যে লোকটা দু'দিন থেকে চলে গেছে তার নাম-ঠিকানা জানার জন্যে চাপাচাপি করতে লাগল কিশোর। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করতে না পেরে

রেগেমেগে শেষে গিয়ে পেছনের ঘর থেকে কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে এল লোকটা।

একটা অফিশিয়াল ফর্ম রয়েছে ফাইলে, যেটা সরকারের কাছে জমা দেয় কর্মচারীরা। নাম আছে, সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে। জ্যাক ব্রাউন নামে ফর্ম পূরণ করেছে। আরেকটা কাগজ দেখাল দোকানদার, ওটাতে নিজের হাতে নাম-ঠিকানা লিখেছে ব্রাউন।

'টাকা নিয়ে যায়নি,' লোকটা বলল। 'যে দু'দিন কাজ করেছে, তার চেক ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ফেরত এসেছে?'

'না।'

'এই ব্রাউন লোকটা দেখতে কেমন? রোগাপাতলা, কান ঢেকে ফেলা লম্বা চুল। তাই না?'

'না। বেঁটে। পেটমোটা, হোঁৎকাই বলা চলে। ছোট করে ছাঁটা কালো চুল। কোঁকড়া। দেখ, আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না...'

'আর একটা কথা,' হাত তুলল কিশোর। 'টেডি বিয়ারটা কোথায় পেয়েছিলেন? আপনি তৈরি করেননি, তাই না?'

'না। একজন ডিলারের কাছ থেকে কিনেছি। এইচ. কে. ইমপোর্টারস।'

'সেটা মিসেস লেসিংকে দিয়েছিলেন?'

আর সহ্য করল না দোকানদার। 'বেরোও!'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বেরোনোর আগে লক্ষ্য করল, রিসিভার তুলে ডায়াল করছে লোকটা।

'পুলিশকে ফোন করছে,' অনুমান করল মুসা।

শুনলই না যেন কিশোর। মোড়ের কাছে পৌঁছল। মেরুন রঙের একটা অডি গাড়িকে দেখল সরে যাচ্ছে। রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাশে এল ওরা। রোলস রয়েস নিয়ে যেখানে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।

কিশোর বলল, 'ফারের একটা পোশাক কিনেছিলেন মিস লেসিং। সেই সাথে গিয়েছিল মিংকের ভালুকটা। তিনি ইউরোপে চলে গেলে ভালুকটা পেয়েছিল ডলি। কিংবা হয়ত চেয়েছিল, দিয়ে দিয়েছেন মিস লেসিং। বিনে পয়সায় পেয়েছেন তিনি ওটা। খেলনা দিয়ে কি করবেন? মেয়েটা যখন চেয়েছে, দিয়েই দিই, এরকম ভেবেই হয়ত দিয়েছেন। এইবার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে দোকানদারের অলস কর্মচারীকে।'

'ঠিকানাটা মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন। যদিও জানে কিশোর পাশা একবার কোন জিনিস পড়লে সহজে ভোলে না।

'আছে। সান্তা মনিকার একটা গলিতে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার রয়েছে। তার মানে কোন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে তার বাসা।'

'নামটাও বানিয়ে লিখতে পারে,' আশাবাদী হতে পারছে না মুসা, 'ঠিকানাটাও। অহেতুক গিয়ে ঘুরে আসব তাহলে।'

হাসল কিশোর। 'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। বেতনের চেক পাঠিয়েছিল দোকানদার। সেটা ফেরত আসেনি। তারমানে সান্তা মনিকার ওই ঠিকানায় কেউ আছে যে ওটা গ্রহণ করেছে।' হাত নেড়ে বলল, 'এখন আমাদের কাজ, চেকটা যে নিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করা। হয়ত এর ওপর নির্ভর করছে ডলির বাঁচামরা!'

পনেরো

বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। সাগরের তীর থেকে দশ ব্লক দূরে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির নিচতলায় জ্যাক ব্রাউনের ঘর।

দ্বিধা করল মুসা। 'কি করব?'

'বেল বাজাব,' কিশোর বলল।

কিন্তু কলিং বেলের জবাব দিল না কেউ।

মিনিট দুই অপেক্ষা করে জানালার কাচে নাক চেপে ধরল রবিন। বই আর কাগজপত্রে ঠাসা, গাদাগাদি করে রয়েছে মেঝেতে, পুরানো আসবাবপত্রের ওপরে। ছবির ফিল্ম রাখার কয়েকটা ক্যান পড়ে রয়েছে একধারে। বুককেসের ওপর একটা মানুষের খুলি। খুলির ওপরের দেয়ালে একটা পোস্টার। কালচে রঙের একটা কিম্ভূত জীবের ছবি, মুখটা সবুজ। কবর থেকে বেরিয়ে আসছে।

'থার্ড অ্যানুয়াল কনভেনশন!' বিড়বিড় করে পড়ল রবিন, পোস্টারের ওপরের লেখাটা। 'হরর ফ্যান ক্লাব অভ নর্থ আমেরিকা। আগস্ট ফোরটিন অ্যাণ্ড ফিফটিন, সান্তা মনিকা সিভিক অডিটরিয়াম!'

ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক জায়গায় এসেছি আমরা!'

'অ্যাই, কি করছ?' সামনের বাগানের কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল ছেলেরা। লাল চুল এক মহিলা। 'মিস্টার রিভসকে খুঁজছ, না?' লোকটার ম্যানেজার হবে মনে হয় মহিলা।

'তাঁর বন্ধু জ্যাক ব্রাউনকে হলেও চলবে,' কিশোর বলল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'ব্রাউন? চিনি না। তবে ওই নামটা নিজের লেটার বক্সে কদিন ধরে লাগিয়ে রেখেছেন মিস্টার রিভস। এখন তো বাড়ি নেই। ছুটিতে বেড়াতে গেছেন। কিছু বলতে হবে?'

'না। থ্যাঙ্ক ইউ।' পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। 'ব্রাউনের ব্যাপারে কিছুই জানেন না?'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'না। কখনও দেখিনি। হতে পারে, কিছু দিন ছিল মিস্টার রিভসের সঙ্গে। ওই মিস্টার কেইনের মত।'

'মিস্টার কেইন?' উত্তেজনায় কাঁপতে আরম্ভ করেছে কিশোর। 'লম্বা চুলওয়ালা সেই মানুষটা? চুলে কান ঢেকে যায় যে?'

'হ্যাঁ। ডেগি কেইন।'

'ডেগি!'

'হ্যাঁ। আমার কাজ আছে। মিস্টার রিভসকে কিছু বলতে হবে?'

খসখস করে নোটবুকে ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'আমার কাছে কিছু পুরানো সিনেমার পোস্টার আছে। কিনতে চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন মিস্টার রিভসকে। তাঁর অফিসের নম্বর আছে?'

'না, নেই, এখন কোথাও কাজ করেন না। কয়েক হপ্তা আগে একটা স্টুডিওতে করতেন,' চোখে কৌতূহল নিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। 'তাহলে তুমিও ওদেরই একজন?'

'মানে?'

'উদ্ভট জিনিস সংগ্রহ কর? মিস্টার রিভসের মত। কি যে আজেবাজে জিনিস যোগাড় করে! ওসব কিনে পয়সা খরচ করে ফেলে। অনেক সময় না খেয়েও থাকে। তোমার বয়েস কম। ওসবে জড়িয়ে অহেতুক জীবনটা নষ্ট কোরো না।'

বাড়ির ভেতরে টেলিফোন বাজল। জবাব দিতে গেল মহিলা।

'রিভস তাহলে একজন সংগ্রাহক,' কিশোর বলল। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল। ডেগি কেইন ছিল কিছুদিন ওর সঙ্গে। আর কেইন যদি রোজারের ছদ্মনাম হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের।'

'পুলিসকে জানাব?' মুসার প্রশ্ন। 'নাকি বসে থাকব। রিভস ফিরতে পারে। সংগ্রাহকরা তাদের জিনিসের জন্যে ফিরে আসে, তাই না?'

'আসে।' ইউ অক্ষরের আকৃতিতে তৈরি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ঢোকার জায়গা খুঁজছে মনে হয়। এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার ফাঁকে সবে চোখ রাখতে যাবে, এই সময় একটা লোককে আসতে দেখল।

মুসা বলল, 'আরে! ওই তো, মিস্টার রিভস!'

কালো কোঁকড়া চুলওয়ালা একজন লোক, রোজারের সঙ্গে ছিল ডলির পার্টিতে। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই চিনল। থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপর এগিয়ে এল। 'বাহ, আবার দেখা হয়ে গেল। তা কি জন্যে এসেছ?'

'ডলি ডিকসনের জন্যে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কিংবা বলতে পারেন বেটসি আরিয়াগোর জন্যে।'

'ওর…ওর কি হলো?'

'হারিয়ে গেছে। আপনি ভাল করেই জানেন। ইয়ান রোজার নামের লোকটা…

'রোজার? ওর আবার কি হল?'

'ওর নাম রোজার নয়। কোথায় আছে দয়া করে যদি বলেন গিয়ে কথা বলে দেখতে পারি। আর…

কিশোরের এসব নরম কথা ভাল লাগল না মুসার। খপ করে লোকটার হাত চেপে ধরে বলল, 'লোকটা কোথায়? ডলি ডিকসন কোথায়? ভাল চাইলে জলদি বলুন!'

'কি বলছ তাই তো বুঝতে পারছি না।' ঘামতে শুরু করেছে লোকটা। 'দেখো, হাত ছাড় বলছি। নইলে পুলিশ ডাকব।'

'ডাকুন। আমরা তো সেটাই চাই।'

'ইয়ে…মানে…,' রিভসের কুতকুতে চোখে অস্বস্তি দেখা দিল। 'শোন… হাতটা ছাড় না, বলছি। ডলির ট্যালেন্ট আছে। কিছুদিন ট্রেনিং দিলেই হয়ে যাবে। সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।' আচমকা কণ্ঠস্বর বদলে গেল লোকটার। বলল, 'এসো, দেখাচ্ছি একটা জিনিস।'

একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।

পকেট থেকে চাবি বের করে গ্যারেজের দরজা খুলল রিভস। 'ওই দেখ!' এমন ভঙ্গিতে বলল লোকটা। যেন পবিত্র কোন কিছু সম্বন্ধে বলছে। 'দেখে চোখ সার্থক কর। পুরানো দুর্গে যে জোম্বি ঢুকেছিল ব্লাড হারভেস্ট ছবিতে, মনে আছে? তারই দৃশ্য। আর ওই কফিনটা ভিলেজ অভ কার্সড থেকে নেয়া। ওটা লন চ্যানি অভিনীত ফ্যান্টম অভ অপেরা থেকে…'

'এ তো হরর ছবির একটা মিউজিয়ম!' হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে রবিন।

কিশোর তাকিয়ে রয়েছে বোরিস কারলফ অভিনীত ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছবির পোস্টারের দিকে। একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রিভসকে কিছু বলার জন্যে ঘুরেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। নেই লোকটা। ওদেরকে কায়দা করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

'মিস্টার রিভস?' চেঁচিয়ে ডাকল সে।

জবাবে ঝটকা দিয়ে লেগে গেল গ্যারেজের দরজা। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

'খাইছে! অ্যাইই!' চিৎকার করে ডাকল মুসা।

বাইরে তালা লাগানোর শব্দ হল। চেঁচামেচি জুড়ে দিল তিন গোয়েন্দা। লাভ হল না। কেউ সাড়া দিল না। আটকা পড়ল ওরা।

কয়েক মিনিট চিৎকার চেঁচামেচি করে ক্ষান্ত দিল ছেলেরা।

'হ্যানসন কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?' মুসা বলল। 'বেশি দেরি দেখলে নিশ্চয় খুঁজতে আসবে আমাদের। কিন্তু গ্যারেজে দেখার কথা কি ভাববে?'

'ওর জন্যে বসে থাকতে পারি না আমরা,' কিশোর বলল। 'রিভস তার সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে আসতে পারে। পিস্তল-টিস্তল নিয়ে।'

'তাই তো!'

'বোরোনোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের। জানালা থাকতে পারে। শেষ মাথায়।'

'যদি না থাকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আবার এসে দরজায় ধাক্কা দেব আর চিৎকার করতে থাকব।'

অনেক লম্বা ঘরটা। নানা রকম উদ্ভট জিনিসে বোঝাই। হরর ছবি তৈরি করার মালমশলার একটা গুদাম যেন। গন্ধটাও পুরানো কবরস্থানের কফিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক দিন পর পুরানো কবর খুললে যেমন বোঁটকা গন্ধ বেরোয়, অনেকটা তেমনি।

নরম কিছুতে পা পড়তে কিঁচ করে উঠল ওটা।

'বাবারে! ভূত!' বলে চিৎকার করে উঠল মুসা।

'দূর! কি কর, ও তো ইঁদুর!' রবিন বলল।

অনেক খোঁজাখুঁজি করল ওরা। অবশেষে দেয়ালের এক জায়গায় দেখল হার্ডবোর্ড লাগানো রয়েছে। একধার ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। নড়ে উঠল বোর্ডটা। আরেকটু জোরে টানতেই খুলে চলে এল হাতে। বেরিয়ে পড়ল একটা জানালা।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। মাথা বের করল মুসা। পাশে তাকাতেই চোখে পড়ল পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার।

'বেরিয়ে এস,' বলল অফিসার। 'শয়তানীর চেষ্টা করবে না একদম। এস।'

মুসা বেরোল। তারপর বেরোল রবিন। সব শেষে কিশোর।

অফিসারের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লালচুল মহিলা। বলল, 'হ্যাঁ, এই ছেলেগুলোই। মিস্টার রিভসকে খুঁজতে এসেছিল। একটু পরে গ্যারেজে চেঁচামেচি শুনলাম। ভাবলাম ওরাই হবে।'

'আমাদের আটকে রেখে পালিয়েছে হ্যারিসন রিভস,' অভিযোগের সুরে অফিসারকে বলল কিশোর।

'তাই?' পাথরের মত কঠিন হয়ে আছে অফিসারের মুখ।

'ক'দিন ধরেই মিস্টার রিভস বাড়িতে নেই,' মহিলা বলল। 'কি করে আটকাল তোমাদের?'

শান্ত কণ্ঠে বিশেষ একটা ভঙ্গি নিয়ে কিশোর বলতে লাগল, 'একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে। ওর নাম ডালিয়া ডিকসন। রিভস আর তার এক সঙ্গী শেষবার দেখা করেছে মেয়েটার সঙ্গে। গতকাল, চেশায়ার স্কোয়্যারে। আমাদের সন্দেহ, ওরা দু'জনই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে।'

'বড় বেশি টিভি দেখ তুমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অফিসার।

'বিশ্বাস না করলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

বাড়ির কোণ ঘুরে এগিয়ে এল দু'জন লোক। একজন বয়স্ক। পরনে ইউনিফর্ম নেই, কিন্তু ভাবভঙ্গি আর পুলিশ অফিসারের সম্মান দেখানো থেকেই আন্দাজ করা গেল, ওই দু'জনও পুলিশের লোক। সাদা পোশাকে এসেছে। ডিটেকটিভ।

কিশোরের কথা মন দিয়ে শুনল ওরা। তারপর বয়স্ক লোকটা ওদেরকে ওখানে থাকতে বলে চলে গেল। ইউনিফর্ম পরা অফিসার লাল চুল মহিলার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গেল, নিশ্চিত হয়ে আসার জন্যে যে রিভস বাড়িতে নেই। ফিরে এল খানিক বাদেই। তিন গোয়েন্দাকে তিরস্কার করে বলল সিনিয়র অফিসার, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয়। তিন গোয়েন্দার নাম-ঠিকানা লিখে নিতে লাগল।

উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে কৌতূহলী পড়শীরা।

'অ্যাই!' ট্রাইসাইকেলে বসা একজন জিজ্ঞেস করল পুলিশকে, 'চোর ধরলেন নাকি?'

'না।' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল অফিসার। 'আপনারা যান।'

তিন গোয়েন্দাকে ছেড়ে দেয়া হলো। দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে চলে এল ওরা। আরও লোক জড়ো হওয়ার আগেই। অপমানকর কথা শুনতে ভাল লাগে না। অর্ধেক পথ আসতেই চোখে পড়ল, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেরুন অডি গাড়ি, সেই গাড়িটা, যেটা আরও দু'বার দেখেছে। ওটার পাশে চলে এল তিন গোয়েন্দা। মুখ ফিরিয়ে তাকাল আরোহী, যেন প্যাসেঞ্জার সীটে পড়ে থাকা কিছু দেখছে।

'এই!' কিশোর বলল ফিসফিস করে।

'কী?' রবিন জানতে চাইল।

'পেছনে তাকাবে না। কোন দিকেই তাকাবে না। গাড়ির ভেতরে যে লোকটা বসে আছে, এখান থেকে সে রিভসের বাড়ির ওপর চোখ রাখতে পারে। রেখেছিল বলেই মনে হয় আমার।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন। 'অনেকেই তো এখন রিভসের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।'

'এই গাড়িটা আজকে আরও দেখেছি। আর ভেতরের লোকটা মিস্টার জেনসেন, পিজা শ্যাকের ম্যানেজার। আমাদেরকে না দেখার ভান করছে। ও এখানে কি করছে?'

ষোল

তিন গোয়েন্দা গাড়িতে উঠলে হ্যানসন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

'একটা টেলিফোন বক্সের কাছে,' কিশোর জবাব দিল।

একটা পেট্রল স্টেশনে গাড়ি ঢোকাল হ্যানসন।

টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে বের করল কিশোরআর জে. ইম্পোরটারসের ঠিকানা। লং বীচে। দক্ষিণে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ।

'রিভসের সঙ্গে ফারের পোশাকের দোকানদারের যোগাযোগ আছে, দোকানদারের সঙ্গে ভালুকটার যোগাযোগ আছে, এবং ভালুকটার সঙ্গে ডলির যোগাযোগ আছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'সুতরাং, যে কোম্পানি ভালুকটা সাপ্লাই করেছে, তাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

'অনেক দূরে,' হ্যানসন বলল। 'ম্যাপ অবশ্য আছে গাড়িতে। ঠিকানাটা বের করে ফেলতে পারব।'

ঠিকানা জেনে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। লং বীচে চলল হ্যানসন। পেছনে উত্তেজিত হয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ছেলেরা।

লং বীচে সাগরের কিনারে বাড়িটা। কেমন বিষণ্ন আর নির্জন মনে হচ্ছে। জানালায় আলো নেই। বাড়ির সামনে ট্রাক-লড়ি কিচ্ছু নেই, কোম্পানিগুলোর সামনে সাধারণত যেমন থাকে।

এবারেও বাড়ি থেকে দূরে গাড়ি রাখল হ্যানসন। বাড়িতে লোক থাকলে যাতে

দেখতে না পায়।

সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বাড়িটার দিকে তাকাল রবিন। পশ্চিমে সাগরের দিকে মুখ করা। 'ভেতরে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'দেখি, দরজায় টোকা দিয়ে,' কিশোর বলল।

দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে দরজায় থাবা দিল সে। কেউ সাড়াও দিল না, বেরোলও না। দরজার পাল্লার ওপর দিকটায় কাচের প্যানেল লাগানো। সেখানে চোখ রেখে ভেতরে ছোট একটা অফিস দেখতে পেল। ঘরটা শূন্য।

'নেই তো কিছু।' ফিরে তাকিয়ে বলল কিশোর।

বাড়ির উত্তর পাশে একটা কার পার্ক। ওখানে এসে আবার তাকাল বাড়ির দিকে। জানালাগুলোতে লোহার গ্রিল লাগানো। একটা কাঠের বাক্স পড়ে থাকতে দেখে সেটা এনে একটা জানালার নিচে রেখে তার ওপর উঠল মুসা। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল।

'কি দেখছ?' জানতে চাইল রবিন।

'স্টোর রুম মনে হচ্ছে। বেশ কিছু ভালুক দেখতে পাচ্ছি। আর প্যাকেট করার জিনিসপত্র। একধারে ছোট একটা ঘর আছে মনে হয়। দরজায় সাইন লাগানো। পড়তে পারছি না।'

নেমে এল মুসা। 'অন্য পাশ দিয়ে গিয়ে দেখি।'

কিন্তু অন্য পাশে এসে দেখল, জানালাই নেই।

কিভাবে ঢোকা যায় আলোচনা করছে তিনজনে, এই সময় একটা গাড়িকে থামতে শুনল।

'চুপ!' ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করল কিশোর।

দরজা খুলে নেমে এল কেউ। সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

'এইবার যাওয়া যাক,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। 'বলব, একটা ভালুক কিনতে চাই আমরা।'

ঘুরে আবার বাড়ির কোণে এসেই থমকে দাঁড়াল তিনজনে। সেই মেরুন অডি।

পিছিয়ে এল ওরা।

'আশ্চর্য!' আনমনেই বলল কিশোর। 'কার ওপর চোখ রাখছে? রিভস? না আমাদের ওপর?'

'নজর রাখব। দেখি কি করে?' রবিন বলল।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। পনেরো মিনিট গেল··· বিশ···তারপর দরজা খুলল বাড়িটার। একটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এল একজন লোক। গাড়ির বুটে নিয়ে গিয়ে তুলল। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'জেনসেনই,' মুসা বলল। 'সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে শয়তানের চেলা সে-ই। সব কিছুর হোতা, নাটের গুরু। গাধার মত পিজা শ্যাকে বসে আলোচনা করেছি আমরা। সব সে শুনেছে। পিছু নিয়েছে আমাদের।'

'এ বাড়িতে আটকে রাখেনি তো ডলিকে!' বলে উঠল রবিন।

'জলদি চলো! পুলিশকে ফোন করি!'

'যদি ডলি ভেতরে না থাকে,' নিরাশ করল ওদেরকে কিশোর। 'তখন কি জবাব দেব? পুলিশকে খবর দেয়ার আগে শিওর হতে হবে আমাদের।'

ওপর দিকে তাকাল মুসা। 'আচ্ছা, এক কাজ তো করতে পারি। ওখানে উঠে গিয়ে স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি আছে কিনা কেউ ভেতরে।'

বলেই রওনা হয়ে গেল সে। পিছু নিল কিশোর আর রবিন। কোণের কাছে একটা পাইপ নেমে এসেছে ওপর থেকে। ওটা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'জলদি কর!' তাগাদা দিল রবিন। 'কেউ দেখে ফেললে পুলিশকে খবর দেবে। এখানেও কিছু করতে পারব না আমরা।'

ছাতে উঠে গেল মুসা। ছ'টা স্কাইলাইট আছে মোট। ছোট যে ঘরটার কথা সে বলেছিল, বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে দেখেছিল, একটা স্কাইলাইট দিয়ে সেটার ভেতরটা দেখা যায়। কাচে পুরু হয়ে ময়লা লেগে রয়েছে। হাত দিয়ে ডলে ডলে পরিষ্কার করল সে। তারপর ভেতরে উঁকি দিল।

'কি দেখছ?' নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। অন্ধকার। কিছু বস্তাটস্তা আছে মনে হয়।'

মাটিতে বসে পড়ল কিশোর। 'নাহ্, মনে হয় এখানে নেই!'

আরও কয়েক মিনিট চেষ্টা করে ফিরে এল মুসা।

তিনজনে বসে বসে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল, সমস্যাটার সমাধান করা যায় কিনা। উপায় বের করতে পারল না।

শেষে কিশোর বলল, 'একটা স্কাইলাইট দিয়ে দেখেই নেমে এলে কেন? বাকিগুলো দেখা দরকার ছিল।'

'চল না, তিনজনেই উঠে যাই,' রবিন প্রস্তাব দিল।

'মন্দ বলনি। চলো, আরেকবার দেখি।'

তিনজনেই ছাতে উঠে পড়ল। পুরানো ছাত। হঠাৎ এক জায়গায় মড়মড় করে উঠল। তিনজনের ভার সইতে পারছে না।

'খবরদার! নড়বে না!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

আবার গুঙিয়ে উঠল ছাতের তক্তা। মড়মড় করে উঠল জোরে। দেবে যেতে শুরু করল। থাবা দিয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে।

সতেরো

অন্ধকারে পড়ে আছে কিশোব। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কোনমতে উঠে বসল। অনেকটা সহজ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

'কিশোর? কিশোর, তুমি ঠিক আছ?'

মুসা ডাকছে। যে ফোকরটা দিয়ে পড়েছে কিশোর, তার কিনারে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে সে। আবার ডাকল, 'কিশোওর?'

'আমি ঠিকই আছি,' গোঁ গোঁ করে জবাব দিল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। ছোট ঘরের পাশের বড় ঘরটায় পড়েছে। নব ধরে মোচড় দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল। নড়ল না নবটা। তালা দেয়া।

ঘরে অনেকগুলো ইস্পাতের র‍্যাক। তাকে সাজানো টেডি বিয়ার। আরও নানারকম খেলনা আর পুতুল রয়েছে। বাক্স, প্যাকেট করার কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে। কিছু খেলনা মেঝেতেও পড়ে আছে।

একটা ভালুক হাতে নিল কিশোর। ডলিরটা যেমন ছিল তেমনই দেখতে। নিয়ে এগোল আরেক দিকে। বাড়ির সামনের দিকে। আরেকটা দরজা চোখে পড়েছে। সহজেই খুলে গেল ওটা। ভেতরটা অফিসঘর। দুটো ডেস্ক আছে। ওপাশের দরজাটা খুলতে যাবে এই সময় আবার কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

দরজার কাচের প্যানেল দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ফিরে এসেছে মেরুন অডিটা। দ্রুত আবার স্টোররুমে ফিরে এল কিশোর। অফিসের দরজাটা লাগিয়ে দিল।

ছাতের ওপরে নড়েচড়ে উঠল মুসা। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কি করছ?'

'আস্তে!' সাবধান করল কিশোর। 'সরে যাও! ওই লোকটা ফিরে এসেছে!'

কয়েকটা বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ শুনল। অফিসে ঢুকল কেউ। চেয়ার টানার শব্দ হল। ড্রয়ার খুলল, কাগজপত্রের খসখস হল, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল লোকটা।

কি করছে জেনসেন?

বিশাল ঘরটায় চোখ বোলাল কিশোর। একটা ডাবলডোর দেখতে পাচ্ছে। ওটা খুলতে পারলে বেরিয়ে যেতে পারত। নেবে নাকি ঝুঁকিটা? বেরোতে পারবেই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আওয়াজ করে ফেলতে পারে। শুনে ফেললে দেখতে আসবে জেনসেন। তখন কি করবে কে জানে! লোকটার কাছে পিস্তল থাকতে পারে।

সামনের ঘরে আবার চেয়ার টানার শব্দ হল। তারপর পদশব্দ। আসছে লোকটা। এ ঘরে ঢুকলেই ছাতের ফোকরটা দেখে ফেলবে। তারপর?

খুলে গেল অফিস ঘরের দরজা। অনেকগুলো খেলনা বোঝাই একটা তাকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল লোকটার শরীর, মুখটা চোখে পড়ছে না।

কয়েক কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়াল লোকটা। নিশ্চয় ফোকরটা চোখে পড়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা তক্তাও নজর এড়ানোর কথা নয়।

পকেটে হাত ঢুকে গেল জেনসেনের। বের করে আনল পিস্তল। এই ভয়ই করছিল কিশোর। আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। আরও গুঁটিসুটি হয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল সে।

পালানোর চেষ্টা করবে? একদৌড়ে অফিসের দরজার কাছে যেতে সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগেই যদি গুলি করে বসে লোকটা?

এই সময় নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। এগিয়ে আসছে। দ্বিধায় পড়ে গেছে লোকটা। নড়ছে না। হাতে উদ্যত পিস্তল। আস্তে আস্তে আবার সরে যেতে শুরু করল সাইরেন।

নড়ে উঠল জেনসেন। পা বাড়াল সামনে। এগিয়ে আসছে কিশোর যে র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়েছে ওটার দিকে।

ধকধক করছে কিশোরের বুক। এই সময় ঘটল যেন অলৌকিক ঘটনা। সামনের দরজায় থাবা দিতে লাগল কেউ।

চমকে গেল জেনসেন।

থাবা পড়ছেই। ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'এই, ভেতরে কে আছেন? আছেন কেউ? আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

ঘুরে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল জেনসেন। দরজার ওপাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

বাইরে থেকে জবাব এল, 'ফেরার'স মেশিন পার্টসের অফিসটা কোথায় বলতে পারেন?'

'রাস্তার ওপারে। এক ব্লক পরে।'

'কিন্তু সাইনবোর্ড তো দেখছি না।'

আর দেরি করল না কিশোর। বেরিয়ে সোজা এগোল ডাবলডোরটার দিকে। ছিটকানি লাগানো আছে। টান দিতেই খুলে গেল। পাল্লা খুলে বেরোনোর আগের মুহূর্তেও কানে এল সামনের দরজার কাছে লোকটার কথা, যে মেশিন পার্টসের অফিস খুঁজছে। মুচকি হাসল কিশোর। বুদ্ধিটা ভালই বের করেছে হ্যানসন। কায়দা করে তাকে সুযোগ করে দিল বেরোনোর।

বেরিয়ে এসে আস্তে করে আবার পেছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

উত্তরে চলল রোলস রয়েস। রকি বীচে ফিরে চলেছে।

মুসা বলছে কিশোরকে; 'ছাত থেকে নেমে পড়লাম আমি আর রবিন। ভাবলাম, আমরা গিয়ে ডাকাডাকি করলে চিনে ফেলবে জেনসেন। সে জন্যেই হ্যানসনকে পাঠিয়েছি।'

'ভাল বুদ্ধি করেছ।'

হাতের ভালুকটা টিপেটুপে দেখল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'অদ্ভুত! সাধারণত খেলনা যে রকম হয় সে রকম নরম নয়। ভেতরটা শক্ত।'

'কেটে দেখলেই হয়,' রবিন পরামর্শ দিল।

পকেট নাইফ বের করে কাটতে শুরু করল কিশোর। দু'পাশ থেকে ঝুঁকে এল অন্য দু'জন। নিরাশ হতে হল তিনজনকেই। ভেতরটা প্ল্যাস্টিকে তৈরি। ফাঁপা। কিছু নেই। প্ল্যাস্টিকের ওপরে রোমশ চামড়া পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

'দূর!' নিরাশ হয়ে হেলান দিল মুসা। 'এত কিছু করেও কোনই লাভ হল না। একটা কথাই শুধু জানতে পারলাম, ওই রিভসটা শয়তানীতে জড়িত।'

'পুলিশের কাছে যাব?' হ্যানসন জিজ্ঞেস করল।

'গিয়ে কি বলব? জেনসেনের কথা বলতে পারি। কিন্তু কি প্রমাণ আছে আমাদের হাতে? কেন বিশ্বাস করবে পুলিশ?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল হ্যানসন।

আঠারো

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কার একটা ভেড়া যেন ছুটে গিয়েছে। বাড়ির কাছে এসে ব্যা ব্যা করে ডেকে চলেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে কিশোর, ভেড়াটাকে তাড়াবে? না শব্দ উপেক্ষা করে বালিশে কান ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়বে?

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল সে। ভেড়া! ঠিক! এই তো পাওয়া গেছে ডলির কিডন্যাপারদের!

ঘড়ির দিকে তাকাল। তিনটে বাজে। এই অসময়ে হ্যানসনকে পাওয়া যাবে না। রবিন আর মুসাও ঘুমিয়ে। ওদেরকেও ডাকা যাবে না। তার মানে সকালের আগে কিছুই করতে পারছে না।

অন্ধকারে শুয়ে রইল সে। চুপ করে থেকে ভাবছে। ঘুম আসছে, পরক্ষণেই টুটে যাচ্ছে। উত্তেজনার সময় এ রকম হয়। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ল সে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে নিচে নামল নাস্তা করার জন্যে।

সাড়ে সাতটায় রবিনকে ফোন করল।

'ডলির বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় কি বলেছিল রোজার, মনে আছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বলেছিল ডলিকে ছবিতে নামাতে চায়।'

'তা তো বলেইছিল। আরও বলেছিল ক্রুগার মনটাগোর বাড়িতে থাকে ওরা। বাড়ির পেছনে ভেড়া চড়ে।'

কিছু বলল না রবিন। তাকে হাই তুলতে শোনা গেল ফোনে।

'বল তো লস অ্যাঞ্জেলেসের কোন এলাকায় ভেড়া দেখা যায়?'

'অনেকের বাড়িতেই···আচ্ছা, দাঁড়াও। বসন্তের শুরুতে উপকূলের ধারে পাহাড়ের ঢালে চড়ে বেড়ায় ভেড়ার পাল। তরপর সিয়েরা আর অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি করা হয় ওগুলো।'

'ঠিক। এমন সব জায়গায় পাঠানো হয়, যেখানে শীত বেশি পড়ে, উলের দরকার হয়। তবে সব তো আর পাঠানো যায় না, কিছু না কিছু থেকেই যায়। সেগুলোকে কোথায় রাখা হয়? পাহাড়ের ওপরেই কোথাও। ওখানে যদি ভেড়া থাকতে পারে, দু'তিনজন লোকও তো সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। পারে না?'

'তাই তো!' সজাগ হয়ে গেছে রবিন।

'সেখানেই যাব আমরা। আমি হ্যানসনকে ফোন করছি।'

'করো। আমি মুসাকে করছি।'

ন'টার কয়েক মিনিট আগে হাজির হল হ্যানসন। তবে রোলস রয়েস নিয়ে নয়।

এক জীপ নিয়ে। যেখানে যাচ্ছে সেখানে রোলস রয়েসের চেয়ে এ ধরনের জীপই বেশি উপযোগী। বলেই দিয়েছিল কিশোর।

জীপে চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা। রওনা হল হ্যানসন। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে কিছুক্ষণ চলে মোড় নিয়ে একটা সরু পথে পড়ল জীপ। পথটার নাম কটনউডক্রীক রোড। পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠে চলল।

ডানে-বাঁয়ে চোখ রেখেছে ছেলেরা।

পনেরো মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল মুলোল্যাণ্ড হাইওয়েতে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে হলিউড পার হয়ে ভেনচুরায় চলে গেছে পথটা।'

কিশোরের হাতে বিনকিউলার। আতিপাতি করে দেখছে পথের পাশের পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড়ের ঢালে মাঠ আর চারণভূমি যেখানেই আছে ভাল করে দেখছে ভেড়া দেখা যায় কিনা। সাইকেল নিয়ে ঘামতে ঘামতে চলেছে একজন লোক। কিশোরের নির্দেশে তার কাছে এনে গাড়ি থামাল হ্যানসন।

'এই যে ভাই,' কিশোর বলল। 'এখানে আমার এক বন্ধু ভেড়া পালে। ডারমট নাম। কোথায় থাকে বলতে পারেন?'

'সরি,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল লোকটা। 'ও নামে কাউকে চিনি না।'

আবার এগিয়ে চলা।

কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের ঢালে কিছু ধূসর জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। প্রথমে ভাবল পাথর, পরে দেখে নড়ছে। ভেড়া! সেদিকে এগিয়ে যেতে বলল হ্যানসনকে।

আরেকটু কাছে গেলে দেখা গেল, পুরানো একটা ঝরঝরে ভ্যানের পাশে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে রয়েছে একজন লোক। মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে আপনমনে।

গাড়ি রাখতে বলল কিশোর।

বড় একটা পাথরের চাঙড়ের পাশে এনে জীপ থামাল হ্যানসন। নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। লোকটার দিকে চলল।

কাছে এসে কিশোর বলল, 'কয়েকজন বন্ধুকে খুঁজছি। দু'জন লোক, ডারমট আর তার ভাই। আর একটা মেয়ে। পাহাড়ের এদিকটাতেই কোথাও থাকে। ঠিকানা ঠিকমত বলতে পারব না। জানেন, কোথায় থাকে?'

চারপাশে চোখ বোলাল রবিন। যতদূর চোখ যায়, কোন বাড়িঘর চোখে পড়ল না।

'আমাদেরকে বলা হয়েছে,' আবার বলল কিশোর। 'যেখানে ওরা থাকে, তার পেছনে ভেড়া থাকে। কই, এখানে তো বাড়িঘর দেখছি না। আর কোথাও ভেড়া পালে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'কি জানি, বলতে পারব না তো। তবে পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পার। থাকতেও পারে। এখানে এসেছি আমি কাল রাতে। পথের ওদিকটায় থাকতেও পারে। ভেড়ার ডাক শুনেছি আসার সময়।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এসে গাড়িতে উঠল ছেলেরা।

'পশ্চিমে,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'রাস্তার যা অবস্থা দেখছি, উঠতে গিয়ে না পড়ে মরি।'

'কিচ্ছু ভেব না। গাড়ি তো চালাব আমি।'

রাস্তার এই অংশটা একেবারে নির্জন। যানবাহন চোখে পড়ছে না, মানুষজন নেই। রকি বীচের এত কাছে যে এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

মাইল খানেক এগোনোর পর দু'ভাগ হয়ে গেছে পথ। ধূসর একটা পাথরের টাওয়ার চোখে পড়ল। একঝাঁক গাছের মাথার ওপরে বেরিয়ে আছে।

সেদিকে এগোতে লাগল হ্যানসন।

'আরি!' মুসা বলল। 'দুর্গটুর্গ না তো?'

একটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল গাড়ি। আর এগোনোর দরকার নেই, কিশোর বলল। জীপ থামাল হ্যানসন।

'দুর্গের মতই লাগছে,' রবিন বলল। একপাশে কয়েকটা কাঠের কেবিন রয়েছে। উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা।

'পুরানো ওয়েস্টার্ন শহরের মত লাগছে,' মুসা বলল।

'এটাই জায়গা!' চোখ চকচক করছে কিশোরের।

'আমার কাছে তো ছবির লোকেশনের মত লাগছে।'

'ঠিক! এরকম জায়গাতেই তো লুকিয়ে থাকতে চাইবে কেইনের মত লোক। এখন ওই ধোঁকাবাজ প্রযোজক আর ডলিকে এখানে পেলেই হয়!'

উনিশ

'হ্যানসন,' কিশোর বলল। 'আপনি থাকুন এখানে। যদি মনে হয় আমরা বিপদে পড়েছি, সাহায্য করতে যাবেন। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

অন্যান্য মুভি লোকেশনের মত এই জায়গাটারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বার বার নতুন করে সাজানো হয়েছে। বড় বেশি চুপচাপ।

'কোনখান থেকে শুরু করব?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন।

কিশোরও ভাবছে সে কথা। বাড়িগুলোর ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। কোথায় থাকতে পারে? কোনখানে? শেষে দুর্গটাকেই বেছে নিল সে।

অনেক দিনের অযত্নে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে, প্রতিটি ঘরে। কিন্তু ডলি কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে থামল তিনজনে। নতুন করে খিল লাগানো হয়েছে।

'এইটাই!' নিচু গলায় বলল রবিন।

ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।

ভেতরে কি করে দেখা যায়? একটা জানালা চোখে পড়ল। ওটার কাছে চলে

এল ওরা। উঁকি দিল ভিতরে। কাঠের পাটাতনের ওপর জড়সড় হয়ে পড়ে আছে যেন একগাদা কম্বল। কেউ অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে নষ্ট হওয়ার জন্যে, দেখে সে রকমই মনে হয়।

'ডলি?' নরম গলায় ডাকল কিশোর। 'ডলি, আপনি আছেন ওখানে?'

নড়ে উঠল কম্বলের দলাটা। উঠে বসল ডলি ডিকসন। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর চেহারা।

'ডলি, আমি। আমি কিশোর পাশা। রবিন আর মুসাও এসেছে। ওরা কোথায়? রিভস আর কেইন? মানে, রোজার?'

মূককীটের মত যেন গুটি থেকে বেরোল ডলি, তেমনি করে কম্বল সরিয়ে বেরিয়ে উঠে এল। পরনে কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। সব কিছুতে ময়লা। হাতে ময়লা, মুখে ময়লা। পা খালি।

'আপনাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি,' কিশোর বলল।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল ডলি। 'লোকগুলো ভীষণ পাজি! অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই বেরোতে পারিনি। সব সময় পিস্তল নিয়ে পাহারা দেয়।'

'কোথায় ওরা?'

'ওদিকে। একটা জেনারেল স্টোর আছে না, ওটাতে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জানালায় কাঠ আটকে দেয়া হয়েছে, গরাদের মত করে। সেগুলো খুলতে চেষ্টা করল সে আর মুসা। রবিন বেরিয়ে গেল হ্যানসনকে বলার জন্যে, যাতে পুলিশকে খবর দেয়।

সে ফিরে এসে দেখল, একটা কাঠ খুলে ফেলেছে কিশোর আর মুসা। জায়গাটা সিনেমার শুটিঙের জন্যে তৈরি হয়েছে। তাই সব কিছুতেই আসলের চেয়ে নকলের ছড়াছড়িই বেশি। জানালার শিকগুলোকে শিকের মত দেখতে হলেও আসলে কাঠের তৈরি।

ঘরের ভেতরে বসে কাঁদতে আরম্ভ করেছে ডলি।

'পাগল! ওরা পাগল! সব বদ্ধ উন্মাদ! একটা খেলনার জন্যে এত কিছু করছে!'

'ভালুকটা তো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'পেয়ে গেছে। কেন চেয়েছে, জানেন?'

'না।'

'আপনাকে আনল কিভাবে এখানে?'

'বাথরুম থেকে সবে বেরিয়েছি, এই সময় এল ওরা। বলল, আমার সঙ্গে ড্রাকুলার ব্যাপারে কথা বলতে চায়। লিভিং রুমে বসে রিভসের সঙ্গে কথা বলছি আমি, রোজার উঠে গেল ওপরে। আমাকে বলল, রান্নাঘরে যাবে পানি খেতে, অথচ গেল ওপরতলায়। অবাক লাগল। কি করছে ওখানে? শেষে আর থাকতে না পেরে আমিও গেলাম ওখানে। আমাকে থামানোর চেষ্টা করেছে রিভস, পারেনি। গিয়ে দেখি, মিসেস লেসিঙের ঘরে আলমারি, ড্রয়ারে খোঁজাখুঁজি করছে রোজার। ভালুকটার কথা জিজ্ঞেস করল আমাকে। শেষে খপ করে এসে আমার হাত চেপে

ধরে ঝাঁকাতে লাগল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভালুকটা কোথায় আছে তাকে বলতেই হবে!'

আবার ফুঁপিয়ে উঠল ডলি। 'হ্যাঁচকা টানে হাত ছুটিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ছিটকানি লাগিয়ে দেয়ার আগেই সে-ও ঢুকে পড়ল। থাবড়া মারল আমার নাকেমুখে। নাক থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল আমার। আমার হাত মুচড়ে ধরে শাসাতে লাগল, ভালুকটার কথা না বললে...না বললে...'

'হয়েছে, থাক, বুঝতে পেরেছি।' কাঠের আরেকটা শিক খুলে ফেলল কিশোর।

'ভাবলাম,' ডলি বলল। 'ভালুকটা পেয়ে গেলেই আমাকে ছেড়ে দেবে। দিল না।'

'দেয়নি, কারণ যদি পুলিশকে বলে দেন। গাড়ির বুটে ভরে আপনাকে এনেছে, না?'

'হ্যাঁ। রিভসের কাছে পিস্তল ছিল। আমাকে ভয় দেখাল, টুঁ শব্দ করলেই গুলি করে মারবে। ভয়ে কিচ্ছু করলাম না।'

শেষ শিকটা খুলে ফেলল মুসা। 'আসুন। বেরিয়ে আসুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করছি।'

মুসা আর কিশোরের সাহায্যে জানালা গলে বেরিয়ে এল ডলি। একটা পেরেকে লেগে ছিঁড়ে গেল স্কার্টের কিছুটা। বেরিয়ে এল চারজনে। রওনা হলো জীপের দিকে।

ঠিক এই সময় খুলে গেল জেনারেল স্টোরের দরজা। বেরিয়ে এল হ্যারিসন রিভস। হাতে একটা কাগজের প্লেটে খাবার। স্তব্ধ হয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তার পর ঘরের দিকে ফিরে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল, 'ডেগি! ডেগি!'

দৌড় দিতে বলল কিশোর। ডলির হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটল মুসা। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ডলি। ব্যথায় কাতরে উঠল। বুড়ো আঙুল মুচড়ে গেছে। টেনেটুনে তাকে তুলল আবার মুসা।

বেরিয়ে পড়েছে রিভস আর রোজার। দু'জনের হাতেই পিস্তল। দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছতে পারবে না, বুঝতে পেরে পাশের একটা বাড়ির দিকে ঘুরে গেল কিশোর। সবাইকে বলল বাড়িটাতে ঢুকে পড়তে।

কতদিন ওটাতে মানুষ ঢোকে না কে জানে। ভেতরে বাদুড়ের বাসা। ফড়ফড় করতে লাগল ওগুলো, সেই সঙ্গে কিঁচিক কিঁচিক করে বিচিত্র ডাক ছাড়তে লাগল।

অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকে বসে রইল চারজনে।

রিভস ঢুকে পড়েছে। বাইরের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি বেরিয়ে এসো! যদি গুলি খেতে না চাও!'

চুপ করে রইল কিশোর। সবাইকে চুপ থাকতে বলল।

'বেরোতে বললাম না!' আবার ধমক দিয়ে বলল রিভস। 'আমি জানি তোমরা ওখানেই আছ!'

ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, 'ব্যাটা ঢুকতে দেখেনি আমাদের! বোধহয় গাছের

জন্যে! নইলে ওরকম করে বলত না। সোজা ঢুকে পড়ত।'

'বাদুড়গুলোই বাঁচিয়ে দিল আমাদের,' রবিন বলল।

রোজারও এসে ঢুকল ঘরে। রিভসকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ইঞ্জিনের শব্দ হলো। জীপের ইঞ্জিন। নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করে ফিরে এসেছে হ্যানসন। করল কোথা থেকে? পথের পাশের কোন ফোনবক্স থেকে হবে, ভাবল কিশোর।

ঘরের বাইরে জীপ থামল। রোজারকে বোধহয় ঢুকতে দেখেছে হ্যানসন। অনুমান করল তিন গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। ধস্তাধস্তি শোনা গেল।

আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। কারাতে ব্যবহারের এরকম একটা মোক্ষম সুযোগ ছাড়তে রাজি নয় সে। এক লাফে উঠে বেরিয়ে গেল।

কিশোর আর রবিনও বসে থাকল না। মুসা আর হ্যানসনকে সাহায্য করতে গেল।

রোজারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে হ্যানসন। আর পিস্তল উঁচিয়ে বার বার তাকে শাসাচ্ছে রিভস। গুলি করছে না।

তবে কি!…চট করে ভাবনাটা খেলে গেল কিশোরের মাথায়। এখানকার সব কিছুই তো নকল। ওদের পিস্তলগুলোও নকল নয় তো? নইলে গুলি করছে না কেন?

পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে এক থাবায় রিভসের পিস্তলটা কেড়ে নিল কিশোর। ওজন দেখেই বুঝে গেল, নকল।

দুটো মিনিটও আর টিকল না এরপর রোজার আর রিভস। কাবু করে ফেলল হ্যানসন আর তিন গোয়েন্দা মিলে। সাহস বেড়ে গেছে ডলির। খুঁজেপেতে দড়ি বের করে নিয়ে এল। বেঁধে ফেলল দুই শয়তানকে।

বিশ

কেসের রিপোর্ট লিখে তৈরি হয়ে রয়েছে রবিন। কিন্তু বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার বিদেশ থেকে ফিরলেন না।

ডালিয়া ডিকসনকে উদ্ধারের এক হপ্তা পরে ইডাহো থেকে ফিরে এলেন ভিকটর সাইমন। কিশোরকে ফোন করলেন। কিশোর যে খোঁজ করেছিল, একথা তাঁকে জানিয়েছে কিম।

'একটা কেস শেষ করেছি,' কিশোর জানাল। 'শুনতে চান?'

'ফ্রেনসোর সেই মেয়েটার ব্যাপার তো?'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'অনুমান। এতদিন ধরে গোয়েন্দাগিরি করছি,' হাসলেন লেখক এবং গোয়েন্দা। 'পেপারে হেডলাইন হয়ে খবর বেরিয়েছে। কাল বিকেল চারটে নাগাদ

চলে এসো না? চা খেতে খেতে শোনা যাবে। আজকাল চা খেতে দিচ্ছে কিম।'

দ্বিধা করছে কিশোর। কিমকে বিশ্বাস নেই, খাবারের ব্যাপারে।

'সত্যি বলছি,' কিশোরের ভাব বুঝে বললেন লেখক। 'চা-ই দেবে। বিশ্বাস করো।'

'বেশ। আরও দু'জন বন্ধুকে কি আনব?'

'একজন নিশ্চয় ডালিয়া ডিকসন?'

'হ্যাঁ। তবে ডলি আমাকে কথা দিয়েছে, সিনেমায় যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনুরোধ করবে না আপনাকে। শুধু দেখা করতে চায়। নাম শুনেছে তো অনেক। হ্যানসনও আপনার ভক্ত। আপনার সব বই পড়েছে।'

'তাই নাকি? হ্যানসনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা কিন্তু অনেক দিনের। তোমাদের প্রথম কেসের কাহিনীটা পড়ার পর থেকেই।' হাসলেন তিনি। 'তা তোমরা তাকে আনবে, না সে-ই তোমাদেরকে নিয়ে আসবে?'

কিশোরও হাসল। লাইন কেটে দিয়ে প্রথমে লেসিং হাউসে ডলিকে ফোন করল, তারপর করল হ্যানসনকে।

পরদিন বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে তিনটেয় হাজির হল হ্যানসন। অবশ্যই রোলস রয়েস নিয়ে। তবে শোফারের ইউনিফর্ম পরে আসেনি। তার বদলে পরেছে খাঁটি ইংরেজের পোশাক। অভিজাত ইংরেজের মত বেশ গম্ভীর চালে বলল, 'আজ আমি মেহমান। শোফার নই। তাই ভাবলাম, এই পোশাকটাই পরে যাই।'

'দারুণ লাগছে আপনাকে, হ্যানসন,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা। 'সত্যি, তুলনা হয় না। ডলি কি পরে আসবে বুঝতে পারছি না।'

'পরবে হয়ত ড্রাকুলার বৌয়ের পোশাক,' রবিন বলল। 'ভেলকি লাগিয়ে দেবে মিস্টার সাইমনকে।'

কিন্তু ডলি অবাক করল ওদেরকে, নিরাশও করল। সাধারণ একটা জিনসের প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে এসেছে।

'ডলি,' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আজকে আপনি কি সাজলেন?'

'যা সাজার সেজেছি। অতি সাধারণ আমি,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ডলি।

কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে চলল রোলস রয়েস। ভিকটর সাইমনের বাড়িটা দেখা যেতেই সামনে ঝুঁকল ডলি। ভাল করে দেখার জন্যে।'

'আরে, সত্যিই তো বলেছ তোমরা! সরাইখানাকে বাড়ি বানানো হয়েছে তোমরা যখন বললে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।'

বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল হ্যানসন। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সাইমন। পেছনে এসে দাঁড়াল কিম, একগাল হাসি নিয়ে। হ্যানসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সম্মান জানাল ব্রিটিশ কায়দায়। পরক্ষণেই ছুটে পালাল যেন লজ্জা পেয়ে।

'কিম খুব উত্তেজিত হয়ে ছিল আপনার আসার কথা শুনে, মিস্টার হ্যানসন,' সাইমন বললেন।

'প্লীজ, স্যার, আমাকে মিস্টার বলার দরকার নেই,' বিনীত কণ্ঠে বলল হ্যানসন। 'তিন গোয়েন্দা আমার বন্ধু। আপনাকেও বন্ধু হিসেবে পেলেই আমি খুশি

হব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' সাইমনও খুশি হলেন। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। টেলিভিশনে অসংখ্য ব্রিটিশ শো দেখেছে কিম। এখন একজন খাঁটি ইংরেজের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সারাদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল, আপনার সঙ্গে ইংরেজের মত আচরণ করার জন্যে।...রান্নাঘর থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে, না?'

'হ্যাঁ।'

ডলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন সাইমন। একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধরে মেয়েটাকে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।

তিন গোয়েন্দা শেষবার দেখে যাওয়ার পর কিছু রদবদল করা হয়েছে লিভিং রুমটার। ঢুকতেই সেটা চোখে পড়ল ছেলেদের।

মেহমানদেরকে বসতে অনুরোধ করলেন সাইমন। তারপর তিন গোয়েন্দাকে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার শুরু করতে পার।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল রবিন। তারপর বলতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে নোটবুক দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে। কোথাও ঠেকে গেলে তাকে সাহায্য করছে মুসা আর কিশোর। হ্যানসনও করছে। কারণ সে-ও বেশিরভাগ সময়ই ওদের সঙ্গে ছিল এই কেসে।

রবিন থামলে সাইমন জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালুকটার ব্যাপারটা কি? এমন কি জিনিস ছিল?'

'শুনলে অবাকই হবেন,' ডলি বলল।

'রিভস আর রোজারকে বেঁধে ফেলে রাখলাম,' রবিন বলল। 'পুলিশের অপেক্ষায়। কিশোরের মনে পড়ল ওই দুর্গটা আগেও দেখেছে।'

একটা হরর ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল,' কিশোর জানাল। 'প্রিজনার অভ হন্টেড হিলের শুটিং করা হয়েছিল ওই দুর্গে। মনে পড়ল একটা দৃশ্যের কথা। দেয়ালের গায়ে একটা গোপন কুঠুরির দরজা খুলে রাজকুমারীর মুকুট বের করেছিল দুর্গের মালিক। আমার মনে হল, এটা নিশ্চয় জানে রিভস আর রোজার।'

'সুতরাং সোজা হেঁটে গিয়ে আবার দুর্গে ঢুকল কিশোর,' মুসা বলল। 'খুঁজে খুঁজে ঘরটা ঠিক বের করে ফেলল। তার অনুমান ঠিক। ওই কুঠুরিতেই পাওয়া গেল ভালুকটা।'

'কিশোর পাশার জন্যে এটা কোন ব্যাপার না,' হাত নাড়লেন লেখক। 'তা ছিলটা কি ভেতরে? ড্রাগ? হীরা? রত্ন...'

হাসল কিশোর। 'আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে, স্যার। ওসব কিছুই ছিল না। ছিল একগাদা টাকা।'

'টাকা! জালনোট?'

'না, তা-ও না। আসল টাকা। মিস্টার জেনসেনের কাছ থেকে চুরি করেছিল রোজার আর রিভস।'

'তার মানে তিনজনে একসঙ্গে কাজ করেনি? একদলের নয়?'

'না। রোজার আর রিভস সিনেমা পাগল লোক। ছবি বানানোর ভীষণ শখ।

কিন্তু টাকা নেই। রিভস কিছুদিন একটা স্টুডিওতে কাজ করেছে। আর রোজার একস্ট্রা হিসেবে অভিনয় করেছে হরর ছবিতে। দু'জনে বন্ধু। আলাপ আলোচনা করে ঠিক করল একদিন, ছবি বানাবে। কি ছবি? ড্রাকুলার গল্প নিয়ে কিছু। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিকঠাক। বাকি রইল টাকার ব্যবস্থা করা।'

'ড্রাকুলা?' ভুরু কোঁচকালেন লেখক। 'ওই কাহিনী নিয়ে আর কত ছবি বানাবে? বানিয়ে বানিয়ে পচিয়ে ফেলা হয়েছে।'

হাসল মুসা। 'সে জন্যেই কেউ ওদেরকে টাকা দিতে রাজি হয়নি।'

'বাই চান্স,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'মিস্টার জেনসেনের খেলনার কোম্পানিতে শিপিং ক্লার্কের একটা চাকরি পেয়ে গেল রোজার। খেলনার গুদামে তালা দেয়া ছোট একটা ঘর আছে, যেটাতে আমরা ঢুকতে পারিনি। ওটার প্রতি কৌতূহল বাড়তে লাগল ওর। একদিন জিনসেনের ড্রয়ার থেকে চাবি চুরি করে ঢুকে পড়ল ওই ঘরে। দেখে আলমারিতে অনেক টাকা। বেশ কিছু বাণ্ডিল হাতিয়ে নিল সে। কিন্তু সরায় কি করে? শেষে এক বুদ্ধি করল। বড় দেখে একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে ভরে ফেলল সেগুলো। ফারের পোশাক বিক্রি করে যে দোকানদার, তার দোকানে আরও খেলনার সঙ্গে চালান করে দিল বিশেষ ভালুকটা। এবং সেদিনই জেনসেনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল রোজার।

'ফারের দোকানদারের কাছ থেকে ভালুকটা আবার হাতানো দরকার। তাই গিয়ে যেচে পড়ে জোরজার করেই তার দোকানে চাকরি নিল রোজার। কিন্তু সে এতই অকর্মা, ভালুকটা দোকানে পৌঁছার আগেই তাকে বের করে দিল মালিক। খেলনা ভালুকগুলো এল। দোকানে কাজ করে না তখন রোজার, বেছে বেছে যে বের করবে কোনটাতে টাকা ভরেছে, সেই সুযোগ নেই। কাজেই ওই চালানে যে ক'টা খেলনা এসেছিল সব চুরি করল রোজার আর রিভস। সাধারণ চুরি হিসেবে দেখানোর জন্যে কয়েকটা ফারের কোটও চুরি করল।

'এবারেও ভাগ্য ওদের বিপক্ষে গেল। ওরা চুরি করার আগেই বিশেষ ভালুকটা মিসেস লেসিংকে দিয়ে দিয়েছে দোকানদার। চুরি করা ভালুকগুলো সব খুলেও যখন টাকা পেল না রোজার, মাথায় হাত দিয়ে বসল। খুঁজতে শুরু করল কার কাছে গেছে ভালুকটা। সেটা জানার জন্যেই আরেকবার চুরি করতে ঢুকতে হল দোকানে, কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্যে।'

'কত টাকা ছিল ভেতরে?' জানতে চাইলো সাইমন।

'দশ হাজার ডলার। ওই টাকায় ছবিটা শুরু করতে চেয়েছিল ওরা,' মুসা বলল। 'ভেবেছিল, পরে যা টান পড়বে, কোনভাবে জোগাড় করে নিতে পারবে।'

'যাই হোক,' আবার বলতে লাগল কিশোর। 'ওরা জেনে গেল ভালুকটা কোথায় আছে। মিসেস লেসিং তখন বিদেশে। আছে শুধু ডলি। তাকেই পটাতে শুরু করল দু'জনে। জেনে গেছে ডলি সিনেমায় অভিনয় করতে আগ্রহী। তার সঙ্গে খাতির করেছে আসলে মিসেস লেসিঙের বাড়িতে ঢোকার সুযোগের জন্যে, যাতে ভালুকটা বের করে নিয়ে যেতে পারে। ওখানে পেল না। জানতে পারল, ওটা আছে আমাদের কাছে। কাজেই ঢুকল গিয়ে আমাদের ইয়ার্ডে।'

'দানবের সাজে সেজে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে এল,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।

'ওরকম সাজা ওদের জন্যে কিছুই না,' সাইমন বললেন। 'বিশেষ করে রোজারের জন্যে। হরর ছবিতে এক্সট্রার অভিনয় করেছে সে। দৈত্যদানবই সেজেছে বেশি। তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'বন্ধকীর দোকানে কেন গিয়েছিল? আরও টাকা লুট করতে?'

'না, ওরা যায়নি। গেছে আরেকটা পাগল। এই হলিউডে যে কত রকম পাগল আছে।' হাত নেড়ে মুসা বলল, 'আমার তো একেক সময় মনে হয় এখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই মাথায় ছিট। লোকটা ছদ্মবেশে গিয়েছিল ভয় দেখিয়ে মজা পেতে। যখন দেখল, লোকে সিঁটিয়ে যায়, টাকা লুট করার বুদ্ধিটা তখনই মাথায় এল ওর। কয়েকটা ছিনতাই করেছে ওভাবে। রোজার আর রিভস যেদিন ধরা পড়ল, তার পরদিনই ওই ব্যাটাকেও ধরে ফেলেছে পুলিশ।'

হাসলেন লেখক। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আসল কথায় আসি এবার। জেনসেন এত টাকা পেল কোথায়? তোমাদেরকেই বা অনুসরণ করেছে কেন?'

'পিজা শ্যাকে আমাদেরকে ভালুকটার কথা বলতে শুনেছে,' রবিন জানাল। 'ব্যাপারটা কি ঘটেছে, আন্দাজ করে ফেলল। কারণ আলমারি থেকে যে টাকা চুরি গিয়েছিল, জেনে গেছে তখন সে। কে, কিভাবে চুরি করেছে, বুঝতে পেরেছে আমাদের আলোচনা শুনেই।'

'পুলিশকে জানাল না কেন?'

'জানাবে কি করে? সে নিজেই তো চোর,' কিশোর বলল।

'আমিও সে রকমই কিছু আন্দাজ করছিলাম। তা কোত্থেকে চুরি করেছিল?'

'গত বছর নভেম্বর মাসে ট্রেজারি থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার চুরি হয়েছিল, জানেন আপনি? কাগজে বেরিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন।

'জেনসেনই সেই টাকা চুরি করেছিল। পুলিশ এতদিন ধরতে পারেনি। সেই টাকা পুঁজি খাটিয়ে ড্রাগ আর নানা রকম অবৈধ জিনিসের ব্যবসা করে অনেক কামিয়ে ফেলেছিল। সেগুলো ভরে রেখেছিল আলমারিতে।'

'হুঁ। তাহলে এই ব্যাপার। তোমাদের পিছু নিয়েছিল নিশ্চয় ভালুকটা কোথায় আছে জানার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় এখন? ধরেছে পুলিশ?'

'না। পালিয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন লেখক। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'রোজার আর রিভসের জন্যে খারাপই লাগছে। বেচারারা! ছবি আর বানাতে পারল না···'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কিম। হাতে বিশাল এক ট্রে। সামনের টেবিলে এনে

নামিয়ে রেখে হেসে বলল, 'খাঁটি ইংরেজি চা, মিস্টার হ্যানসন। আশা করি আপনার ভাল লাগবে।'

প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। বড় বড় কেক, আর একটা বিরাট প্লেটে পুডিং। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোও কি ইংরেজি?'

'নিশ্চয়ই। খেয়ে দেখতে পার। ভাল হয়েছে।'

হাসল মুসা।

কিশোর আর রবিন হাসতে পারল না। ভয় কাটেনি। কিমকে বিশ্বাস নেই। বলা যায় না, এগুলো খাওয়া শেষ হলেই হয়ত ইঁদুর কিংবা শুঁয়াপোকা নিয়ে এসে হাজির হয়ে বলবে, এগুলো যেদেশের খাবারই হোক, খাঁটি ইংরেজি পদ্ধতিতে কাবাব করা।

উঠে দাঁড়াল ডলি। বলল, 'চা-টা আমিই দিই।' কেটলি থেকে কাপে ঢালতে শুরু করল সে। সবাইকে দিতে দিতে বলল, 'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি দু'একদিনের মধ্যেই। বাবাকে বলে দিয়েছি, আবার স্কুলে যাব। পড়ালেখা ভালমত শেষ হলে ভর্তি হব অভিনয়ের স্কুলে। ট্যালেন্ট থাকলে আমার অভিনেত্রী হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'এই তো বুদ্ধিমতি মেয়ের মত কথা,' লেখক বললেন। 'ট্যালেন্ট এবং আত্মবিশ্বাস। যে কোন কাজ স্বাভাবিক উপায়েই করা উচিত।'

শেষ হয়ে গেল খাওয়া। কোন প্লেটেই আর কিছু নেই।

আতঙ্কের মুহূর্ত উপস্থিত। ভয়ে ভয়ে কিমের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিন।

বুঝে ফেলল কিম। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'ভয় নেই, আজ ইংরেজি ছাড়া কিচ্ছু করিনি। তবে আমাজানের জংলীদের একটা বিশেষ ডিশ করার ইচ্ছে আছে। সাপের মাংস, বানরের রক্ত আর...'

'সেটা কবে!' আঁতকে উঠল রবিন।

'অবশ্যই জানাব। দাওয়াত করব তোমোদেরকে,' আশ্বাস দিয়ে বলল কিম।

'অন্তত সাতদিন আগে জানাবেন! যাতে আমেরিকা ছেড়েই পালাতে পারি।' রীতিমত আতঙ্ক ফুটেছে রবিনের চোখে।

লেখক বললেন, 'আমিও পালাব তোমার সঙ্গে। পরের একটা মাস আর বাড়িমুখো হব না।'

মুখ বাঁকাল কিম। এত বেরসিক লোকদের নিয়ে পারা যায় না। বলল, 'আসলে আপনাদেরকে আমার দরকারও নেই। আমি মুসাকে পেলেই খুশি। কি বলো, মুসা?'

ঃ শেষ ঃ